দেশীয় রাজ্য

কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর (দেববর্মা)

উপজাতি গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
ত্রিপুরা সরকার ■ আগরতলা

দেশীয় রাজ্য

স্বর্গীয় কর্ণেল ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেববর্মা
প্রণীত
ডাক্তার রায় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর বি,এ,
লিখিত ভূমিকা সম্বলিত।

প্রকাশক-শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা এম, এ (Harvard)

কর্ণেল হাউস, আগরতলা
স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্য
মূল্য ৩্ টাকা মাত্র।

শান্তিনিকেতন প্রেসে রায়সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত
শান্তিনিকেতন, বীরভূম।

তৃতীয় প্রকাশনা : জানুয়ারী, ২০১৭ ইং।

প্রকাশক : অধিকর্তা
উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র,
ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা।

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

দাম :- ১৪০ টাকা।

মুদ্রণে : ক্যাক্সটন প্রিন্টার্স, আগরতলা, ত্রিপুরা
দূরভাষ (২৩০-৭৫০০, ৯৪৩৬১২১১০৯)
ই-মেল : jraksharpub@gmail.com

নিবেদন

পূজ্যপাদ পিতৃদেব স্বর্গীয় কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর আজীবন ত্রিপুরা রাজ্যের এবং পরম্পরা তিনটি মহানুভব ত্রিপুরেশ্বর স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র, রাধাকিশোর এবং বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য বাহাদুরদিগের সেবায় নিজ জীবন ধন্য করিয়া গিয়াছেন। কর্ম্মজীবনে নানা দেশীয় রাজ্য পরিভ্রমণ এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের প্রতিনিধি বড়লাট ও ছোট লাটদের দরবারে যাতায়াত করিয়া এবং দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে ইংরেজ এবং ভারতবর্ষীয় লেখকদের পুস্তক এবং সাময়িক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তাহারই ফলে কতকগুলি প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। দেশীয় রাজ্যের প্রজা বলিয়াই দেশীয় রাজ্যের উন্নতির জন্য তিনি সর্ব্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। তজ্জন্য তিনি দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া গিয়াছিলেন।

পূজনীয় বিশ্বকবি শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্গীয় কবি নবীনচন্দ্র সেন, ডাক্তার শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন রায় বাহাদুর এবং সহপাঠি শ্রীযুত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যানিধি, এম এ, প্রমুখ সাহিত্যিক বন্ধুবর্গের উৎসাহে তিনি প্রদীপ, বঙ্গদর্শন, প্রবাসী, মানসী এবং মর্ম্মবাণী প্রভৃতি এবং কুচবিহার রাজ্য হইতে প্রকাশিত পরিচারিকা এবং ত্রিপুরার 'রবি' পত্রিকায় যে সব প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন সেগুলি সঙ্কলন করিয়া এ পুস্তকে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

পিতৃদেব মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার লেখাগুলি মৃত্যুর পর প্রকাশ করিবার ভার আমার মত অযোগ্য পুত্রের হস্তে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। সে দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার শেষ করিতে কতদূর সফল হইয়াছি তাহা পাঠকবর্গের অনুগ্রহ এবং বিবেচনার উপর নির্ভর করে।

বর্ত্তমানে দেশীয় রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দেশ বিদেশে আন্দোলন হইতেছে। ব্রিটিশ ভারতে স্বায়ত্ত্ব শাসন লাভ করিলে- দেশীয় রাজ্যের বিধিব্যবস্থা কিরূপ হওয়া প্রয়োজন তৎসম্পর্কেও বাদ বিসম্বাদ চলিতেছে। তজ্জন্য এই সময়ে এ পুস্তক প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াই নানা ভুল ভ্রান্তি উপেক্ষা করিয়াও পুস্তকটিকে প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি।

পিতৃবন্ধু রায় ডাক্তার শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর এ পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া বন্ধুপ্রীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। তজ্জন্য এ সুযোগে তাঁহাকে আমার আন্তরিক সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

বিশ্বভারতীর কর্ম্মসচিব অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষ অনুগ্রহে শান্তিনিকেতন প্রেসে এ পুস্তক ছাপা হইয়াছে এবং ইণ্ডিয়ান ফটো এনগ্রেভিং কোং ছবির ব্লক করিয়াছেন। এই সুযোগে শান্তিনিকেতন প্রেসের অধ্যক্ষ শ্রীযুত কালাচাঁদ দালাল এবং উক্ত ফটো এনগ্রেভিং কোম্পানীর সত্বাধিকারীগণের নিকট আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। পিতৃবন্ধু পূজনীয় শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যানিধি এম এ, মহাশয় স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের ছবির ব্লক এ পুস্তকের জন্য ব্যবহার করিতে দিয়া আমাকে বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন।

পরিশেষে ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস "রাজমালা" সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ এবং সহোদরপ্রতিম শ্রীমান ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী এম এ, এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি এবং প্রুফ দেখার কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীমান ভূপেন্দ্রের সাহায্য ব্যতিরেকে এত অল্পকাল মধ্যে এ পুস্তক প্রচার সম্ভবপর হইত না। তজ্জন্য তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা সহকারে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া আমার নিবেদন শেষ করিতেছি।

আগরতলা
১০ই মাঘ, ১৩৩৪।

শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা

ভূমিকা

কর্ণেল মহিমচন্দ্র দেববর্ম্মা বাহাদুর এক সময়ে ত্রিপুরারাজ্যের কর্ণধার ছিলেন। আজ বহুদিন পরে তাঁহার কতকগুলি লেখা প্রকাশিত হইল। মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য দুর্দ্দিনে মহিমচন্দ্রের সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। সহৃদয় ও গুণগ্রাহী রাজা সেই দিনের কথা ভুলেন নাই। এজন্য জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহাকে পার্শ্বচর স্বরূপ নিজের কাছে রাখিয়াছিলেন।

মহিম আমার বাল্যবন্ধু। আমার কনিষ্ঠ মামাত ভ্রাতা ৺হীরালাল সেন মহিমের সহপাঠী ছিলেন। সেই সূত্রে আমরা বহুদিন হইতে ঘনিষ্ট বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ। মহিমকে যখন প্রথম জানিয়াছিলাম, তখনই তাঁহার উদার হৃদয় ও প্রখর প্রতিভায় মোহিত হইয়া তাঁহার বন্ধুত্বাভিমানী হইয়াছিলাম। সেই বন্ধুত্ব চিরকাল অটুট ছিল। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেও তাঁহার পত্র পাইয়াছিলাম।

মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য হইতে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' পুস্তকের প্রকাশের রায় প্রার্থনা করিবার জন্য আমি যখন ১৮৯৩ সালে আগরতলায় যাই, তখন কিছুদিনের জন্য রাজদরবারে মহিমের 'সাক্ষাৎমানা' ছিল। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য এবং যুবরাজ রাধাকিশোর উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য চলিতেছিল। পিতাপুত্রের বিরোধের কতকটা ফল মহিমচন্দ্রকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। মহারাজ মনে করিয়াছিলেন, মহিমচন্দ্র গোপনে রাজপ্রাসাদের মন্ত্রণার খবর যুবরাজ বাহাদুরকে দিতেন, এজন্য তাঁহার 'সাক্ষাৎমানা' হইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে বীরচন্দ্র মাণিক্য তাঁহার ভ্রান্ত ধারণা বুঝিয়া মহিমচন্দ্রকে প্রীতির চক্ষে দেখিয়াছিলেন। মহিম তাঁহার পুস্তকে এই বিষয়ের আভাসমাত্র দিয়াছেন। কিন্তু সাময়িক বিড়ম্বনা সহ্য করিয়াও তিনি যে মহারাজার কতটা গুণমুগ্ধ ছিলেন, তাহার পরিচয় এই পুস্তকের অনেক স্থানে আছে।

বস্তুতঃ মহিমচন্দ্রের হৃদয় ছিল শরদাকাশের ন্যায় উদার ও ক্ষুদ্রতাশূন্য,--তাহাতে বিদ্বেষ বা বিরক্তির মেঘ বেশিক্ষণ জমিয়া থাকিতে পারিত না। তিনি মানুষের দোষের দিকটা দেখিতেন না,-গুণের প্রকৃত মূল্য দিতে জানিতেন এবং মহত্ত্বের পক্ষপাতী ছিলেন। এই বহিখানি যিনি মনোযোগের সহিত পড়িবেন, তিনি একথাটা বুঝিবেন যে তিনি বর্ত্তমান কালের ভারতের রাষ্ট্রীয়নীতি কিরূপ দক্ষতার সহিত আয়ত্ত করিয়াছিলেন। আজকাল আমরা যে সকল রাজনৈতিক আন্দোলন করিয়া থাকি, এবং সরকার বাহাদুর আমাদিগের অভিমতগুলি যে চক্ষে দেখিয়া থাকেন, মহিমচন্দ্রের দৃষ্টি তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রলোকের। তিনি প্রতিকূল বা অনুকূল কোন শক্তির দ্বারা প্রভাবান্বিত হন নাই। ক্ষুদ্র হইলেও তিনি একটি মিত্ররাজ্যের অধিবাসী ও অন্যতম নেতা ছিলেন। তিনি আমাদের প্রতিবেশী, -নিজকে বাঙালী বলিয়া পরিচয় দিতেন। বঙ্গীয় সমস্ত মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকাগুলি কর্ণেলের কর্ণ-পটহের কাছে অবিরত ধ্বনিত হইত, কখনও তাহা বিদ্বেষের ধূম উদ্‌গীরণ করিত, কখনও নানাছন্দে চাটুবাদের গীতি গাহিয়া স্বার্থপরতার নিকট আত্মবিক্রয় করিত। এখনকারদিনের এমন কোনও সরকারের অনুকূল কি প্রতিকূল রাজনৈতিক পাণ্ডা ছিলেন না, যাঁহার সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে না মিশিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও তিনি ইঁহাদের সমস্ত প্রভাব এড়াইয়া নিজের একটা স্বাধীন মত প্রচার করিয়াছেন। এই মতের মৌলিকত্ব, অন্তর্দৃষ্টি ও ভাবুকতা আমাদের কাছে পরম শিক্ষাপ্রদ বলিয়া মনে হয়। তিনি বিপ্লববাদ এবং রাজনৈতিক বক্তাদের অবিরাম আস্ফালন ও কোলাহল কতকটা ব্যথার সহিত এবং সময়ে সময়ে সকৌতুক হাস্যের সহিত দর্শন করিয়াছেন। অপরদিকে উপাধি ও রাজানুগ্রহপ্রার্থীর বিড়ম্বনা যেরূপভাবে অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতে হাস্য সংবরণ করা যায় না। বঙ্গদেশের উপাধিপ্রাপ্ত রাজারা যে 'হাইনেশ' বলিয়া সম্বোধন না করিলে খাপা হইয়া যান, এবং কানাকড়ি মূল্যের সম্মানলাভের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া বসেন, তাহা তিনি তীরস্থ দর্শকের ন্যায় খুব আমোদের সহিত

উপভোগ করিয়াছেন। তিনি যেরূপ উদার ও সহৃদয়ভাবে ভাইসরয় হইতে সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারীর ভারতের হিতসাধক কর্ম্মপ্রণালী লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা অতি স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন-প্রাপ্য প্রশংসা দিতে তাঁহার কিছুমাত্র কুণ্ঠা বা দ্বিধাবোধ হয় নাই। এদিকে পলিটিক্যাল এজেন্টগণ কতকগুলি দুষ্ট গ্রহের ন্যায় ভারতীয় রাজন্যবর্গের রাজকোষের উপর কিরূপ অন্যায় প্রভুত্ব স্থাপনপূর্ব্বক তাহার অপব্যয় করেন, তাহা নির্ভীক বীরের ন্যায় বলিয়াছেন। দেশীয় রাজা ও মন্ত্রীরা যে দেশের হিতসাধন করিতে ইচ্ছা করিলে তাহাতে কিরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারেন তাহার অনেক নজির তিনি দিয়াছেন, তৎস্থলে বিদেশী এজেন্টের প্রভাবে যে দেশীয় রাজারা স্বদেশের রীতিনীতি হারাইয়া কিরূপ উদ্ভটরকমের জীবে পরিণত হন, তাহার চিত্রও তিনি যথাযথভাবেই আঁকিয়াছেন। দেশীয় রাজারা ইচ্ছা করিলে- স্বরাজ্যের কেন, সমস্ত ভারতবর্ষের অশেষ হিতসাধন করিতে পারেন। ক্ষুদ্র হইলে কি হয়, এক হিসাবে তাঁহাদের যে সুবিধা আছে তাহা অপরদেশের রাজচক্রবর্ত্তীদেরও নাই। বহিঃশত্রু হইতে সংরক্ষিত পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষশূন্য এবং প্রচুর অবকাশপ্রাপ্ত এই সমস্ত রাজন্যরা যে অশেষ সুবিধা উপভোগ করিতেছেন, সেই সমস্ত পায়ে ঠেলিয়া দেশের হিতের মাথায় বজ্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহাদের অনেকে বিলাসে গা ঢালিয়া দিয়াছেন এবং খানদান বজায় রাখিতে অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া শিশুর ন্যায় অযথা ব্যয়ের দ্বারা ভারাক্রান্ত হইতেছেন। মহিম নিপুণ হস্তের তুলিকার দ্বারা পরিহাস রসিকতার রঙ ফলাইয়া এই বিসাদৃশ অভিনয়ের ছবি আঁকিয়াছেন, সেই ছবি দেখিয়া আমরা হাসিব কি কাঁদিব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। দেশীয় রাজ্যগুলির অবস্থা সম্বন্ধে এরূপ সারগ্রাহী পুস্তক বাঙ্গালা কেন ভারতের কোন ভাষায়ই হয় নাই। যে সমস্ত বিষয় ভারতের রাজনৈতিকদের মধ্যে অনেকে কখনও ভাবেন নাই, অথচ দেশী রাজাদের টীকি ধরিয়া আনিয়া যাঁহারা একটা প্রকাণ্ড জীবশালায় ভর্ত্তি করাইয়া দিতে পারিলে চূড়ান্ত সাফল্যের পরিকল্পনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই বহীখানি পড়ুন। কতদিক দিয়া যে তাঁহাদের দৃষ্টি খুলিয়া যাইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। মুড়িমুরকীর একদর করিয়া আমরা সর্ব্বশ্রেণীর লোকদিগকে এক কংগ্রেশ প্যাণ্ডালে দাঁড় করাইয়া বহুধা বিভক্ত ভারতকে এক মহাভারতে পরিণত করিবার স্বপ্ন দেখিয়া থাকি, কিন্তু বিষয়টির মধ্যে এরূপ সকল গুরুতর প্রশ্ন ও জটিলতা আছে, যাহার সমাধান করিতে হইলে ভারতীয় রাজন্যবর্গের শাসিত রাজ্যগুলির অবস্থা ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করা দরকার। এই বহীখানি পত্রসংখ্যা হিসাবে সুবৃহৎ না হইলেও বিষয় গৌরবে মহৎ। ইহার লেখায় জটিলতা বা প্রহেলিকার মত কিছু নাই। ইহার রচনা দর্পণের ন্যায় পরিষ্কার-ভাষা স্থানে স্থানে এমন সুন্দর এবং বিষয়গুলি এরূপ সংযত পারিপাট্যের সহিত বর্ণিত হইয়াছে, যাহাতে মনে হয়, তাহা বঙ্গের শ্রেষ্ঠ লেখকগণের হাতের অযোগ্য হইত না।

বাঙালী কেবলই গল্প ও কবিতার পাঠক। প্রাচীন ইতিহাস ও বেদ বেদান্ত সম্বন্ধে মাঝে মাঝে তাঁহারা কিছু কিছু লিখিয়া ও পড়িয়া থাকেন। রাজনীতি সম্বন্ধে যে সকল সন্দর্ভ নিয়ত প্রকাশিত হইতেছে, তাহা কোথাও পট্‌কাবাজি,-তাহাদের উদ্‌গীরিত ধোঁয়া দেখিলে মনে হয় এই বুঝি ঘরে আগুন ধরিল। সময়ে সময়ে শিশুর হাতের সলতের মত সেই রাজনৈতিক পটকাতে ঘরে আগুন ধরিয়াও থাকে। কিন্তু রাজনৈতিক আলোচনায় গান্ধী ও দেশবন্ধুর মত দুই একজন দেশপূজ্য ব্যক্তির কথা ছাড়িয়া দিলে কোন সারগর্ভ সুচিন্তিত লেখা আমরা বহুদিন যাবৎ পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বঙ্গভাষায় এই একখানি বহীপ্রকাশিত হইল যাহাতে বাঙালীর মস্তিষ্ক যে এদিকে খেলিতে পারে, তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। ইহা আমাদের জাতীয় চিন্তাকে এক স্বতন্ত্রপথে প্রবাহিত করিবার যোগ্য। জন্ম ভরিয়া যিনি বিষয়টির গুরুত্ব অনুভব করিয়াছেন, বাঙালীকে যিনি চিরদিন অন্তরঙ্গ মনে করিয়াও বিদেশী সম্ভ্রান্ত অতিথিদিগকে যিনি আদর আপ্যায়ন করিয়া তাঁহাদের মনের ভাব অনুভব করিবার প্রচুর অবকাশ পাইয়াছেন, যিনি ভারতের অনেক মিত্ররাজন্যের বন্ধুত্বাভিমানী ছিলেন এবং তাঁহাদের শাসন প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিবার যথেষ্ট সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার হাতে আমরা ক্ষণস্থায়ী বুদ্বুদ বা প্রহসনের মত কিছু প্রত্যাশা করিতে পারি না। তিনি যাহা দিয়াছেন- তাহা সারগর্ভ, প্রকৃতই ভাবুকতার উদ্রেককারী এবং মৌলিক। এই পুস্তকখানি ভারতবর্ষের সমস্ত ভাষায় এবং ইংরেজিতে অনুদিত হওয়া উচিত।

এই পুস্তকের একটি অধ্যায়ে দেশীয় শিল্প সম্বন্ধে একটি সন্দর্ভ আছে-সেই উপাদেয় লেখাটি পাঠ করিলে আমাদের চক্ষু ফাটিয়া জল পড়ে। যাহা ভারতের ইতিহাসে হিমাদ্রির মত উন্নত ছিল—যাহা দেশ বিদেশের লোকে বিস্ময়ের চক্ষে দেখিত, তাহা

ধূলিরেণুতে পরিণত ও ধুলিসাৎ হইতে দেখিয়া কাহার প্রাণে দাগা না লাগিবে? এই অধ্যায়টির উপর পাঠক একবার চোখ বুলাইয়া গেলে মহিমের হৃদয়ের বিশাল দেশপ্রীতির উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

আজ এই বহীখানি পড়িবার সময় পুনঃ পুনঃ প্রিয় বন্ধুকে মনে পড়িতেছে। তাঁহার মুখে কখনও অপ্রসন্নতা দেখি নাই-অতি দুঃখের দিনেও নহে। কথা বলিবার সেই অনুকরণীয় অপূর্ব্ব তেজস্বী ভঙ্গী- সেই অসামান্য ব্যক্তিত্ব যাহা সমবেত বন্ধুদিগকে নিষ্প্রভ করিয়া তাঁহাদিগের উপর প্রভাব বিস্তার করিত- সহাস্য মুখের সেই আদর, গুরুতর বিষয়গুলিকে অবলীলাক্রমে বুঝাইয়া দিয়া নীরস বিষয়ে অপূর্ব্ব রস সঞ্চার করিবার সুপ্রচুর শক্তি, স্বীয় অনুপ্রাণনা দ্বারা সকলকে অনুপ্রাণিত করিবার ক্ষমতা-সেই পরদুঃখকাতর মহাপ্রাণতা-চিতায় ছাই হইয়া গিয়াছে, কিন্তু শাস্ত্রকারেরা শব্দকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাই তাঁহার লিখিত এই পুস্তক তাঁহারই সুখোচ্চারিত কথার মত আমার নিকট শব্দের অনন্ত শক্তির মহিমা বুঝাইয়া মহিমকে যেন আমার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দিয়াছে।

পুস্তকখানি পাঠ করিলে মনে হইবে, মহিম যদি শুধু সাহিত্যেরই সাধনা করিতেন তবে তিনি সাহিত্যজগতে স্থায়ী কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারিতেন। অনেক সময় মনুষ্যের সাংসারিক জীবনে উন্নতপদ তাহার ভিন্ন পন্থায় প্রতিষ্ঠালাভের প্রতিবন্ধক হয়। লর্ড রোণাল্ডসের মত এত বড় পণ্ডিতকে আমাদের সকলে সচরাচর শুধু রাজপ্রতিনিধি বলিয়া জানি। তিনি যে বাগ্‌দেবীর একজন উচ্চাঙ্গের সেবক, সাধারণের মধ্যে তাহা কয়জনে জানেন?

মহিমচন্দ্র একটি সন্দর্ভে শুভ্রগরদ পরিহিত, তিলকমণ্ডিত, মাল্যবিভূষিত মহারাজ বীরচন্দ্রকে বৈষ্ণব ভক্তের সুরে স্বকৃত ব্রজবুলি কীর্ত্তন করিবার দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছেন, সে অধ্যায়ের তুলনা নাই। রাজনীতিবিশারদ, স্পষ্টভাষী কর্ণেল সাহেব-যুদ্ধক্ষেত্র অপেক্ষা যে সংকীর্ত্তনের ক্ষেত্রে অধিকতর মাতিয়া যাইতেন তাহা আমরা-তাঁহার বন্ধুবর্গ জানি, কিন্তু এই অধ্যায়টি পড়িলে সকলেই তাহার আভাস পাইবেন।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

৭, বিশ্বকোষ লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা।
১লা জানুয়ারী, ১৯২৮।

গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা।

জন্ম ৫ই শ্রাবণ আষাঢ়-কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদ শ্রবণানক্ষত্র মকররাশি ১৭৮৬ শকাব্দ। মহিমচন্দ্রের পিতা স্বর্গীয় ভারতচন্দ্র ঠাকুর বিনন্দীয়ার সেনার আলাহাজারী এবং আগরতলার খাস আদালতের জজ ছিলেন। তিনি ধর্ম্মপ্রাণ এবং বীরচন্দ্রমাণিক্যের অনুগত ভক্ত ছিলেন। তাঁহার সুবিচারের জন্য তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় এবং শ্রদ্ধার্হ হইয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী স্বর্গীয়া সাবিত্রী দেবী বিশেষ বুদ্ধিমতী এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানসম্পন্না ছিলেন। ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত স্বর্গীয় রামচন্দ্র আলাহাজারীর বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় স্বর্গারোহণ করিলে তাঁহার পত্নী ধনরত্ন গহনা ও তৈজস পত্র প্রভৃতি সমস্ত সর্ব্বস্ব লইয়া স্বীয় ভ্রাতার আলয়ে চলিয়া যান। একান্নবর্ত্তীভুক্ত ভারতচন্দ্র ঠাকুর তখন যুবক মাত্র। তিনি অত্যন্ত ধর্ম্মভীরু ছিলেন, সম্পত্তি ইত্যাদির জন্য জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবধূর সহিত মামলা না করিয়া নীরবেই দারিদ্র্যকে আলিঙ্গন করিয়া লইলেন। তখনকার অবস্থা এমন হইয়াছিল যে, কলার পাতে একবেলা বৈ আহার জুটিত না কিন্তু সাক্ষাৎ লক্ষ্মী স্বরূপিনী বুদ্ধিমতী স্ত্রী সাবিত্রী দেবীর পরামর্শ ও উপদেশ অনুসারে চলিয়া ভারতচন্দ্র ঠাকুর অনায়াসেই রাজ দরবারে প্রতিপত্তি লাভ করেন এবং সংসারের স্বচ্ছলতা আনয়ন করেন।

একটি দৃষ্টান্তে সাবিত্রী দেবীর চরিত্রের বিশেষত্ব বুঝা যাইবে। ঁবীরচন্দ্র মাণিক্যের সঙ্গে মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের পুত্র শ্রীল শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র কর্ত্তা বাহাদুরের সিংহাসনের দাবী লইয়া তখন মোকর্দ্দমা চলে। তখন কতকগুলি মূল্যবান দলিল তিনি সাবিত্রী দেবীর নিকট গোপনে গচ্ছিত রাখিয়া যান। একদিন মহারাজ রাঁধারমণ ঘোষ সেক্রেটারী মহাশয়কে ঐ দলিলগুলি আনিবার জন্য তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন কিন্তু তিনি উক্ত দলিল সম্বন্ধে কিছুই জানেন না বলিয়া রাধারমণবাবুকে বিদায় দেন। মহারাজ বীরচন্দ্র স্বয়ং একদিন আসিয়া উপস্থিত হন এবং সেক্রেটারীকে এরূপভাবে ফিরাইয়া দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দেন-যে কাগজ মহারাজ আমার নিকট গোপনে রাখিয়া গিয়াছেন তাহা আমি অন্য কাহারও কাছে দিতে পারি না। এখন স্বয়ং মহারাজ যখন অনুগ্রহ করিয়া পদধূলি দিয়াছেন তখন আমার দিতে আপত্তি নাই। নবদ্বীপ বাহাদুরের বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমায় ভারতচন্দ্র ঠাকুর যথেষ্ট কার্য্যকুশলতা দেখাইয়াছেন বলিয়া এবং সাবিত্রী দেবীর বুদ্ধিমত্তা ও স্পষ্টবাদীতার জন্য বীরচন্দ্র মাণিক্যের প্রধানা মহিষী ভানুমতী দেবী তাঁহাকে স্বর্ণালঙ্কার এবং মূল্যবান বস্ত্রাদি পারিতোষিক দিতে রাজ অন্দরে ডাকিয়া লয়েন। তখন তিনি জোড় হস্তে মহারাণীকে বলেন-"৯ বৎসর বয়সে শ্বাশুরী মাতার সহিত রাজ-অন্তঃপুরে প্রথম আসি। তখন দেখিয়াছিলাম একটি পরিচারিকাকে তাহার কার্য্যকুশলতার জন্য তদানীন্তন মহারাণী তাহাকে কানের অলঙ্কার পারিতোষিক দিয়াছিলেন। তাহার বৎসর খানের পরেই পুনঃরায় অন্দরে গেলে দেখিলাম মহারাণী উক্ত পরিচারিকার উপর কোন কারণে বিরক্ত হইয়া কান হইতে গহনা ছিঁড়িয়া লইয়া অন্য এক পরিচারিকাকে পরাইয়া দিয়াছেন। তদবধি এই প্রকার পারিতোষিকের প্রতি আমি আস্থাবতী নহি এবং এখন এই অনুগ্রহের দান গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছি।" ইহাতে ভানুমতী দেবী অত্যন্ত চটিয়া গেলেন এবং তিনি বিনা পারিতোষিকেই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ধর্ম্মভীরু ভারতচন্দ্র ঠাকুর পত্নীর অপ্রিয়

স্বর্গীয় কর্ণেল ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেববর্ম্মা

স্পষ্টবাদীতার জন্য বিপদ গণিলেন। কিছুক্ষণ পরেই ভারতচন্দ্র ঠাকুর ও তাঁহার পত্নী রাজ-দরবারে খাস কামরায় মহারাজ কর্তৃক আহুত হইলেন। তীক্ষ্নধী এবং প্রাজ্ঞ মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য সহাস্যে মহারাণীর সহি ত তাঁহার এরূপ অদ্ভুত ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সাবিত্রী দেবী বলিলেন, ''রাজা মহারাজের দয়া পদ্মপত্রের জলের মত। যে সোনার দরুণ কান কাটা যাওয়ার আশঙ্কা সে সোনা আমার প্রার্থনীয় নহে। বিশেষতঃ হিন্দু স্ত্রীর স্বামী ভিন্ন অন্যের নিকট হইতে স্বর্ণালঙ্কার এবং বস্ত্রগ্রহণ করা শাস্ত্র বিরুদ্ধ। মহারাজার দয়া হইলে এমন কোন সামগ্রী সুদুর্ল্লভ নহে যাহা বংশানুক্রমে ভোগ করিয়া আমাদের বংশধরগণ চিরদিন রাজভক্তির পুরস্কার পাইয়া ধন্য হইতে পারে।" সুচতুর বীরচন্দ্র এই বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকের বাক্যের মর্ম্ম অনুভব করিলেন, এবং ভারত ঠাকুরকে দিয়া সাবিত্রী দেবীকে উক্ত বস্ত্র এবং স্বর্ণাভরণ দিয়া সাজাইয়া দিলেন এবং একটি সুবিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তি ভারতচন্দ্রনগর নামে অভিহিত করিয়া কায়েমী সর্ত্তে দান করিলেন। এরূপ সুবিধাজনক সর্ত্তে ত্রিপুররাজ্যে কেহ ইদানীংকালে কোন সম্পত্তি পাইয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। এইরূপ পিতার ঔরসে এবং মাতার গর্ভে কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুরের জন্ম। পূর্ব্বোক্ত ভারত ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ তাঁহার পিতৃগৃহে ধন সম্পত্তি সব হারাইয়া পুনরায় দেবরগৃহে বালক মহিমচন্দ্রের লালন পালনের ভার লইলেন। তাঁহারই মাতৃস্নেহ এবং গোপালের ভোগে পুষ্ট হইয়া মহিমচন্দ্রের শিশুকাল পরমানন্দে কাটিতেছিল। মহিমচন্দ্র নাড়ুগোপালের এবং রাধাশ্যামের পূজায় তাঁহার সহকারী হইয়া উঠিলেন।

মাতার প্রখরবুদ্ধি প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব মহিমচন্দ্রের চরিত্রে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। ঘরে একটি কর্ম্মচারীর উপর তাহার শিক্ষারম্ভের ভার দেওয়ার কথা হইলে মহিমচন্দ্র স্পষ্টই বলিয়া বসিলেন ''বড় হইয়া যখন আমি বড় চাকুরী করিব তখন একজন সামান্য মুহুরী যখন বলিবে ''আমি তোমার গুরু ছিলাম" এ অপমান আমি সহ্য করিতে পারিব না।" দুর্গা পূজার দেবতা বিসর্জ্জনের সময় রাজবাড়ীর কার্ত্তিকের জরুয়া টুপির জন্য রাজ পরিবার এবং ঠাকুর পরিবারের বালকবৃন্দের মধ্যে রেষারেষি পড়িয়া যাইত। তজ্জন্য দড়ি কাটা না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই নদীর ধারে প্রতিমার নিকট যাইতে পারিত না। একবার দেবতা বিসর্জ্জনের সময়, নদীতে হাতির পৃষ্ঠে বালক মহিমচন্দ্র একটি বড় ছিপের ডগায় লম্বা সূতা লাগাইয়া রাখিয়াদিলেন। যখন বিসর্জ্জনের জন্য প্রতিমার দড়ি কাটিয়া দেওয়া হইল তখন চক্ষের পলকেই দেখা গেল বালক মহিমচন্দ্রের ছিপের টানে ঐ টুপি আকাশে ঝুলিতেছে। অন্যান্য সকলে ব্যর্থমনোরথ হইয়া অবাক হইয়া রহিল। একথা শুনিয়া মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বালক মহিমচন্দ্রের বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া শিক্ষার জন্য অন্যান্য ঠাকুর পরিবারের বালকদের সহিত কুমিল্লা স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

বীরচন্দ্রের প্রধানা মহিষী ভানুমতী দেবী মহিমচন্দ্রকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। রাজ জ্ঞাতি পরিবারের দৌহিত্রী দীনময়ী দেবীর (৯ বৎসর বয়সে) মহিমচন্দ্রের ১৩ বৎসর বয়সে বিবাহ অতীব আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন করিয়া দেন। পঠদ্দশায় তিনি তাঁহার জ্যাঠাইমার সহিত কুমিল্লায় অবস্থান করিতেন। ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যে তিনি ক্লাশে সাধারণতঃ প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করতেন। কুমিল্লার মহারাজের স্কুল উঠিয়া যাওয়ায় দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় ১৮৮৪ সালে ১৮ বৎসর বয়সে হেয়ার স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। হেয়ার স্কুলে কলিকাতার ঠাকুর পরিবারের বঁলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা প্রমথ মিত্র প্রভৃতি তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। তখন ১৪নং কলেজ ষ্ট্রীটে শ্রীহট্ট মেসে বাস করিতেন। সেখানে দেশপূজ্য শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ব্রাহ্ম এবং অন্যান্য ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন যুবক থাকিতেন। বৈষ্ণব পরিবার হইতে আসিয়া এরূপ ব্রাহ্ম প্রভাবের মধ্যে থাকা তাঁহার পক্ষে একটু কষ্টকর হইয়াছিল। পরে ব্রাহ্ম যুবকদের সঙ্গে মিলামিশা করিয়া ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করিতেন। কিন্তু গোড়ামী দেখিতে পারিতেন না। তখন পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় হেয়ার স্কুলে অধ্যাপনা করিতেন, এবং তাঁহাদের অভিভাবক ছিলেন। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় অঙ্কে ফেইল করায় আর পুনরায় পরীক্ষায় দেওয়া হইল না। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রাইভেটভাবে Lecture শুনিতেন এবং অবসর কালে ঠাকুরবাড়ী, শোভা বাজারের রাজাদের বাড়ী, মহারাজ যঁতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ী, নবাব আব্দুল লতিফ এবং অন্যান্য গণ্যমান্য পরিবারে তাঁহার ছাত্র বন্ধুদের সহকারে যাতায়াত করিতেন। সকলেই তাঁহাকে তাঁহার সুচতুর বুদ্ধিমত্তায় এবং মিষ্টালাপের জন্য স্নেহ করিতেন। এদিকে তিনি নবাব আবদুল লতিফ প্রভৃতির পরিচয় পত্রের দ্বারা লাট দরবারে এবং উদ্যান সম্মিলন প্রভৃতিতে যোগদান করিতেন। ইহার ফলে দার্জ্জিলিং এ Excise ডিপার্টমেন্টে ১০০্ কি ১৫০্ টাকা বেতনে ইনস্পেকটারী পদে

চাকরী পাইয়াছিলেন। বীরচন্দ্র মাণিক্য ইহা শুনিয়া তাঁহাকে সেই কিশোর বয়সেই এডিকং পদে নিযুক্ত করেন। গভর্ণমেন্টের চাকুরী তিনি গ্রহণ করিতে দেন নাই। ত্রিপুর রাজ্যের এবং রাজার সেবায় বংশ পরম্পরায় তাঁহারা নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া তিনি ভবিষ্যৎ উন্নতিকর গভর্ণমেন্টের চাকুরী উপেক্ষা করিয়া বীরচন্দ্রের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। মহারাজ বীরচন্দ্র ফটোগ্রাফীতে তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়া এ কার্য্যেও তাঁহাকে সহকারীরূপে নিযুক্ত করেন। কলিকাতায় তাঁহার বন্ধু মহলে তিনি আজীবন যোগ রাখিয়া গিয়াছেন। এই সময় ত্রিপুর রাজপরিবারের সহিত ঠাকুরবাড়ী, শোভা বাজারের রাজবাড়ী, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, নাটোরের মহারাজা প্রভৃতির বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়।

ইতিমধ্যে বীরচন্দ্রের প্রধানা মহিষীর গর্ভজাত বড় ঠাকুর সমরেন্দ্রচন্দ্রের রাজ্যপ্রাপ্তি সম্পর্কে কতকগুলি ঘটনায় মহারাজা এবং তাঁহার প্রথম পুত্র যুবরাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের সদ্ভাব নষ্ট হইবার উপক্রম ঘটে। তখন মহিমচন্দ্রের বিচক্ষণ বুদ্ধির সাহায্যে রাধাকিশোর স্বীয় সম্মান এবং যুবরাজী বহাল রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বীরন্দ্র মাণিক্য এজন্য মহিম ঠাকুরের পরিবারের উপর বিশেষ বিরক্ত হইয়া পড়েন। ফলে এ পরিবার নানা প্রকারে সামাজিক এবং আর্থিক কষ্টে পতিত হন। বীরচন্দ্রের প্রিয় পার্শ্বচর ভারতচন্দ্র ঠাকুরও পুত্র মহিমচন্দ্রের কার্য্যের জন্য নানারূপে নিগ্রহ ভোগ করিতে থাকেন। শেষ জীবনে ভুল সংশোধন করিতে বীরচন্দ্র মাণিক্য ভারত ঠাকুর ও তাঁহার পুত্র মহিমচন্দ্রকে আহ্বান করিয়া লইয়া যান, এবং মরণ পর্য্যন্ত ইহাদিগকে তাঁহার সঙ্গে রাখিয়াছিলেন।

বীরচন্দ্রের মৃত্যুর পর ত্রিপুরার গৌরবরবি যুবরাজ রাধাকিশোর রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। তিনি যৌবরাজ্যের সময়ের অন্তরঙ্গ মহিমচন্দ্রের প্রত্যুপকার করিতে ভুলিলেন না। মহিমচন্দ্র তাঁহার সর্ব্ব কার্য্যেই দক্ষিণ হস্ত হইয়া দাঁড়াইলেন। যুবরাজীর আমলে অর্থের অনটনে তিনি মহিম ঠাকুরের যোগে যে ঋণ করিয়াছিলেন তাহা এবং মহিম ঠাকুরের দেব-ব্রাদার্স নামীয় দোকানের (দেব ব্রাদার্সের দেনা) যে বার হাজার টাকা দেনা হইয়াছিল তাহা সমস্ত শোধ করিয়া দেন। রাজকোপে পতিত হওয়ায় উক্ত দেব-ব্রাদার্সের প্রায় বার হাজার টাকা পাওনা ছিল। কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ ভূমিকম্পে রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ মাল-মসলা দিয়া মহারাজ রাধাকিশোর তাঁহার বাড়ী পাকা করিয়া দেন। ত্রিপুররাজ্যের সর্ব্বকার্য্যেই তখন মহিম ঠাকুর সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। লাট দরবারে এবং দেশীয় রাজদরবারে মহারাজার প্রতিনিধি হইয়া সর্ব্বত্র তিনি গতিবিধিপূর্ব্বক মহিম ঠাকুর স্বীয় বুদ্ধির প্রখরতায় সকল স্থানেই ত্রিপুর রাজ্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া আসিয়াছিলেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তিনি বর্ত্তমান মহীশূর রাজোদ্বাহে নিমন্ত্রিত হন এবং মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের প্রতিনিধিরূপে সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে মহীশূর রাজ্যে গমন করেন। তাঁহার ব্যক্তিগত নিমন্ত্রণের একটি কারণ ছিল।

বীরচন্দ্র মাণিক্য কলিকাতায় দেহত্যাহ করিলে তাঁহার দেহাবশেষ কেওড়াতলা ঘাটে মহীশূর রাজ-শ্মশানের নিকট দাহ করা হয়। পরে দেখা যায় ভুলক্রমে মহীশূর রাজ-শ্মশানের সীমানার মধ্যেই বীরচন্দ্র মাণিক্যের দাহস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ইহা লইয়া গবর্ণমেন্টের যোগে এই দুই রাজ্যের মধ্যে উকিলের চিঠি এবং নানাপ্রকারে মিঠা কড়া সুরে লিখাপড়া চলিতে থাকে। এবং উভয় পক্ষেই বে-আইনী তর্ক তুলিয়া দিস্তার পর দিস্তা কাগজ নষ্ট করিতে থাকেন। প্রায় ৫/৬ বৎসর কাল এরূপ মনোমালিন্য চলার পর কলিকাতায় মহীশূরের স্বনামধন্য মন্ত্রী শেষাদ্রি আয়ারের সহিত কাগজপত্র লইয়া মহিমঠাকুর দেখা করিতে যান। উক্ত মন্ত্রী বাহাদুর প্রথম দর্শনেই ত্রিপুরার পক্ষীয়দের বেআইনী কার্য্য ও Jurisdiction না মানিয়া কার্য্য করা নিতান্তই গর্হিত হইয়াছে বলিয়া কাগজপত্র দেখাইতে বসিলেন। তখন তিনি অনুনয় করিয়া বলিলেন-শ্মশানে চলুন, তাহলে এ বিষয়ের অবস্থা বুঝিতে পারিব। শ্মশানে উপস্থিত হইলে তিনি উক্ত মন্ত্রী মহোদয়কে বলিলেন "আপনি সুব্রাহ্মণ এবং একটী প্রাচীন সুবৃহৎ ভারতগৌরব হিন্দুরাজ্যের মন্ত্রী। আমিও একটি অতিপ্রাচীন হিন্দুগৌরব ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজপ্রতিনিধি মাত্র। আমি জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে, একটি হিন্দুরাজ্যের নরপতির কোলে আর একটি হিন্দুরাজা মহানিদ্রায় সমাহিত-আজ Jurisdiction তর্ক তুলিয়া তাঁহাদের দেহাবশেষ লইয়া আমাদের এই সুদীর্ঘ ৫ বৎসর এরূপ ঝগড়াঝাটি করা কি শোভা পাইবে? আইনের চশমা খুলিয়া হৃদয় দিয়া বুঝিলেই এ বিষয়ের সুমীমাংসা হইবে।" রাজনীতিবিশারদ শেষাদ্রি আয়ার কিছুক্ষণ স্তব্ধ

থাকিয়া বলিলেন, ''হ্যাঁ, সব মীমাংসা হইল। আপনারই জয় হইল। চলুন আমরা আজ দুই রাজার শ্মশান ধূপ ফুল চন্দনা দিয়া পূজা করি এবং এতদিনের অনর্থক লেখালেখির কাগজগুলি এখানেই ধ্বংস করি।'' পরে এই সাব্যস্ত হইল যে এ শ্মশানের চারিদিক একটী উদ্যান প্রতিষ্ঠিত হইবে; এই দুই মহারাজের শ্মশান মন্দিরের মধ্যবর্ত্তী গঙ্গার ঘাটে মহিশূরের এবং ত্রিপুরার প্রজার জন্য সর্ব্বদা অবাধে যাতায়াতের পথ উন্মুক্ত থাকিবে এবং মহীশূরের দরবার হইতে এই দুই সমাধি মন্দিরেই সমভাবে মহীশূরী ধূপ জ্বালান হইবে। এই পরিচয়ের সূত্র ধরিয়াই শেষাদ্রি আয়ারের সহিত তাঁহার পত্রযোগে নানা বিষয়ে আলাপ চলিত এবং ইহারই ফলে মহীশূরের রাজ-বিবাহে ব্যক্তিগতভাবে নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলেন। তদানীন্তন সময়ের প্রদীপ মাসিক পত্রে কবি নবীনচন্দ্র সেনের বিশেষ অনুরোধে মহীশূর রাজোদ্বাহের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই পুস্তকেও সেই বিবরণ প্রকাশিত হইল।

মহীশূরের বিবাহ উৎসব শেষে রাজমাতা রিজেন্ট মহোদয়ার সহিত বিদায় লইতে গেলে মহারাণী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন-''বিশেষ অসুবিধা ও পথক্লান্তি সহ্য করিয়া আপনারা এ বিবাহে যোগদান করিয়াছেন, কোন ত্রুটী যেন গ্রহণ না করেন।'' তদুত্তরে তিনি বলেন ''এইরূপ রাজসূয় যজ্ঞের বিরাট ব্যাপারে ত্রুটী হওয়াই সম্ভব কিন্তু অতি সুন্দররূপেই কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছে কোন অংশেই কোন বিষয়ে খুঁৎ নাই। মানুষ পরদোষান্বেষী কিন্তু আমি চেষ্টা করিয়াও এ ব্যাপারে কোন ত্রুটী ধরিতে পারি নাই। তজ্জন্যই দুঃখ রহিয়া গেল।'' এ উত্তরে মহারাণী বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে আরও কয়েক দিবস মহীশূরে থাকিয়া রাজ্যের প্রজামঙ্গলকর অনুষ্ঠানগুলি দেখিয়া যাইতে অনুরোধ করেন।

রাধাকিশোর মাণিক্যের সময় বীরেন্দ্রকিশোর যৌবরাজ্য লইয়া Alipur Court- এ বড়ঠাকুর সমরেন্দ্রচন্দ্র যে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করেন তাহাতে সাব্যস্ত হয় যে দেশীয় রাজ্যের এই সব ব্যাপার মীমাংসা করা সরকারী কোর্টের Jurisdiction এর বাহিরে। তৎপর ভারত গবর্ণমেন্টের হস্তে এই বিবাদের মীমাংসার ভার পড়িলে লর্ড কার্জ্জনের দরবারে মহারাজার প্রতিনিধি হইয়া মহিম ঠাকুরকে যাতায়াত করিতে হয়। গবর্নর জেনারেল কার্জ্জন সাহেব একদিন কথা প্রসঙ্গে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন '' তোমার কথাবার্ত্তায় তোমাকে বিশেষ আইনজ্ঞ বলিয়া মনে হইতেছে। তুমি কি বিশ্ব বিদ্যালয়ের বি, এল ডিগ্রী পাইয়াছ? তদুত্তরে তিনি বলেন ''আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছায়াও জীবনে মাড়াই নাই। প্রবেশিকা পরীক্ষায় অঙ্কে ফেইল করিয়া স্কুল পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। তবে দেশীয় রাজ্যের প্রজা বলিয়া দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে সব নাই। প্রবেশিকা পরীক্ষায় অঙ্কে ফেইল করিয়া স্কুল পরিত্যাগ করিয়ছিলাম। তবে দেশীয় রাজ্যের প্রজা বলিয়া দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে সব Literature এবং দৈহিক ইংরেজী খবরের কাগজগুলি আমার দৈনিক আহার যোগায়।'' একদিন এই বিবাদ সম্পর্কে তিনি কার্জ্জন সাহেবকে বলেন যে, মহারাজের শেষ কথা এই যে তিনি রাজত্ব করিতে চান, রাজ্যের ইজারাদারী করিতে চান না। অর্থাৎ পুত্রের যদি পিতার পরেই রাজ্যপ্রাপ্তি না হয় তবে রাজার নিকট রাজ্যের ভবিষ্যৎ উন্নতি উপেক্ষিত হয় এবং রাজকোষের টাকা যথেচ্ছরূপে ব্যয়িত হইতে থাকে। এ অবস্থায় ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট ভাই অপেক্ষা পুত্রের দাবী গ্রাহ্য হইবে বলিয়া তিনি আশা করেন। উপরোক্ত মতই লর্ড কার্জ্জন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মহিমচন্দ্রের চেষ্টায়ই এই বহুকালের গৃহবিবাদ মীমাংসিত হইয়া গিয়াছিল।

কলিকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের জন্য লর্ড কার্জ্জন মহারাজের নিকট বড়হাতেই চাঁদা চাহিয়া বসেন। এই টাকা যদি দেওয়া হয় তবে রাজ্যের বিশেষ কোন উপকার হইবে না বলিয়া রাজার পক্ষ হইতে মহিম ঠাকুর এই উত্তর দেন যে, মহারাজ আগরতলাতেই মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্মরণার্থ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন । তাহাতে মহারাজ মনে করেন ত্রিপুর রাজ্যের প্রজারা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নামে প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালে বহুতর উপকার পাইবে এবং মহারাণীর নাম স্মরণ করিয়া ধন্য হইবে। এই ব্যয় করিয়া ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলের জন্য অধিক চাঁদা দেওয়া সম্ভবপর হইবে না। একথা শুনিয়া লর্ড কার্জ্জন বিশেষ সুখী হইয়াছিলেন এবং মহারাজা অল্প চাঁদা দিয়াই সরকারের মনস্তুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন। রাজার সম্মান রক্ষার্থে মাঝে মাঝে মহিম ঠাকুরকে অনেক বিপদে পড়িতে হইত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, বড়ঠাকুরের পক্ষ অবলম্বন করিয়া কলিকাতার ব্যারিষ্টার জ্ঞান রায় গোপনে আগরতলায় আসেন। ইহা জানিয়া মহারাজ রাধাকিশোর তাঁহাকে ধরিয়া আটক রাখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, ইহা বে-আইনী ও শেষে রাজমর্য্যাদার হানি হইবে বলিয়া কর্ণেল সাহেব আপত্তি

উত্থাপন করেন। মহারাজা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া অন্য উচ্চ কর্ম্মচারী যোগে জ্ঞানবাবুকে ধরিয়া আনেন। জ্ঞানবাবু গবর্ণমেন্টের নিকট টেলিগ্রাফ করিয়া মুক্তি পান এবং তাঁহাকে অপমান করার জন্য রাজার বিরুদ্ধে গবর্ণমেন্টের নিকট আবেদন উপস্থিত করেন। তখন সেই বিপদে মহারাজকে রক্ষা করিতে গিয়া মহিমঠাকুর নিজের স্কন্ধে সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া বলেন যে, তিনিই মহারাজের আদেশের অতিরিক্ত কার্য্য করিয়াই জ্ঞানবাবুকে ধরিয়া আনেন; তজ্জন্য মহারাজ দোষী নহেন, তিনিই তজ্জন্যই শাস্তির যোগ্য এবং গবর্ণমেন্টের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তাহার ফলে তাঁহার ৫০০ টাকা জরিমানা এবং জ্ঞান রায়কে ১০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হইয়াছিল। এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে, তাহা উল্লেখ করা বাহুল্য।

রাজ দরবারে এত প্রতিপত্তি থাকিতেও তিনি কেন মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন নাই ইহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন- আমি বৈষ্ণব। কৃষ্ণ তুল্য মহারাজের দাস উদ্ধব মাত্র। আমার দ্বারা যে কার্য্য মহারাজ পাইবেন আমি মন্ত্রী হইলে সেরূপ কার্য্য পাইবেন না। ত্রিপুর রাজ্যের মন্ত্রী নির্ব্বাচনে তাঁহার হাত ছিল কিন্তু যখনি মন্ত্রীগণ সুমন্ত্রণার পরিবর্তে নিজস্বার্থ রক্ষার্থে নানা অপকর্ম্ম করিয়া বসিতেন তখনই তিনি উঠিয়া পড়িয়া এ সব মিথ্যা এবং ক্ষুদ্রতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেন। তজ্জন্য অনেকেই মনে করিতেন তিনি বাহিরের বাঙালী কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে দলাদলি করিয়া থাকেন। বাস্তবিক পক্ষে এ রাজ্য বাঙালীর অশেষ কল্যাণ চেষ্টার কেন্দ্র-ভূমি, বাঙালাদেশের গৌরব এ হিন্দুরাজ্য, ভারতবর্ষের আদর্শরাজ্যে পরিণত হয় তজ্জন্য তিনি চেষ্টিত ছিলেন, কিন্তু আমাদের জাতীয় চরিত্রের দোষে ক্ষুদ্র দলাদলির জন্য তাঁহার আদেশানুযায়ী কার্য্য হয় নাই। তবুও রাধাকিশোর মাণিক্যের আমলে রাজ্যহিতকর সকল অনুষ্ঠানের মূলেই মহিম ঠাকুর ছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে ত্রিপুর নরপতিগণ স্বীয় ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজে বা মণিপুর সমাজে বিবাহাদি আত্মীয়তা করিতেন। মহিমচন্দ্রের বিশেষ আগ্রহে এবং চেষ্টায় স্বাধীন নেপাল রাজ্যের মহারাজ জঙ্গবাহাদুরের পৌত্রীর সহিত মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরের বিবাহ দেন। পত্নী দীনময়ী দেবী স্বর্গীয়া হইলে তিনি মহারাজ রাধাকিশোরের বিশেষ অনুরোধে উপরোক্ত জঙ্গ বাহাদুরের ভ্রাতার পৌত্রীকে বিবাহ করেন। এইরূপে ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজের প্রসার বৃদ্ধি করেন। পরে স্বীয় পুত্র কন্যার বাঙালী ছত্রিসমাজে বিবাহ দিয়া সামাজিক পরিসর আরো প্রশস্ত করেন। এরূপ আদান প্রদানে ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজের প্রভূত উপকার সাধন করিয়া যান। রাজপারিষদের কাজ, তিনি বলিতেন, সত্য কথা রাজার নিকট পৌঁছান। সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি দরবারে দাঁড়াইতেন, তজ্জন্য সময় সময় রাজকোপেও পতিত হইতেন। কিন্তু তিনিই শেষে জয়লাভ করিতেন।

বাঙলাদেশের সাহিত্য বিজ্ঞান ললিতকলার ভক্ত ছিলেন মহারাজ রাধাকিশোর। তাঁহার পক্ষে বাঙালা সাহিত্যিক এবং গণ্যমান্যদের সঙ্গ লাভের সেতু ছিলেন স্বর্গীয় মহিম ঠাকুর। কবি হেমচন্দ্র, রবিবাবু, জগদীশবাবু, দীনেশবাবু প্রভৃতি মহোদয়গণ ত্রিপুরা হইতে যে বিবিধ সাহায্য পাইতেন, তাহা তাঁহার যোগেই হইয়াছিল। ত্রিপুর রাজ্যে তখন মণিপুরের মহারাজ, নাটোরের মহারাজ, রবীন্দ্র ঠাকুর, রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী প্রভৃতি রাজ অতিথিরূপে আসিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ তাঁহারি গৃহে অবস্থান করিয়া গিয়াছিলেন। স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোর জানিতেন আগরতলায় মহিম ঠাকুরের বাড়িতে এ সব গণ্যমান্য ব্যক্তি থাকিলে আদর আপ্যায়নের কিছু ত্রুটী হইবে না। মহিমচন্দ্র ছোটকাল হইতেই ইংরেজী বাঙালা অবসর কালে সর্ব্বদাই পাঠ করিতেন। দৈনিক খবরের কাগজ পাঠ করা তাঁহার একটা বিশেষ কার্য্য ছিল। দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে পুস্তকাদি এবং সংবাদ পত্র তিনি সদা সর্ব্বদা পড়িতেন। তিনি যাহা পড়িতেন তাহা দরকারী বোধ করিলে নোট করিয়া রাখিতেন। তিনি বহুকাল দৈনন্দিন কার্য্যের ডায়ারী রাখিতেন। বাঙালা ভাষার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উন্নতিকল্পে তিনি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নবীনচন্দ্র সেনের বিশেষ আগ্রহে এবং মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের উৎসাহে দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে এবং বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পর্কে প্রায়ই প্রবন্ধাদি লিখিতেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ সব প্রবন্ধ সংশোধনাদি করিয়া তাঁহাকে উৎসাহ দিতেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত বঙ্গদর্শন এবং মানসী, প্রবাসী, সাধনা, পরিচারিকা, রবি, হিতবাদী প্রভৃতিতে নানা বিষয়ের প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। ত্রিপুরার পুরাতন রাজমালাকে তিনি মহাভারত, রামায়ণের ন্যায় ভক্তি করিতেন এবং ত্রিপুরার ইতিহাসের সত্য উদ্ধারার্থে শেষ জীবনে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। ঐসব বিবরণ ভবিষ্যৎ ত্রিপুরার ইতিহাসে লেখকদের বিশেষ উপকারে আসিবে। ত্রিপুরার নানা শুভ কার্য্যে তিনি বিশেষ চেষ্টিত থাকিতেন। তাঁহারি

চেষ্টায় চাক্‌লা রোসনাবাদের Settlement জরিপের কাজ সম্পন্ন হয়। তৎফলে এ রাজ্যের জমিদারীর আয় ৬ (ছয়) লক্ষ হইতে ১০ (দশ) লক্ষে পরিণত হয়। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে রাজ্যকে সমস্ত মোকর্দ্দমা ইত্যাদি হইতে মুক্ত করিয়া স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য তীর্থ দর্শনে কাশীধামে গমন করেন এবং কাশীনরেশের অতিথি হন। বিশ্বেশ্বরের আহ্বানে মহারাজ রাধাকিশোর মোটর দুর্ঘটনায় তাঁহারই পদপ্রান্তে দেহ রক্ষা করিয়া মোক্ষলাভ করেন। সঙ্গে মহিমচন্দ্রও ছিলেন। তিনিও বিশেষরূপে আহত হন এবং তাঁহার জীবন সংশয় হইয়াছিল। ভাগ্যগুণে তিনি মৃত্যু মুখ হইতে রক্ষা পাইলেন বটে কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই ভগ্নস্বাস্থ্য তিনি আর ফিরিয়া পাইলেন না। তিনিও রাজকার্য্য হইতে একরূপ অবসর গ্রহণ করিলেন। মাঝে মাঝে গুরুতর রাজ কার্য্যোপলক্ষে স্বর্গীয় মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর তাঁহাকে আহ্বান করিতেন এবং তাঁহার মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত তাঁহার চিকিৎসা এবং ভরণপোষণের জন্য মুক্তহস্তেই সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। পিতার আমলের সুকার্য্যের জন্য তাঁহার পুত্র শ্রীমান সোমেন্দ্রচন্দ্রের শান্তিনিকেতনে, কলিকাতার কলেজে,এবং বিলাত আমেরিকার শিক্ষার সকল খরচ মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর রাজকোষ হইতেই প্রদান করিয়াছিলেন। শেষ জীবন তিনি সাহিত্য আলোচনায় এবং বঙ্গভাষায় নানা প্রবন্ধ লেখায় কাটাইয়া গিয়াছেন। তিনি ভারতীয় অনেক দেশীয় রাজ্যের রাজা এবং মন্ত্রীদের সহিত বিশেষ বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি কেবল বঙ্গদেশে নয় সমস্ত ভারতবর্ষেই বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে কলিকাতার ষ্টেট্‌সম্যান, ইংলিশম্যান, ডেলিনিউস্, অমৃতবাজার প্রভৃতি পত্রিকাগুলি তাঁহার প্রশংসোক্তিপূর্ণ শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনে উদারনীতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন-বৈষ্ণব পরিবারে বিশেষতঃ তাঁহার পিতার বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রগাঢ় প্রীতি ও অনুরাগ এবং তাঁহার জ্যেঠিমার পূজা অর্চ্চনার প্রভাব তাঁহার জীবনে বৈষ্ণব ধর্ম্মানুরাগ সঞ্চার করিয়া দেয়। কুমিল্লায় পড়িবার কালে কোন মিশনারীর বক্তৃতা শুনিয়া তিনি খৃষ্টধর্ম্মের অল্প মূল্যের অনেক বই খরিদ করিয়া একটী আলমারী বোঝাই করিয়া একটি লাইব্রেরী স্থাপনের সূত্রপাত করেন। জ্যেঠিমা যখন জানিতে পারিলেন-যে ঐ সব খৃষ্টানী বই-একদিন মহিমচন্দ্র স্কুলে গেলে ঐ সব পুস্তক তিনি অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন। স্কুল প্রত্যাগত মহিমচন্দ্র তাঁর নূতন লাইব্রেরির এ দুর্দ্দশা দেখিয়া একেবারে মর্ম্মাহত হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন-তখন জ্যেঠিমা সান্ত্বনা দিয়া বলেন-''বাবা ঐ সব বই এ কৃষ্ণনিন্দা আছে বলিয়া তোর মাষ্টারমশায় বলেছেন-কৃষ্ণনিন্দা যে করে সে নিরয়গামী হয়। তোকে ভাল বই দিব।'' তারপর হইতে 'শ্রীচরিতামৃত' এবং বৈষ্ণব পদাবলী প্রভৃতি তাঁহাকে রোজ জ্যেঠিমাকে শুনাইতে হইত। অন্তরে তিনি বৈষ্ণব দর্শনের সৌন্দর্য্য তত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং পরজীবনে বৈষ্ণব দার্শনিক ভূতপূর্ব্ব রাজদ্বার-পণ্ডিত বাচস্পতি মহাশয়ের সহিত বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং তত্ত্ব আলোচনা করিতেন।

তিনি রাত্রে মালা জপ করিতেন-একদিন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন ''বাবা আপনি বৈষ্ণবের আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম মতে চলেন না-তবে মালা নেওয়ার সার্থকতা কি?''

তদুত্তরে তিনি বলেন-''তুই রবিবাবুর ভক্ত শিষ্য, আমি তাঁর অনুরক্ত বন্ধু-তাঁর ''পরশ পাথর'' কবিতায়–

''ক্ষ্যাপা খুঁজে ফিরে পরশ পাথর
মাথায় বৃহৎ জটা''

এ কবিতার অর্থই আমার জপ করার মূল অর্থ বলিয়া দিবে। ঐ ক্ষ্যাপার ন্যায় আমি নাম জপ করি, যদি শ্রীভগবানের দয়া হয় আমার অলক্ষিতেই এই পাষাণসম জীবন সোনা হইয়া উঠিবে।''

যৌবনে যে রাজর্ষির সেবায় তিনি ধন্য হইয়াছিলেন-সেই মহানুভব বীরচন্দ্র মাণিক্যের কেওড়াতলার শ্মশান মন্দিরের পার্শ্বেই ১৪ই শ্রাবণ ১৮৪৫ শকাব্দে ভগবানের অমোঘ বিধানে তাঁহার নশ্বর জড়দেহ রক্ষা করিয়া স্বর্গগত মনিব মহারাজ বীরচন্দ্র এবং রাধাকিশোরের অমর আত্মার সন্ধানে মহাপ্রয়াণ করিলেন।

ত্রিপুরা সরকার
উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র
আগরতলা

১৯৯৬ ইং সনে প্রকাশিত সোমেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা মহোদয়ের লিখা ‘দেশীয় রাজ্য’ শীর্ষক পুস্তকটির দ্বিতীয় সংস্করণ সুধী পাঠক ও গবেষকদের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি করতে পেরেছে এবং ঐ পুস্তকটি ইতিমধ্যেই নিঃশেষিত হয়েছে।

পাঠকদের আগ্রহের কথা বিবেচনা করে রাজ্য সরকার পুস্তকটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

আশা রাখি এই পুস্তকটির তৃতীয় সংস্করণটি ও পাঠক ও গবেষকদের চাহিদা পূরণ করতে সমর্থ হবে এবং সমাদৃত হবে।

(সুনীল দেববর্মা)
অধিকর্তা
উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র
ত্রিপুরা সরকার
লেইক চৌমুহনী, কৃষ্ণনগর, আগরতলা।

তারিখ ঃ জানুয়ারী,২০১৭ইং
আগরতলা।

পুনঃ সংস্করণের ভূমিকা

ত্রিপুরা ট্রাইবেল রিসার্চ ইনস্টিটিউট ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস, শিক্ষা-সংস্কৃতি, লোকাচার উপকথা প্রভৃতির উপর প্রামাণ্য দলিল ও গ্রন্থাদি প্রকাশের উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। যাতে ত্রিপুরার শিক্ষা সংস্কৃতি প্রেমী, গবেষক ও নতুন প্রজন্মের কাছে ত্রিপুরার ঐতিহাসিক মূল্যবোধ, সংস্কৃতি চেতনা, মেলবন্ধনের ধারাবাহিকতা এবং যোগসূত্রগুলি উন্মেষিত করা যায়, যা আজকাল পুনঃপ্রকাশ ও সংরক্ষণের অভাবে অবলুপ্তির পথে-তার জন্য আমরা স্বততঃই সচেষ্ট আছি। ভারত স্বাধীন হওয়ার পূর্ব্বে রাজন্য শাসিত ত্রিপুরার ইতিহাস বহু ঘাত প্রতিঘাতে নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে এক গৌরবময় অধ্যায় সূচিত করে গিয়েছিল, শিক্ষা, সাহিত্য, ললিত-কলা, সংগীতে-যার মূল ভিত্তি ছিল-''দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে।" সেই সময় ত্রিপুরায় বিভিন্ন জাতির উদারতায় ও আপন করার মানসিকতায় গড়ে উঠেছিল, ''মিলনায়তন মিশ্র সংস্কৃতির সুদৃঢ় ভিত"পুরা জাতির তথা মহারাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায়, সে কথা বলা বাহুল্য।

রাজনৈতিক অস্থিরতা, মানবিক উৎকর্ষতা ও মিশ্র সংস্কৃতি পল্লবিত হওয়ার যুগ সন্ধিক্ষণে ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেববর্মার প্রতিভার বিকাশ ঘটে। তিনি ত্রিপুরাকে পুরাতন আদল হতে আধুনিকীকরণের প্রশাসনিক প্রক্রিয়াগুলির নীরব অবলোকনে ও বিশ্লেষণে তৎসময়ের একজন সাক্ষী। পরবর্তী সময়ে তার চিন্তা-চেতনা ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সাময়িকীতে প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করেছিলেন, যার সুসংহত রূপ হলো, ''দেশীয় রাজ্য"।

ত্রিপুরার ইতিহাসের তথাকথিত 'আধুনিক যুগের' রূপকারদের মধ্যে তিনিও একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি উনার বিভিন্ন প্রবন্ধগুলিতে অতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে যে পাণ্ডিত্য, দূরদর্শিতা ও রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় দিয়ে গেছেন, তা এককথায় অনন্য। ত্রিপুরার অতীত ইতিহাস অনুসন্ধিৎসুদের কাছে এই প্রবন্ধগুলি অনেক অজানা তথ্য দিয়ে সমৃদ্ধ করবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু, সুধী পাঠক, ভবিষ্যত ত্রিপুরা গড়ার কারিগত তথা নব-প্রজন্মের কাছে এই মূল্যবান পুস্তকটি একটি মানবিক মূল্যবোধ, চিন্তা-চেতনায় আলোড়ন সৃষ্টি করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

প্রায় হারিয়ে যাওয়া এই পুস্তকটি সংগ্রহে নিরলস শ্রম ও আন্তরিকতায় দপ্তরের কর্মী শ্রীমান অরুণ দেববর্মা যে পরিমাণ স্বপ্রণোদিত হয়ে পুনঃ উদ্ধার করেছেন, তাতে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করতে চাই না। পুস্তকটি হস্তান্তর করে পুনঃপ্রকাশে সহায়তা করায় আমি শ্রীমতী দীপ্তা দেববর্মাকে (এ্যাসিস্টেন্ট রেজিষ্ট্রার অফিসার, কো-অপারেটিভ) এবং পুস্তকের শতচ্ছিন্ন পৃষ্ঠাগুলি নিজস্ব সংগ্রহ হইতে জেরক্স করে পূর্ণরূপে দেওয়ার জন্য আমি শ্রীমতী অসীমা দেববর্মা (জয়েন্ট ডাইরেক্টর, সমাজ কল্যাণ দপ্তর (ঁমহিম কর্ণেলের প্রপৌত্রী) এবং উনার পুত্রবধূ গবেষক শ্রীমতী জয়া দেববর্মাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরিশিষ্টাংশে সংযোজিত মহিম কর্ণেলের 'রিয়া' নামক প্রবন্ধটি ক্যাপটেন ঁনগেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা নিজ হস্তে লিখে রাখায় এবং সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত অলক দেববর্মা (সংগীত বিশারদ) হস্তান্তর করায় পুনঃপ্রকাশ করা গিয়াছে। তারজন্য শ্রীদেববর্মাকেও

অশেষ ধন্যবাদ। প্রকাশক শ্রীযুক্তঁ সোমেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মার (এম এ হার্বার্ড) ত্রিপুরা সেন্সাস বিবরণী-১৯৩১ রচয়িতা) সুযোগ্য কন্যাসহ আরও অন্যান্য উত্তরসূরীরা পুস্তকটি প্রকাশে আন্তরিক শুভেচ্ছা সহ সম্মতি প্রদান করে আমাদের বাধিত করেছেন। তার জন্য আমি উনার নিকট কৃতজ্ঞ ও ঋণী।

অবশেষে পুস্তকটি প্রকাশে ক্যাক্সটন প্রিন্টার্স-এর কর্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শুভব্রত দেব ও উনার সহকর্মীদের অকৃত্রিম প্রচেষ্টায় অতিসত্বর পাঠকবর্গের কাছে মুদ্রিতাকারে পৌঁছে দেবার জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

(ডি কে ত্যাগী)

কমিশনার,

ত্রিপুরা সরকার, উপজাতি কল্যাণ দপ্তর।

উৎসর্গ পত্র

যাঁহার সাহচর্য্য এবং সেবায়
আমার মানব জন্ম
সার্থক হইয়াছে
সেই মহানুভব ভারত গৌরব
স্বর্গগত ত্রিপুরেশ্বর
মহারাজ রাধাকিশোর দেববর্মা মাণিক্য বাহাদুর
অমর আত্মার
উদ্দেশ্যে
আমার এই ভক্তি-চন্দন লিপ্ত
হৃদয়-অর্ঘ্য অর্পণ করিয়া
কৃতার্থ হইলাম।

সেবকাধম
শ্রীমহিম

আগরতলা
১৫ই ফাল্গুন, ১৩৩২ ত্রিপুরাব্দ।

— ঃ শুভেচ্ছা ঃ —

ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতীয় সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র ও সংগ্রহশালা স্বর্গীয় ঠাকুর শ্রীযুত মহিমচন্দ্র দেববর্মা (কর্ণেল) প্রণীত ''দেশীয় রাজ্য'' গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশের উদ্যোগ নেওয়ায় আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।

এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থটি বর্তমানে প্রায়সই পাওয়া যায় না, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ত্রিপুরার অতীত ইতিহাসের তথা ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশীয় রাজ্য সমূহের উপর সমসাময়িক কালের বিভিন্ন ঘটনাবলী ও রাজনৈতিক উত্থান পতনের প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে এই গ্রন্থটিতে নিজস্ব বিচার বিশ্লেষণ ও অনুধাবনসহ তিনি যেভাবে নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ ভাষ্য দিয়ে বিধৃত করে গেছেন, তা এককথায় অনন্য। ত্রিপুরার অতীত ইতিহাস, বিশেষতঃ বীরচন্দ্র মাণিক্যের আমলে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, ব্রিটিশ রাজপুরুষদের স্বৈরচারিতা, ও নব্য শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য বল প্রয়োগ তার জন্যে মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের সহিত মনোমালিন্য, ভাষা-শিল্প-সাহিত্য-চর্চা, দরবার ও দরবারীদের সম্বন্ধে আলোচনাগুলিও কৌতূহলোদ্দীপক।

গ্রন্থটি সর্ব সাধারণ্যে অতীত ত্রিপুরা ও রাজ আমলের অনেক অজানা তথ্য জানতে সাহায্য করবে বলে আশা করি।

গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশনের উদ্যোগ নেওয়ায় উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের কমিশনার মিঃ ডি. কে. ত্যাগী, অধিকর্তা শ্রীমানিকলাল রিয়াং মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পুস্তকটি উদ্ধার করে প্রকাশনার দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে নিরলস শ্রম দিয়ে গ্রন্থটি সুন্দরভাবে প্রকাশের জন্য অরুণ দেববর্মাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

অবশেষে আমরা লেখক ও প্রকাশকের উত্তরসূরী হিসাবে গ্রন্থটি পাঠক মহলে সমাদৃত হলে নিজেদের ধন্য মনে করবো।

বিনীত-

অসীমা দেববর্মা

রথীন দেববর্মা

পঙ্কজা দেববর্মা

ডাঃ কুশাঙ্কু দেববর্মা

শ্রী হাসি রায়

সূচীপত্র

ভারতে দেশীয় রাজ্যের স্থান ❑০১-০৫

দেশীয় রাজ্যের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ❑০৬-১২

দেশীয় রাজ্য ❑১৩-৩৫

দিল্লীর দরবার ও ভারতীয় নৃপতিবৃন্দ ❑৩৬-৩৮

দিল্লীর শিল্প প্রদর্শনী ❑৩৯-৪২

দেশীয় রাজগণ ও উপাধি-ব্যাধি ❑৪৩-৪৭

দেশীয় রাজ্যের বর্ত্তমান সমস্যা ❑৪৮-৫১

ত্রিপুরায় বীরচন্দ্র ❑৫২-৬৫

ঝুলন-স্মৃতি ❑৬৬-৭২

হোরি ❑৭৩-৭৮

বীরচন্দ্রের শাসনে জেল ❑৭৯-৮১

ত্রিপুর দরবারে রবীন্দ্রনাথ ❑৮২-৮৯

ত্রিপুরা-প্রসঙ্গ ❑৯০-৯৬

ত্রিপুরায় বঙ্গভাষা ❑৯৭-৯৯

বার্ষিক ❑১০০-১০৫

ত্রিপুরার শিল্প ❑১০৬-১১০

মণিপুর চিত্র ❑১১১-১২৩

মহীশূর রাজোদ্বাহ ❑১২৪-১৩৪

পরিশিষ্ট

রিয়া ❑১৩৫-১৪০

দেশীয় রাজ্য

প্রথম ভাগ

ভারতে দেশীয় রাজ্যের স্থান।

প্রবলবন্যায় দেশ ডুবিয়া গেলে, অকূল জলরাশির মধ্যে তরুরাজি-শোভিত শান্তি-নিকেতন গ্রামগুলি যেমন জাগিয়া থাকে, বর্তমান ভারতের মানচিত্রে, ব্রিটীশাধিকৃত রক্তিম প্লাবনের মধ্যে মধ্যে হরিত বর্ণ দেশীয় রাজ্যগুলি নিজ অস্তিত্ব এবং সজীবতা বজায় রাখিয়া অতি আরামে, সুখ-স্বচ্ছন্দে তেমনি জাগিয়া আছে। Uneasy lies the head that wears a crown ইহা ইংরেজি প্রবাদ; কিন্তু ভারতনৃপতিগণ রাজ-মুকুট ধারণ করিতেছেন অবাধে এবং নিশ্চিন্ত মনে। বহিঃশত্রু হইতে সুরক্ষিত, একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষশূন্যভাবে, কেবল নিজ রাজ্যটিকে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রজার যথার্থ মা-বাপ রূপে আজ ভারতে এই দেশীয় নৃপতিবর্গ সুখ-সম্পদে, সম্মানে প্রজার পূজ্য হইয়া বিরাজ করিতেছেন। কেবল নিজ রাজ্যের নহে-পরোক্ষভাবে সমগ্র ভারতের পরম উপকার সাধন করিতে পারেন- ভারতের যথার্থ হিতসাধন করিতে পারেন-এমন শক্তি সুবিধা সমগ্র জগতে অন্য কোথাও কাহারও আছে কিনা, বলিতে পারি না। এমন অবাধ-সুবিধা, এমন শান্তিময় সিংহাসন ক্ষুদ্র হউক আর বৃহৎ হউক, সমগ্র ভারতের দেশীয় নৃপতিবৃন্দের করায়ত্ত থাকিতে, তাঁহারা যদি নিজ অস্তিত্ব, নিজ দায়িত্ব, ভারতবর্ষের মধ্যে তাঁহাদের মহত্ত্ব, অনুভব করিতে সক্ষম না হন, তা হইলে তাঁহারা নিতান্তই ''দয়ার পাত্র''। এই ভগবৎ প্রেরিত সহজ সুযোগ যদি তাঁহারা হেলায় উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিতান্তই দুর্ভাগ্যগ্রস্ত। যদি এই মহৎ সুযোগাদি ব্যক্তিগত খামখেয়ালিতে উচ্ছৃঙ্খলতায় বিলাসিতায় বা স্বেচ্ছাচারিতায় নষ্ট করিতে দেখা যায়, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতি ভারতবর্ষ অভিসম্পাত ব্যতীত আর কি প্রদান করিতে পারে? সৌভাগ্য বশতঃ ভারত-নৃপতিগণ মধ্যে অদ্য যে সকল স্বনামধন্য নৃপতি এই মহৎ তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহারা ভারতবর্ষের মহোপকার সাধন করিতেছেন, তাঁহারা ভারতবাসীর পূজনীয় হইয়াছেন; সু-কার্য্যের দৃষ্টান্ত দানে তাঁহার অপর নৃপতিবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু তথাপি অনেক রাজ্য আজও '' যে তিমিরে-সে তিমিরে'' পতিত হইয়া আছে, কর্ত্তব্য- দেবতা দ্বারে আঘাত দিয়াও তাঁহাদের সাড়া পাইতেছেন না। ভারতলক্ষ্মী তাঁহাদের দ্বারে ভিক্ষা মাগিয়াও ভিক্ষা পাইতেছেন না, ইহা সমগ্র ভারতের দুঃখের ও পরিতাপের বিষয় নয় কি? দেশীয় রাজ্য সমূহে ভারতবাসীর রাজ্য শাসনে যেরূপ প্রতিভা সম্যক এবং স্বাধীনভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, ব্রিটীশ ভারতে তাঁহাদের তদ্রুপ প্রতিভা বিকাশের সম্ভাবনা ছিল না। Sir T. Madhav Rao, Sir Salar Jung, Sir Dinkar Rao, Sir Seshia Sastri, Sasadri Ayer, R.C.Dutta, V.P.Madhav Rao, Sir Jung Bahadur, Kanti Ch. Mukherjee, Sansar Ch. Sen, Rai Kalika Prasad Dutta Bahadur প্রভৃতির প্রতিভা দেশীয় রাজ্যেই স্ফুরিত হইয়াছে। তাঁহাদের জীবনী সমালোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। দেশীয় রাজ্যে তাঁহারা যে প্রতিভা, যে রাজধর্ম-প্রবণতা দেখাইয়া গেলেন, তাহা ভারতের অন্য ক্ষেত্রে কখনও সম্ভব হইতে কি? এই সকল স্বনামধন্য মহাপুরুষ ব্রিটীশ ভারতে হয়তো ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট , সব্জজ্, না হয় ডি ডিষ্ট্রিক্ট জজ্ রূপেই লীলা সম্বরণ করিতেন; কিন্তু বিধাতা দেশীয় রাজ্যে তাঁহাদিগকে সর্বোচ্চ ক্ষমতা পরিচালনের প্রশস্ত ক্ষেত্র দিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা আজ ভারত-আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র- লোকে আসন লাভ করিয়াছেন! অধ্যাপক Max Mauller তাঁহার Auld Lang Syne গ্রন্থে লিখিয়াছেন;-

দেশীয় রাজ্য

"The clock on the tower of the Houses of Parliament sounds louder than the repeater in our waist coat pocket but the machinery, the wheels within wheels and particularly the spring have all the same tasks to perform as in Big Ben himself. Even men like Disraeli or Gladstone, if placed in the position of these native statesmen could hardly have been more successful in grappling with the difficulties, with envious neighbours, a weak sovereign and all powerful suzerain, to say noting of court officials. We are too much given to measure the capacity of ministers and statesmen by the magnitude of the results which they achieve with the immense forces placed at their disposal. But most of them are very ordinary mortals."

মর্ম্ম; – ব্রিটীশ পার্লিয়ামেন্ট সৌধ-শিখরের বৃহৎ ঘড়িটি, পকেটস্থ ছোট ঘড়িটির অপেক্ষা আওয়াজ বেশি দেয় বটে, কিন্তু ছোট পকেট-ঘড়িটির কলকব্জা, চাকার ভিতর চাকাগুলির বিশেষতঃ স্প্রিংটির উক্ত Big Ben-টির মতই কার্য্য সমাধা করিতে হইতেছে। এমন কি, রাজনীতি-বিশারদ ডিজরেলী বা গ্ল্যাডষ্টোনকে যদি উপরোক্ত দেশীয় রাজ্যের মন্ত্রীদিগের স্থলাভিষিক্ত হইতে হইত, তাঁহারাও উহাদের মত, এই সব দেশীয় রাজ্যের বিশেষতঃ যেখানে পারিপার্শ্বিক বিবাদ, দুর্বল ও প্রবল শক্তির সংঘর্ষ ও সভাসদদের কথা বাদ দিলেও-আভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলি অধিকতর চতুরতার সহিত নিষ্পাদন করিয়া এই সব রাজ্যগুলি পরিচালন করিতে সক্ষম হইতেন না। আমরা সাধারণতঃ মন্ত্রীদিগের কার্য্যদক্ষতা, তাঁহাদের কার্য্যের সুফল দেখিয়াই বিচার করিয়া থাকি, কিন্তু প্রত্যুত তাঁহারা সাধারণ মনুষ্য বই আর কিছুই নহেন।

ভারতীয় সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম এই সকল দেশীয় রাজ্যে আশ্রয় লাভ করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে নিজেদের সজীবতা বজায় রাখিতে সক্ষম হইতেছে। ভারতশিল্পের দেশীয় রাজন্যবর্গ যেরূপ পৃষ্ঠপোষকতা অদ্যাপিও করিতেছেন, তাহা আজকালকার পলিটীক্যাল-রঙ্গমঞ্চের 'স্বদেশী' অভিনয়ের দিনে বিশেষ দৃষ্টান্তস্থল বলিয়া মনে করি। ভারত-শিল্প মুসলমান আমলে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে বর্ণসঙ্কর দোষে দুষ্ট হইয়াছিল, একথা ঐতিহাসিক সত্য। কেবল দেশীয় নৃপতিগণের একান্ত অনুরাগে ও পৃষ্ঠপোষকতায় অন্ততঃ কতিপয় রাজ্যে এই দোষ প্রবেশ করিতে পারে নাই। ১৯০৩ সালে দিল্লীর দরবারে Lord Curzon যে শিল্প প্রদর্শনী খোলেন, তাহাতে দেশীয় নৃপতিগণের প্রদত্ত Loan Collection দ্রব্য-সংগ্রহাগারে বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। Lord Curzon সেই প্রদর্শনী খুলিতে যাইয়া দেশীয় নৃপতিবর্গের বিলাতী জিনিসের মোহের উপর যে তীব্র কটাক্ষ করিয়াছিলেন, তাহাতে যদি রাজাদের চৈতন্য হইয়া না থাকে এবং তাহাতেও যদি জঘন্য বিলাতী দ্রব্যের উপর তাঁহাদের লালসা ত্যাগ করিতে না পারিয়া থাকেন, তবে ভারতের নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। সেই প্রদর্শনীতে প্রবন্ধলেখক উপস্থিত ছিলেন। তৎকালে খাঁটী ভারত-শিল্পের আদর্শ দেখিয়া স্পষ্টই অনুভূত হইয়াছিল যে, ভারত-শিল্প আজও দেশীয় রাজ্যে ''জাতকুল'' বজায় রাখিয়া জীবিত আছে, আজও ভারত-নৃপতিগণই নিরাশ্রয়ের আশ্রয়! মনে নাই, কোন এক দেশীয় রাজ্য হইতে প্রেরিত একখানা জীর্ণ গালিচা Lord Curzon জনৈক দেশীয় নৃপতিকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন,-ইহা যদি পরিধান করিবার মত হইত, তাহা হইলে তিনি আনন্দসহকারে তাহাই পরিতেন। রাজাটি তাঁহার এ উক্তির ভাব কি বুঝিয়াছিলেন তিনিই জানেন। প্রবন্ধলেখক ভারত-রাজপ্রতিনিধিকে এই একটি কথার জন্য মনে প্রাণে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারেন নাই।

ভারত-সম্রাট যে শিক্ষাদান অসাধ্য মনে করেন, ভারতের দেশীয় নৃপতি তাহা অনায়াস-সাধ্য প্রমাণ করিয়াছেন। বরোদার মহারাজ রাজ্যমধ্যে প্রাথমিক অবৈতনিক বাধ্যকরী শিক্ষাবিস্তারের সুযোগ দিলেন, বাধ্যবাধকতায় শিক্ষা-বিস্তারের পন্থার অনায়াস সুলভতা প্রমাণ করিলেন। অন্যান্য উন্নত রাজ্য এই প্রথার মহিমা বুঝিয়া লইলেন। মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, বিকানির, গোয়িলয়র, পাতিয়ালা প্রভৃতি এখন আদর্শ রাজ্যরূপে ভারতবর্ষে যে সুনাম ও সম্মান অর্জন করিয়াছে, তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস হইবার নহে। এই সকল রাজ্যের রাজগণের অতুলনীয় যশঃ চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং তাঁহাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে ভারত ইতিহাসে অঙ্কিত থাকিবে। ইহাদের আদর্শ লইয়া অনেক রাজ্যের উন্নতির পথ সুগম হইবে, সে আশা নিতান্ত দুরাশা নহে।

সমাজ-সংস্কারের জন্য ভারতবর্ষময় যে ঘোরতর আন্দোলন সময় সময় উপস্থিত হইয়াছিল বা এখনও হইতেছে,

দেশীয় রাজ্যে সেই সকল আন্দোলন সৌখীন নাট্যমঞ্চের সৌখীন অভিনেতার অভিনয়ের মত কেবল Resolution, ঘন করতালি, আর নানা স্থানের নামমাত্র প্রতিনিধিবর্গকে পিষ্টক এবং দধি 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' এর মধ্যেই পর্য্যবসিত হয় নাই। একমাত্র মুখের কথায়-এমন কি, চক্ষুর ইঙ্গিতে ঐ সকল সংস্কার অবনত মস্তকে গ্রাহ্য হইয়া যাইতেছে। এই যে বিলাত যাত্রীর জাত লইয়া সমগ্র ভারতময় সামাজিক দলাদলির আজও শেষ মীমাংসা হইতে পারিল না, দেশীয় রাজ্যে তাহার জন্য কোন উচ্চবাচ্য হইল কি? এই যে ''সহবাস-সম্মতি আইন'' লইয়া ভারতবর্ষময় তুমুল আন্দোলন হইল, দল বাঁধিয়া পক্ষাপক্ষ দাঁড়াইয়া আইনটাকে ইংরেজী-মাপ-কাঠিতে ছাটিয়া কাটিয়া লইতে হইল, অনেক আলোচনা আন্দোলনের পরে তাহা পুলিশের লালা পাগড়ীর মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে। দেশীয় রাজ্যে কিন্তু তাহা অনায়াসসাধ্য হইয়া গেল। মহীশূর রাজ্যে যে আইন এখন প্রচলিত হইয়া সমাজ-সংস্কারের একটা স্তম্ভরূপে বিরাজ করিতেছে, ইহা কি দেশীয় রাজ্য ব্যতীত অন্যত্র সম্ভব হইত? আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতবর্ষের সমাজ-সংস্কার যদি কখনও সম্ভব হয়, তবে তা দেশীয় রাজ্যগুলিতেও সাধিত হইবে এবং ক্রমে তাহা ভারতময় বিস্তার লাভ করিবে। সমাজ আমার, আমি যদি তাহা সংস্কার করিতে না পারি, পরদেশীয় রাজা তাহা কি করিয়া করিবেন? আমার একান্ত বিশ্বাস, সময়ে দেশীয় নৃপতি ভারতীয় সমগ্র সমাজের অধিনায়ক হইবেন। কিন্তু যে পর্য্যন্ত রাজারা শিক্ষায়, দীক্ষায় এবং চরিত্রবলে দেশের সম্মান লাভ করিতে না পারিবেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহারা ভারতবর্ষের শীর্ষস্থানীয় হইয়াও ভারতে অপরিচিত থাকিবেন, ভারতবাসীর সম্মানলাভে বঞ্চিত থাকিবেন; এবং ভারতের সুপুত্ররূপে তিনি যে সুকর্ম্মদ্বারা ভারতবর্ষের উপকার সাধনে সক্ষম, সেই পুণ্য তাঁহার ভাগ্যে ঘটিবে না। ইহা কি কম পরিতাপের বিষয়? সংগ্রামে পিছনে পড়িয়া থাকা যেমন সৈনিকের ধর্ম্ম-হানিকর, তদ্রূপ ভারত-নৃপতিবর্গের মধ্যে যাঁহারা এখনও সভ্যজগতে পশ্চাতে পড়িয়া আছেন, তাঁহাদের পক্ষেও এই পশ্চাদ্বর্ত্তিতা মর্য্যাদার হানিকর।

তবে একথা হইতেছে, এই শ্রেণীর নৃপতিবর্গ কেন এমন দুরবস্থাপন্ন হইলেন? একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে, ইহা কেবল তাঁহাদের ব্যক্তিগত দোষ নহে। প্রখর স্রোতোবেগে কাষ্ঠখণ্ড পতিত হইলে যেমন কখন একূলে, কখনও ওকূলে ভাসিতে থাকে, ইহাদের অবস্থাও তদ্রূপ। যখন ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণকে নিজ ধর্ম্ম, নিজ রাজ্য, নিজ সম্মান রক্ষার্থ শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইত, সে সময় তাঁহাদের বীরের ধৈর্য্য ও বীর্য্য অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। স্বয়ং উপযুক্ত না হইলে, চরিত্রবান ধার্ম্মিক না হইলে, তখন জাতি বিশেষের অধিনায়ক এবং অধিপতি হওয়া অসম্ভব ছিল। কাজেই তাঁহারা বিলাসী প্রচুরামোদী অথবা চরিত্রহীন হইতে পারেন নাই; সেই অবকাশ ও সেই প্রচুর সুবিধা তাঁহাদের ছিল না। কাজেই তাঁহারা প্রজাবৎসল, ন্যায়পরায়ণ ও রাজ-ধর্ম্মপালক হইতেন, বীরের কর্ত্তব্য-সাধনে যত্নবান হইতেন, রাজার মত রাজা হইতেন। বিধাতার বিচিত্র বিধানে যখন ইহাদের বংশধরগণ ইংরেজ সাম্রাজ্য মধ্যে শান্তিসুখ প্রচুর পরিমাণে পাইলেন, অনায়াসে রাজ্যাদি নিষ্কণ্টক হইল, তখন তাঁহাদের অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়াইল। তাঁহারা প্রচুর অবসর পাইলেন, প্রচুর সুবিধা পাইলেন, বিলাসিতা আপনি আসিয়া জুটিল- যেমন এসব ক্ষেত্রে জুটে। কর্ম্মহীন জীবন যাপন করা যেমন অসম্ভব, আবার সুকার্য্যময় জীবন যাপন ততোধিক দুঃসাধ্য। সাধারণতঃ নিষ্কর্ম্মাগণ যেমন তাস পাশা খেলিয়া বা ব্যসন লইয়া জীবন কাটায়, ইহাদেরও অবস্থা তাহাই হইল। তাহার উপর আবার ইহাদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ। যাঁহাদের মুখের কথা আইন হইতে পারে, রাজ্যের আয় নিজ ভোগ্য হইতে পারে-কাহারও মুখোপেক্ষী হইবার দরকার হয় না, কোন সমালোচনা তাঁহাদের কর্ণে পৌঁছিবার যো নাই।

এ হেন অবস্থায় তাঁহার যদি বিলাসী হইয়া রাজার কর্ত্তব্য বুঝিতে না পারেন, তাহা আর বিচিত্র কি! প্রাচীন বংশের দোষ গুণ উভয়ই প্রাচীন। পুরাতন অট্টালিকার ইট যত প্রাচীন, সে অট্টালিকার আশ্রিত বটবৃক্ষও তত প্রাচীন, কিন্তু অট্টালিকা রক্ষা করিতে হইলে প্রাচীন বলিয়া বটবৃক্ষটাকে মায়া করিলে হইবে না।

প্রাচীন দোষের মধ্যে বহু বিবাহ, বহু উপপত্নী, বাহুল্যযাপ্য ঋণভার-বাহী বিলাসিতা, পরবর্ত্তীকালে সশরীরে জাগিয়া উঠিল, রাজারা নবাবী করিতে লাগিলেন। এমন কি, কোন কোন রাজ্যে মুসলমান ধরণে রাজকর্ম্মচারিগণের পদবী পর্য্যন্ত অভিহিত হইল! চাপকান, চৌগার দরবার, আতরদান, খান্দানের মান-মর্য্যাদা, নকীবের ফুকার, পেস কবজের ধার, খিলাতের

ছবি স্বর্গীয় কর্ণেল মহিম ঠাকুর দেববর্মা

পেসখস্, আদ্দব- কায়দার আনা-যানা, মেজাজ মোবারকের অত্যুক্তি, সেলাম তসলিমের বাড়াবাড়ি, মসলন্দের তাকিয়া ঠেশ, পেস্কারের হাজিরাতেও শেষ হইল না। বেগম মহলের ন্যায় তাঁহাদের অন্দরমহল বহু রাণী, উপরাণীতে পূর্ণ হইয়া গেল, বহু সন্তানের উৎপাত ঘটিল। মাদকতায় রাজার অকাল মৃত্যু অনেক রাজ্যেই ঘটিতেছে। তাঁহার উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করিতে যাইযা গভর্ণমেন্টকে হয়রাণ হইয়া নির্দ্ধারণ করিতে হইল, গভর্ণমেন্টের মঞ্জুরী ছাড়া কোন রাজ্যের উত্তরাধিকারী নির্ণীত হইবে না। কি দুঃখের কথা, নিজ উত্তরাধিকারী, পুন্নাম নরক- উদ্ধারকর্ত্তা হিন্দুর পুত্রকে উত্তরাধিকারী পদে বরণ করিবার যে একটা স্বাভাবিক অধিকার আছে, তাহার উপরও গভর্ণমেন্টের অধিকার বিস্তার করিতে হইল ! সহজ চক্ষে ইহা অন্যায় বলিয়া প্রতীয়মান হয় বই কি ? কিন্তু আভ্যন্তরিক ঘটনা জানিলে গভর্ণমেন্ট যে কেবল রাজাদের স্বেচ্ছাচারিতার দরুণই এ বিধি করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। Necessity has no law. এখানে আবশ্যকতা আসিয়া বিধি স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছে ! এমন কি, বিবাহ বা সন্তান জন্মের খবর ''তার'' যোগে গভর্ণমেন্টের গোচর করিতে হইবে এরূপ বিধানও হইয়াছে; তাঁহার কারণ, বহুবিবাহজনিত গৃহকেলেঙ্কারির বিবাদ বিসম্বাদ। এই সব কু-প্রথা চিরতরে দূর না হইলে রাজা ও রাজ্যের অকল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। কেবল মাত্র রাজার ব্যক্তিগত শিক্ষাদীক্ষার উপর সমগ্র রাজ্যের উন্নতি নির্ভর করিতেছে। সুখের বিষয়, আমাদের গভর্ণমেন্ট সামন্ত রাজ্যগুলিকে বন্ধু এবং অভিভাবকরূপে সাহায্য করিতে ত্রুটি কবিরেন না। Lord Chelmsford আলোয়ার রাজ্যে Dec.5.1918 তারিখে এক বক্তৃতায় বর্তমান Government policy- র কতক ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন। "I can assure your Highness that should your Highness personally be in doubt or difficulty with reference to the administration of your State or any other matter, you may always count on me and many officers, to do our utmost to find a satisfactory solution, since ** I and they are all working for the common end of the welfare of India and the happiness of its people'', এই কথা প্রত্যেক দেশীয় রাজ্যের দরবার-কক্ষে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত।

ডিপ্লোমেসির দোহাই দিয়া এ সকল উপকার অস্বীকার করা সমীচীন হইবে না। যে উপায়েই হউক গভর্ণমেন্টের সোহাগদৃষ্টি দেশীয় রাজ-বাতায়নে অকাতরে বর্ষিত হইয়া থাকে, অগ্নিআঁখি দেখাটা এখানে একরূপ মনের ধাঁধা বলিতে হইবে। কিন্তু দেশীয় রাজ্যের দায়িত্ববোধ পূরা মাত্রায় হওয়া একান্ত দরকার, যাহাতে নবীন ভারতের উন্মাদনার সকল সুর রাষ্ট্রমণ্ডপে বাজিয়া উঠে, তাহার আয়োজনই স্পৃহনীয়।

দেশীয় রাজ্যের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ

লেখক একজন দেশীয় রাজ্যবাসী। দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে আজকাল প্রায় কোন কথা উঠে না; সংবাদপত্রগুলিও প্রায় নীরব হইয়া আছে। আমার বোধহয়, গৃহবিবাদ এবং আত্মকলহের সময় প্রতিবাসীকে ভুলিয়া যাওয়া স্বাভাবিক। নিজের ঘরে আগুন লাগিলে পরের গৃহদাহের প্রতি কেহ দৃকপাত করিতে পারে না। ইহা স্বাভাবিক, কিন্তু প্রতিবেশীরও সংসার এবং ঘর-কন্না আছে, দেশীয় রাজ্যেরও Politics আছে; ভারতবর্ষের Politics যেমন, তত্তুল্য নাও হইতে পারে। বাস্তবিক এই উভয় এলাকার রাজ-নীতি দৃষ্টতঃ পৃথক হইলেও তাহাদের সর্ব্বদা নিকটসম্বন্ধ ছিল এবং এখনও আছে। তবে এসব রাজ্যের রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা কতক পর্য্যালোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ভারতের ১/৪ অংশ যাঁহারা ভোগ-দখল করিতেছেন এবং ১/৪ অংশ প্রজাবর্গের উপর একাধিপত্য চালাইয়া আছেন, তাঁহাদের নেহাৎ ফেলিয়া রাখা সম্ভব হইবে না। ব্রিটীশ শাসিত দেশে অদ্য নানা মুনির নানা মত। নরম এবং চরম পন্থীর বিবাদ-বিষম্বাদ। চড়া-সুরে কড়া কথা শুনাইতে কেহ কসুর করিতেছে না। কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলি নীরবপন্থী। আমার বোধ হয়, ইহারা একটা ''গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ'' দেখিতেছে এবং নীরবে সে তামাসা অনুভব করিতেছে। পৃথিবীর আপদ যুদ্ধে স্বরাষ্ট্র এবং পররাষ্ট্র কেহই কম কাজ করেন নাই। আপদ দূরে গেছে, কিন্তু সে আপদের জের এক্ষণে পদে পদে ব্রিটীশ এলাকা ভোগ করিতেছে।

দেশীয় রাজ্যগুলি যেমন মেঘান্তরালে সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত হইয়া যে রং ফেলিয়াছে, সেই রঙের ভাব উপভোগ করিতেছে। একদিকে ভয়ানক মেঘঘটা, মেঘের কালিমা দেশময় অন্ধকার করিয়া দিয়াছে; অপর দিকে রঙ্গবিরঙ্গের দৃশ্য দেখিয়া ইহারা পুলকিত হইয়া আছে। হয়ত লেখকের ইহা অত্যুক্তি, কিন্তু কে বলিতে পারে কালের বিচিত্র গতির কথা?

একজন American যাহা বলিতেছেন তা শুনিলে চরমপন্থী বা নরমপন্থী, কোন পন্থীই সৎ পন্থা বলিয়া গ্রহণ করিবে না; বরং বাতুলতা মনে করিতে পারে। কিন্তু মার্কিন মহাশয় যুক্ত রাজ্যবাসী-প্রজাতন্ত্র-পন্থী। ইহা কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, তিনি (অর্থাৎ Visitor in East & West) ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া অনেক বাদানুবাদের পরে ব্রিটীশ বন্ধুকে বলিতেছেন;-

"To my mind, you could retire very easily from India, By some arrangement with the Indian princes, that is what you will probably do sooner than anyone expects. The Dominions need all the blood and gold which you have been pouring into India so long."

ইহা বলিতে পারি উপরি উক্ত উপদেশে Madness থাকিতে পারে; But there is a method in it, হয়ত বা সময়ে সত্যও হইতে পারে, কিন্তু আজই যদি স্বরাজ পাওয়া যায়, তাহা হইলে কাল ভারতের অবস্থা কি হইবে। দেশীয় রাজ্যগুলি কি স্বরাজভুক্ত হইয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে? লেখকের সন্দেহ হয়।

বহুদিন পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৯২ খৃঃ অব্দে ভারতের লাঞ্ছিত পুরুষ Late Sir Lepel Griffin, K.C.S.I. তদনুরূপ

উক্তি করিয়াছিলেন।

এই দুইটি মত একসঙ্গে মিলাইয়া দেখা যাইতে পারে। কারণ দুজনাই ভারতবাসী নহেন, অথচ ভারতের ভবিষ্যৎ ভাগ্য গণনা করিতেছেন। বাস্তবিক সে সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, এবিষয়ে বিবেচনার বিশেষ বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ব্রিটীশ শাসিত ভারতবর্ষের Politicianগণ এমন কথা বোধ হয় স্বপ্নেও দেখেন না। ইহা বোধহয় সর্ব্ববাদিসম্মত হইবে যে, দেশীয় রাজার হাতে সমগ্র ভারতবর্ষ কখনও যাওয়া উচিত হইবে না। কারণ ভারতবাসী জানে এবং শুনে, দেশীয় রাজাগুলি সবই একাধিপতি রাজা বা নবাব, ইহাদের হাতে ভারতের শাসননীতি ফেলিয়া দেওয়া কখনও নিরাপদ হইতে পারে না। গুটিকয়েক রাজ্য শনৈঃশনৈঃ উন্নতি লাভ করিতেছে। ব্রিটীশ শাসিত ভারতের সুসন্তানগণ দেশীয় রাজনীতিতে ঐ সব রাজ্য গড়িয়া উঠাইয়াছেন। কেবলমাত্র আমার বোধহয়, প্রসিদ্ধ Sir Salar Jung ছাড়া সকলেই ব্রিটীশ নীতি প্রবর্তন দ্বারা ঐ সব রাজ্যকে গড়িয়া পিটিয়া Model State এ পরিণত করিতে পারিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। বহুতর রাজ্য ভারতে আছে, যাহাদের সংখ্যা শতাধিক হইয়া ভারতের নানা স্থানে ছড়াইয়া আছে। ঐ সব রাজ্যে আজ পর্য্যন্ত Constitutional Government প্রবর্ত্তিত হয় নাই এবং কত দিনে হইবে কেহ বলিতে পারে না। Minority র হাতে আজ যদি ভারতবর্ষ ফেলিয়া দিয়া, ইংরেজ লোটা-কম্বল (Bag and Baggage) লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করে, তবে কাল ভারতের কি দশা হইবে? স্বরাজ পাইবে কি? Constitutional Government পাইবে কি? Moderateগণ দশ বৎসর অন্তে Self Government অন্তে পাইবে কি? Extremist গণের সদ্য প্রস্তুত স্বরাজ হইবে কি? তখন হয় ত এই সব রাজারা তাঁহাদিগকে বলিবে, ‘‘চুপরাও, আমরা আরও কয়েক বৎসর তোমাদের শাসন করিয়া বুদ্ধি বিবেচনা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই, তোমরা Constitutional Government পাইতে পার কিনা? নব-লব্ধ আমার রাজ্যে আমি তোমাদিগকে কখনও স্বরাজ দিব না।’’ তখন হয় ত ব্রিটীশ শাসিত ভারতজনমন্ডলী প্রজাশক্তি দ্বারা একটা বিপ্লব উপস্থিত করিতে চাহিবে। একটা স্বপ্নরাজ্য গড়িতে চেষ্টা করিবে। তখনকার অবস্থা হইবে ঃ-

> ‘‘সোনায় কয় আমি বড়।
> লোহায় কয় বিচার কর।’’

প্রবল শক্তি কিন্তু রাজাদের হাতে আছে। তখনকার অবস্থা কি হইবে স্বপ্নের অগোচর।

কিন্তু বাস্তব রাজ্যে কি হইতে পারে, তাহা ভাবিতে গেলে একটা কথা মনে আসে-শাসন ও সংরক্ষণ করিবার অনেক পন্থা আছে। স্বেচ্ছাচারনীতি কোন দিনই টিকিতে পারে না। প্রজাতন্ত্র ভারতে কখনও ছিল কি না, আমি সন্দেহ করি। Constitutional Government ছিল কিনা, মহাভারত স্পর্শ করিয়া বলিতে পারি না। কিন্তু বলিতে পারি, বোধ হয় ইহা কোন দিন ছিল না। ভারতের রাজনীতি পূর্ব্বকালে ‘বর্ত্তমান’ (Politics এর) দোষে দুষ্ট ছিল না। বরং সভ্য জগতে ইহা প্রচারিত যে, সনাতন নীতি উচ্চ আদর্শে ভূষিত ছিল। তখন যে সব বংশ (সূর্য্য ও চন্দ্র নামে আখ্যাত) ভারত শাসন করিয়াছিলেন তাঁহাদের বংশীয়গণ অথবা তাঁহাদের নামে প্রসিদ্ধ বংশীয়গণ এখনও ভারতে ১/৩ অংশ শাসন এবং সংরক্ষণ করিতেছেন, ১/৩ অংশ প্রজার মা বাপ স্বরূপে। তাঁহারা ভাল করিতেছেন কি মন্দ করিতেছেন ইহা বিচার্য্য, কিন্তু আমি বিচারক নহি। আমি দেশীয় রাজ্যবাসী, অতএব আমার অনুকূল বাক্য বলিবার কারণ আছে।

ভারতবাসী মনে করে, দেশীয় রাজ্যের রাজারা এখনও মূর্খ, স্বেচ্ছাচারী, বহু বিষয়ে ইঁহারা অপরাধী (with a few honourable exception) এবং ইহারা কোন পন্থাতেই চলেন না। এমন কি, স্বেচ্ছাচারের পন্থী হইয়াও তাহার উপর শত্রু বাড়াইয়া নানা বিভ্রাট উপস্থিত করেন। ব্রিটীশ ভারতে এরূপ আচরণে হয় ত সামান্য একজন ডেপুটী- ম্যাজিষ্ট্রেটও তাঁহাদিগকে সশ্রম জেলের ব্যবস্থা করিবেন। রাজ্যের বাহিরের লোক মনে করে, রাজারা হোমড়া চোমড়া বহু মূল্যের রত্নাদি অলঙ্কার-ভূষিত এবং বহু সেলাম আদায়ী, অগাধ অর্থশালী, অথচ স্বেচ্ছাচারী। এমন রাজ্যে সকলের সাত বার করিয়া গর্দ্দান কাটা যায়, সাতবার

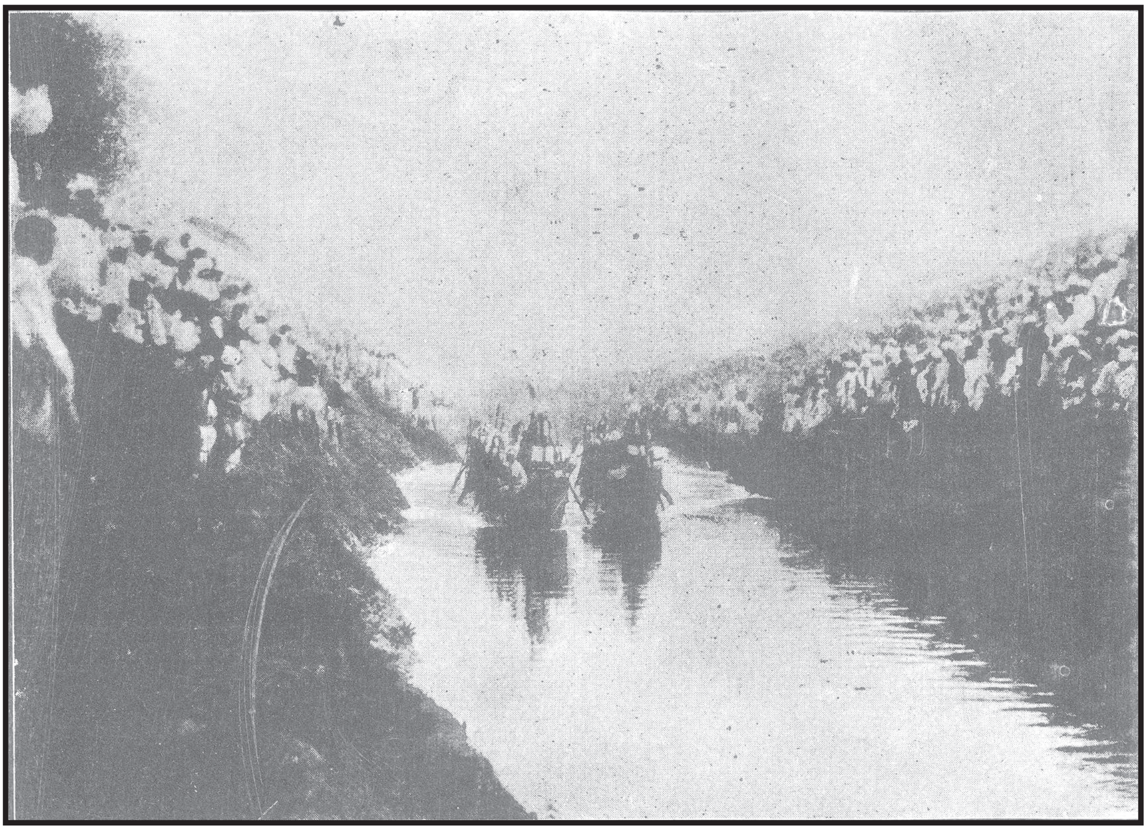

মণিপুরে নৌকাদৌড়

করিয়া পকেট মারিয়া ধনীকে দরিদ্র করে এবং রাত্রিতে ঘুম আসিতে দেয় না। এমন রাজ্যে লোকে মাত্র ''পেটের দায়ে'' যাইয়া পড়ে ও পড়িয়া থাকে, হয়ত ভূপাল-না হয়ত গোপাল, হয়ত ধনী-না হয়ত দরিদ্র হইয়া পড়িতে। এসব রাজ্যকে কেহ কেহ দূরবীণ চক্ষে দেখে অথবা অণুবীক্ষণ চক্ষে বিশ্লেষণ করে। কিন্তু মাত্র ঐ দুইটি উপায়েই ঐ সব রাজ্যগুলিকে দেখা সমীচীন হইবে না; সাদা চক্ষে দেখিতে গেলে ইহাদের ভাল মালুম হইবে বলিয়া মনে করি। বহু পুরুষ যাবত (ছোট হউক-বড় হউক) স্মরণাতীত কাল হইতে একই বংশ শাসন সংরক্ষণ করিতেছেন, এমন রাজ্য এবং বংশ এখনও অনেক আছে। অবশ্য সকলেই যে সুশাসন করিতেছেন, তাহা বলিতে চাই না; কিন্তু শাসন করিয়াছেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। ইঁহাদের কি রাজ্যের উপর মায়া নাই? প্রজার উপর মমতা বা শাসনের উপর অবিচলিত শ্রদ্ধা নাই? একথা অদ্য পর্য্যন্ত মীমাংসিত হয় নাই মীমাংসা করিবার আবশ্যক ছিল না। কারণ, আমরা ইংরেজী সভ্যতায় শিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের প্রতীচ্যভাব বুঝিতে পারা আজকাল বাজার দরে অনেক বেশকম হইয়া পড়ে। কিন্তু এসব রাজারাও তোমার আমার মত ভারতবাসী, উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসেন নাই, এবং সাগর পারে ধন রত্ন লুটিয়া নেন নাই। বরং ভারতের উপর ইঁহাদের অগাধ শ্রদ্ধা ও ভক্তি। ইঁহারা সম্পূর্ণরূপে ভারতবাসী। কেবলমাত্র পেনসিলের দাগ দ্বারা ইঁহাদিগকে পৃথকস্থ করিয়া লওয়া হইয়াছে। আবশ্যকতায় তাঁহাদের আভ্যন্তরিক অবস্থাও কালের স্রোতে অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু অন্তর্জগতে ইঁহারা ভারতবাসী-গর্ব্বসহকারে ইহাই মনে করেন। আজও যদি ভারতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তাঁহাদের ধন ভাণ্ডারের দরজা খুলিয়া যায়। সুদূর প্রান্তে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলেও অপর প্রান্তের Despotic রাজার অন্তর তড়িৎ প্রবাহে বেদনা বোধ করে। এক দেশের শিল্পরথী উপস্থিত হইলেন ভিক্ষাপ্রার্থী হইয়া, কিন্তু দেশীয় নৃপতি দ্বারা তিনি পূজোপহারে অর্চ্চিত হইলেন, এমন দৃষ্টান্তও দেখা যায়। বিদ্যার্থী উপস্থিত হইলেন-সাগর পার হইতে বিদ্যার্জ্জন করিয়া ভারতে আসিলেন, তিনি পাইলেন শিক্ষা-নির্ব্বাহের পূর্ণপাত্র, এ দৃষ্টান্ত আমরা অহরহঃ দেখিতেছি এবং পাইতেছি। অদ্যই হউক, কিংবা কল্যই হউক, যদি ভারতের ভাগ্যে স্বরাজ ঘটে, তবে দেশীয় রাজা দ্বারা সুশিক্ষিত সন্তানগণই অধিকাংশ কার্য্যভার পাইবেন, এমন কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে সকলে নীরব আছেন এবং দেশীয় রাজগণও নীরবে আছেন; ইহার কারণ কি, একথা একবার বলিতে হয়। আমি দেশীয় রাজাদের সম্বন্ধেই বলিতেছি, Lord Curzon দেশীয় রাজ্যের কুজন ছিলেন না, এবং তিনি সহানুভূতির সহিত ইঁহাদের বিষয় দেখিতেন, শুনিতেন এবং ব্যবস্থা করিতেন। অবশ্য ইহা পৌরাণিক যুগের কথা হইতে পারে, অর্থাৎ ১৮৯৮ সালের কথা, তখনই তিনি রাজপ্রতিনিধি হইয়া ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রথম Gwalior.এর রাজভোজ সভায় ২৯শে নভেম্বর, ১৮৯৯ খৃঃ অব্দে বলিতেছেন ঃ-

"The Official visits of Viceroys to Native States are sometimes depreciated on the score of the ceremonial and perhaps costly formalities which they involve, and of their time honoured attributes of pomp and display. I am not inclined to share these views. To me personally there is no more interesting part of my Indian work than the opportunities which are presented to me, on tour or elsewhere, of an introducation to the acquaintance, and as I fondly hope, to the confidence, of the Native Princes and Chiefs of India; and if these Princes prefer as I believe they do prefer, to receive the representative of the Sovereign whom they all acknowledge and for whom they entertain a profound and chivalrous devotion, with a dignity becoming both to his position and to their own rank, I think that he would be a captious and sourminded critic who was to deny them an opportunity which I believe to be as highly appreciated by their subjects as it is valued by themselves." সেদিন ছিল এক যুগ। অদ্য নতুন যুগ আসিয়া পৌঁছিয়াছে; Montague Chelmsford Scheme-এর অনুসারে। সে যুগের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় নৃপতিবৃন্দকে সভানুভূতি দানপূর্ব্বক শিক্ষিত করা এবং উপযুক্ত করা; কারণ তিনি জানিতেন, এই প্রাচীণ বংশীয়দিগকে হৃদয় না দিলে মন পাওয়া সুকঠিন।

দেশীয় রাজ্য

ব্রিটীশ শাসিত রাজ্যে তিনি সুনাম অর্জ্জন করিতে পারেন নাই বলিয়া প্রকাশ, কিন্তু দেশীয় রাজ্যে ইনি সুনাম রাখিয়া গিয়াছেন। লোকে হয়ত অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিবে, ১৯০৩ সালের দিল্লী দরবারের দিল্লীর লাড্ডুর প্রতি। কিন্তু সেকথাও ত দেশীয় রাজ্যের রাজারাই বিচার করিয়াছেন। অতএব সে প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়া অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিতে চাই না। তিনি পূর্ব্বোক্ত রাজভোজে একটা সত্যকথা বলিয়াছিলেন, তিনি রাজাদের কি নয়নে দেখেন ঃ-

"The Native Chief has become by our Policy, an intregral factor in the,-Imperial organisation of India. He is concerned not less than the Viceroy or the Lieutenant Governor in the administration of the country. I claim him as my colleague and partner. He can not remain vis-a-vis of the Empire a loyal subject of Her Majesty the Queen Empress and vis-a-vis of his own people a frivolous or irresponsible despot. He must justify and not abuse the authority committed to him, he must be the servant as well as the master of his people."

একথাগুলির মধ্যে শিক্ষক ছাত্রের ভাব প্রকাশ পাইতেছে। ইহার আবশ্যক ছিল। আমি জানি, অনেক রাজ্যের রাজারা মোগল সময়ের নবাব হইয়া বসিয়াছিলেন এবং Lord Curzon এর সময় পর্য্যন্ত তাঁহারা কোন পন্থাই ঠিক রাখিতে না পারিয়া কুপথে পাদবিক্ষেপ করিতেছিলেন। অবশ্য ইহার মধ্যে few honourable exceptionও ছিল একথা অস্বীকার করা যায় না। যে রাজার ভোজে এভাব প্রকাশিত হইয়াছিল, তাঁহাকে তিনি Model Prince রূপে জানিয়াছিলেন। কাজেই অতিথিরূপে তিনি সম্মানের অপলাপ করেন নাই, বরং সুখ্যাতি করিয়া অপরকে শিক্ষাদানের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কারণ তিনি উপসংহারে বলিয়াছিলেন ঃ-

"The maharaja appears to me from all I have heard to have realised that the secret of successful Government is personality."

একাধিপতির পক্ষে personality যে কত মূল্যবান, তাহা ভারতবাসীর পক্ষে বলা অত্যুক্তি। ব্যক্তিগতভাবে একটি রাজা রাজ্যের মঙ্গলার্থ যাহা করিতে শক্তিমান, Constitutional রাজা বা প্রজাতন্ত্রের President দ্বারা তাহার অভাব পূরণ হয় না। অথচ একাধিপতি যদি স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়েন, তাহা হইলে রাজ্যের অদৃষ্ট মন্দ হইয়া পড়ে। পান্নার রাজার অধোগতি হইয়াছিল; হোলকারের রাজার সিংহাসন পরিত্যাগ করা সম্বন্ধে আভ্যন্তরিক বিষয় অবতারণা করার দরকার নাই; কারণ ইহা , প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে। জয়পুর, ভাগলপুর, আলোয়ার প্রভৃতি রাজ্যে যে সব বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে Lord Curzon এর সহানুভূতির ভাব ছিল। জয়পুর রাজ্যে তিনি বলিয়াছলেন ঃ-

"My Ideal has never been the butterfly that flits aimlessly from flower to flower but the working bee that builds its own hive and makes its own honey. To such a man all my heart goes out in sympathy and admiration. He is dear to his own people, and dear to the Government whom I represent. Sometimes I cast my eyes into the future; and I picture a state, of society in which the Indian Princes, trained to all the advantages of western culture, but not divorced in instinct or in mode of life from their own people, will fill an even ampler part than at present in the administration of this Empire. I would dearly like to see that day. But it will not come if an Indian Chief is at liberty to be a spend-thrift or an idler or absentee.It can only come if, as your Highness has said he remains true to his religion, his traditions and his people."

এই জন্যই বোধহয় Lord Curzon ভারতীয় নৃপতিবৃন্দকে সাগরপারে যাইয়া his religion, his tradition and his people কে যেন পর-সঙ্গে ভুলিয়া না যান, সেইজন্যই এক Proceeding করিয়া বিলাত যাওয়ার পথ বন্ধ করিয়াছিলেন। উহা তৎকালে অদ্ভুত বলিয়া ঠেকিয়াছিল। অদ্ভুত হইতে পারে, কিন্তু There is a method in it, আলোয়ার রাজাকে

অভিষেক দরবারে বলিয়াছিলেন, ১৮ই ডিসেম্বর ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে- "The crown through its representative recognises its double-duty of protection and self-restraint, because it has assumed the task of defending the State and Chief against all foes and of promoting their joint interest by every means in its power; of self-restraint because the paramount power must be careful to abstain from any course calculated to promote its own interest at the expense of the State" তৎপর ইহাও বলিয়াছিলেন ঃ-

"Above all remember, Maharaja and these shall be my final words that the life of a successful Ruler can not be a succession of fits and starts, now a spurt of activity and well doing and then a relapse into apathy or indiference. Everytime that you slip backward you miss some ground which it is difficult to recover, on the other hand if each move is a step forward, however slight, your foothold is always secure and no one can upset you. Remember therefore that you are like a runner in a long distance race, in which there is no need to go very quickly at the start, because you will want your breath and your strenght later on but in which you must husband your resources and regulate your speed. I call it a long distance race, because in the case of a ruling Chief the race only ends with his life. He can not leave the course while he has breath in him. Though he may have started on the first round when he was only a youth, he may still be engaged upon the last when his limbs are failing and his strength has grown dim."

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রাজ্য সকলকেই তিনি সহানুভূতির সহিত দেখিয়াছিলেন। প্রাচীন বংশের প্রাচীন রীতি নীতির উপর তিনি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেন। ত্রিপুরা রাজ্য এবং মণিপুর রাজ্যকেও তিনি বাদ দেন নাই। ত্রিপুরা রাজ্যে যখন উত্তরাধিকারী প্রশ্ন লইয়া একটা অনর্থক দাবীদাওয়া করিবার চেষ্টা হইয়াছিল এবং ত্রিপুরার তাৎকালিক মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের পক্ষে তাঁহার Manager (Late C.W.Mc minn,) পুরাণো কাগজপত্র ঘাটিয়া একটা নোট প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা হইতে যে অংশ Lord Curzon এর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল তাহা উদ্ধৃত করিতেছি ঃ- "The decision of 1818 has been regarded as the Magna charta of Bara Thakur. It was confirmed by the Sadar Dewani in 1820 and the decision is quoted by the High court on 20th September 1804, with due reverence as to the precedent and lastly the Privy council in 1809 March 15th accepted this plea tainted and corrupt with unquestioning faith and all courts have since regarded this whited sepulcher of corruption, as a shrine of British justice an incarnation of righteous equity."

Lord Curzon এ মতই গ্রহণ করিলেন এবং সহানুভূতির সহিত মহারাজকে জানাইয়া দিলেন- "The Bara Thakur has no case "। তিনি সত্য উদ্‌ঘাটনার্থে শত বৎসরের ভুল ও ভ্রান্তি যাহা High court ও Privy council করিয়াছিলেন এবং যাহা একজন ইংরেজ- Mc minn, সাহেব ভাবিয়া নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, Lord Curzon তাহাতেই স্বীকৃত হইয়াছিলেন এবং প্রাচীন রাজ্যের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন।

মণিপুর রাজ্যে Lord Curzon গিয়াছিলেন-মহারাজার অভিষেক উপলক্ষে। তখন তিনি সে রাজ্যের প্রাচীন প্রথাগুলিকে সহানুভূতির সহিত রক্ষা করিয়াছিলেন। মণিপুর হিন্দুরাজ্য। কাজেই পাদুকা লইয়া কেহ রাজপ্রসাদে প্রবেশ করিতে পারে না। এজন্য Lord Curzon Government এর কর্ত্তব্য কার্য্য Installation করিয়াছিলেন, প্রাসাদের সীমার বাহিরে। গোবিন্দ জী দেবতা প্রাসাদে বাস করেন, কাজেই জুতা এখানে ধর্ম্মতঃ পরিতাজ্য। এ রাজ্যের বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ হয় একটি পঞ্চায়েত দ্বারা- যাহার নাম ''চেরাব" আদালত। এই আদালতে বহু ব্যয়সাধ্য আয়োজনপত্র নাই। হাকিমগণের ৩/৫ অংশ প্রজাপক্ষ হইতে নির্ব্বাচিত হয় এবং রাজ সরকার হইতে ২/৫ অংশ, majority প্রজার পক্ষে থাকে। এখানে Stamp,Court fee, তলবানা

প্রভৃতির দায় নাই, উকিলের বাগবিতাণ্ডা নাই,কোনরূপ লেখাপড়া পর্য্যন্ত নাই। তাঁহারা বিবেকশক্তি দ্বারা বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। লেখক মণিপুর গিয়াছিলেন এবং এই আদালত দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন ইহাই যথার্থ ধর্ম্মাধিকরণ। ইহা এ প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া উল্লেখ করিতে বিরত রহিলাম। Colonel Sir John Stone মহাশয় (যিনি মণিপুরের Political agent ছিলেন) My experience in Manipur নামক গ্রন্থের পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;-

" I have already alluded to the turbulent charactor of Kotwal Koireng, the Maharaja's fourth son. The Maharaja handed over the case to the "Cherap court" for trial, and as might be expected, they acquitted Kotwal of the charge of causing death and found him guilty of injuring the other two. They sentenced him to banishment for a year to the Island of Thanga, in the Logtak lake, and temporary degradation of caste."

স্বার্থপর কোন কোন শ্রেণীর বিদেশের লোকগণ British পদ্ধতিতে বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ হয় এরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু Lord Curzon ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলেন ও শুনিলেন, তাহাতে এই চেরাবকোর্ট রক্ষা পাইয়া গেল।

অদ্য পর্য্যন্তও সেভাবে চলিতেছে। আমিও দেখিয়া শুনিয়া এই মনে করিয়াছি, আমাদের দেশীয় রাজ্য এই প্রথাকে দেশ কাল পাত্র ভেদ করিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। এই নবযুগে সর্ব্বদেশে যে একটা উন্নতভাব জন্মিয়াছে, Indian Princes এহেন সময়ে তাস পাশা সর্ব্বনাশা জানিয়া রাজনৈতিক দাবা খেলায় হাত দুরস্ত করিলে রাজত্বের মূল সঙ্কেতগুলি তাঁহাদের করায়ত্ত হইতে বেগ লাগিবে না-এবং এই আসমুদ্রহিমাচল খচিত রাজমুকুটগুলির প্রতি যে একটা ভবিষ্যৎ আশার আলোকপাত হইয়াছে, তাহারও চরম সার্থকতার আয়োজন হইতে পারে।

দেশীয় রাজ্য।
সেকাল ও একাল।

১৮৯৬ সালে জনৈক ইংরেজ বন্ধুর গৃহে (অবশ্য Civilian) একদিন আহারের পর, কোন এক দেশীয় রাজ্যসংশ্লিষ্ট বিষয় উপলক্ষ্যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য সম্পর্কে আলাপ করিতেছিলাম। তখন তিনি বলিয়াছিলেন- "Native States with few honourable exceptions are the cancer of India.They should be removed from the map of India. আমি মনে করিয়াছিলাম, এরূপ দাম্ভিকতা কোন দিন ভারতবর্ষ হইতে দূর হইবে। তখন আমি বন্ধু গৃহে অর্থাৎ বিদেশী বঁধুয়ার গৃহে অতিথি, কাজেই প্রকৃত উত্তর না দিয়া আমার সঙ্গের পেটরা হইতে একখানা কেতাব বাহির করিয়া, বঁধুয়ার নিকট ধরিলাম। সেই কেতাবের নাম Ranjit Singh (রণজিৎ সিংহ) (Rulers of India series) 1893 By Sir Lepel Griffin. K.C.S.I পুস্তকের ১৫ পৃষ্ঠা বাহির করিয়া দিলাম,-গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, Should the day ever come, as come it may, for time and chance wait for all, when the English, weary of the burden of rule, retire from India, the old Hindu principalities will survive the ensuing storm, as the mud-built villages with their mango groves are seen in times of flood high above the inundated country.

স্বজাতির উক্তি বিদেশী বঁধুয়া পাঠ করিয়া প্রায় নির্ব্বাক হইয়া গেলেন। কারণ, তিনিও গ্রন্থকার Griffin সাহেবের একজন বন্ধু এবং তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে যাইয়া অনেক বাক্যবাণ সহ্য করিতে হইয়াছিল। Sir. Lepel কে ভারতবর্ষের দেশীয় বন্ধুগণ দু-চক্ষে দেখিতে পারিত না। তাহার কারণও দেশীয় রাজ্যের ঘটনা রটনা লইয়া। তৎকালীন দেশীয় সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় এ বিষয়ের বহু তথ্য পাওয়া যায়। সে ঐতিহাসিক কাহিনী বর্ণনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

এবার কয়েক মাস কলিকাতায় ছিলাম। কলিকাতায় রাজনৈতিক মহলে Extremist, Moderate গণের কেমন রেষারেষি চলিতেছে তাহা সর্ব্ব লোকে জানে। লেখক একজন পররাষ্ট্রবাসী অর্থাৎ স্বাধীন রাজ্যের প্রজা। সব দলের কথা শুনিয়া যাইতাম। মনে করিতাম, কোন দলই দেশীয় রাজ্যের কথা ধর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করে না। আমরা কি ভারত ছাড়া? ভারতের এক তৃতীয়াংশ এ মুল্লুক শাসন করিতেছে, এবং প্রায় এক অষ্টমাংশ প্রজা সেখানে বাস করে। কিন্তু কেহই আমাদিগকে দলে টানিতেছে না। ইহার অর্থ করা অতি সহজ, কারণ কোন দলকেই আমরা হৃদয়ে টানিয়া লইতেছি না; বরং দূরে থাকিয়া উভয় দলের তামাসা দেখিতেছি। বলিতে গেলে 'We are watching the game'. Prince of Wales আসিলেন একদল হাসিলেন, বহু তামাসা করিলেন, জয় জয়কার করিয়া জোকার দিলেন। অপর দল হরতাল করিয়া করতাল বাজাইলেন। যুবরাজ সন্তুষ্ট হইয়া গেলেন-সংবাদপত্র বলে। পক্ষান্তরে, দেশীয় নৃপতি মহলে যুবরাজকে হৃদয় খুলিয়া বন্ধুভাবে বরণ করিলেন ও করিতেছেন। এসব কথাবার্ত্তাও সংবাদপত্রে প্রকাশ। কয়েক জন দেশীয় রাজ্যবাসী বন্ধুর সঙ্গে কলিকাতায় দেখা সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাদের নিকট শুনিলাম, তাঁহাদের রাজ্যে যুবরাজকে বরণডালা লইয়া বরণ করিয়াছিলেন। সেখানে হরতালের করতালি হয় নাই, এবং হইতে পারে না। যুবরাজ সেই সব স্থানে গিয়াছিলেন-পিতৃবন্ধু গৃহে। বন্ধুপুত্রকে যেরূপ আরামে ও আমোদে রাখিতে হয়, তাহার চূড়ান্ত হইয়াছিল। কোন বিষয়ে কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। প্রত্যেক রাজ্যের Press news এ কথাই

প্রকাশ করিয়াছে ও করিতেছে।

সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছিলাম, কোন ইংরেজ বন্ধুকে Republican মার্কিন রাজ্যবাসী বন্ধু বলিয়াছেন ''বর্ত্তমান ভারতবর্ষের অবস্থা দেখিয়া ও শুনিয়া তোমাদের উচিত হইবে, ভারতবর্ষ দেশীয় রাজ্যের নিকট সমর্পণ করিয়া দিয়া, সুখে স্বচ্ছন্দে স্বদেশে গিয়া বাস করা। তাহাতে তোমাদের অর্থনীতির ক্ষতি হইবে না, বরং বৃদ্ধি পাইবে।" সে আজ বৎসরাধিকের কথা। কেন আমেরিকা এরূপ উপদেশ দিলেন-যাহা নিজ রাজ্যের রাজনীতির বিরুদ্ধ ?

বাঙালী মেয়ে কুচবিহারের মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবীর কৃত The Autobiography of an Indian Princess নামক আত্মজীবনীখানা পড়িতেছিলাম। তাহাতে তাঁহার জীবনের কথা নানা ভাবে ও নানা ছন্দে লিখিত হইয়াছে। সুখের দুঃখের কথা লইয়া যে মাল্য গাঁথিয়াছেন, তাহা সকলের পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এ সুগ্রন্থখানার সমালোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে তাহাতে দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে যে সব আত্মকথা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহারই দুই একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি। সেই পুস্তকে Chapter XIV page 215.Viceroys I have known.শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে-

"It is another thing though for the mothers and wives of rulers in India to Complain of the Government if they find it interfering with them. There are mothers and wives of rulers in Bengal and the Punjab who know very little or no English and cannot approach the Government direct but have to be represented by Anglo-Indian Commissioners or Political Agents. And I regret to say that the Government Officials now are often of different type from those in olden days, and this causes trouble in the country. Some of these Englishmen do not know how to write to Indian ladies, neither do they know how to address gentleman. Most of these Civilians are sent out simply because they have passed the Civil Service Examination; how can any polite manners be expected of them? Yet whoever visits England once wishes to go there again, and the chief reason of this is, that the English are much nicer to Indians in England than they are in India. I always say that as long as the Government respect and consider Indian women the throne is safe; history itself shows that when women are ill-treated no rule is secure.

এই Civilian গণকে লইয়া কত রাজ্যে, কত রাজবংশে যে উৎপাত ঘটিয়াছিল, সে কথা সে কালের। তাই মহারাণী সুনীতি দেবী হৃদয়ের ব্যথা চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই। Political কর্ম্মচারীগণ সম্বন্ধে বিখ্যাতMB.M Malavari তাঁহার প্রণীত Native states গ্রন্থের ১৭১ পৃঃ লিখিয়াছেন ঃ-

"A masterful political loves to brush aside the ruler as of little account, practically relieving him of all responsibility. Lord Mayo described h im as a dangerous Official. He himself rules through a Prime Minister or a Council who intrigue against their own chief. It is to their advantage to prevent all good understanding between the Rajah and his Political."

সেকালে এরূপ ভাবই চলিয়াছিল, সে কথাও Malavari বলিয়াছেন।

"Unfortunately, the better educated and more capable a Chief is the more he feels the anomaly of his position. The more he wishes to make a stand for his rights, the more determined is the opposition he has to face. It is here that the system fails, as it makes no allowances for persons who are anxious to administer their States justly, and to do the best, they can for their people and for the supreme Government."

"Things have changed in recent times, and the Princes allowed much more freedom, and are encouraged to prove themselves worthy of their high positions, but many a well meaning Chief had to leave the administration alone, reserving himself for dress rehearsals and grand Durbar."

'Some of these Officals seem to enjoy calling us untruthful. Well, Mr.H. should feel happy to know that his Official "Confidential box", which, he left in the care of the late Calica Das, containing papers against the Maharajah's family, has been found and is now public property.Mr. L. was once our Superintendent; he gave the idea to Government that the Cooch Behar Raj family was most extravagant, and unfortunately the members of the family never had the chance to inform the Government what the Superintendents themselves spent. I asked Mr. L.to have a little bamboo hut built at Woodlands, which would have cost perhaps about $2; the Maharajah was away in England at the time. Mr. L. said he must get the sanction of His Highness; the cablegram would probably have cost him $2; and if I remember rightly in the same year Mr. L. expended $ 8000 on a house in Darjeeling which though not sanctioned, H.H.had to pay; such can be the power and folly of a Superintendent'. এ পুস্তকখানা পাঠ করিয়া কেবলই ভাবিতেছি, বর্ত্তমান উৎপাত-পরিপূর্ণ ভারতবর্ষের শেষ ফল কি হইতে পারে। আমার বোধ হয় Sir Lepel Griffin এর ভবিষ্যবাণী যে সত্য হইবে না একথা কে বলিতে পারে? আর মনে পড়িল,-

২রা ফেব্রুয়ারী তারিখের সংবাদপত্রে Sir Frederick Lugard's এর কথা।

'Sir Frederick Lugard, in a letter to the times, suggests that, in order to carry out British pledges in India and at the same time to avert the threatened dangers, opportunity should be taken to extend and recreate Indian native dynasties for example, where a Native State is loyal and orderly it should be enlarged to embrace the widest absorbable area; also, if possible, we ought to reinstate the native ruler as the titular head of the State with Safegurads for British rights. Apart from such cases, the extension of the dynastic principle will rivet our friendship with the Native States and go far to unify India.'

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বিলাতী সংবাদপত্র (Reuter's Service) Observer গান্ধী মহাশয়কে সাবহিত করিয়া লিখিয়াছেন- 'We must make a decisive arrangement with the Indian Princes extending largely, if necessary, their present area of rule'.

আজ কেন প্রায় চতুর্দ্দিক হইতে ভারতীয় রাজ্য সমূহের উপর দৃষ্টি পড়িল? আমার বোধহয়, আবহমান কাল প্রায় অনেক রাজ্য পুরুষানুক্রমে যাঁহারা শাসন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা প্রজাশাসনে সিদ্ধহস্ত। তাঁহাদের উপর নির্ভর করা দেশ-কাল-পাত্র ভেদে বর্ত্তমান সময়ে অনুচিত হইবে না বলিয়া মনে করি। মহাত্মা গান্ধীও একজন দেশীয় রাজ্যবাসী এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ দেশীয় রাজ্যের প্রধান রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। কাজেই তিনি ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন। আজ কেন বিদেশী বধুঁয়া নিদ্রোত্থিতের ন্যায় সেই কথা হৃদয় খুলিয়া বলিতেছেন- যে কথা Sir Lepel Griffin বহুপূর্ব্বে ভবিষ্যৎবাণীর মত

বলিয়া গিয়াছেন। নিদ্রোত্থিতের প্রলাপবাণী হইতে পারে, সে কথা কি সত্য হইবে? কে বলিতে পারে? সুদিন কুদিন চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সেই দিন যুবরাজের আগমন দিনে দীপালোকে চৌরঙ্গী মহল ঝলসিয়াছিল। তাহার মধ্যে দেখিতে পাইলাম অকটরলনি মনুমেন্ট দীপালোকে সুশোভিত হইয়াছে-আলোকমালার কিরীট পড়িয়াছে। এ মনুমেন্টের ইতিহাস অনেকে জানেন। নেপাল যুদ্ধ বিজয়ী অকটরলনি সাহেবের গৌরব স্মরণচিহ্ন স্তম্ভ কেমন সাজে সাজিয়াছে। আজ নেপালপতি His Majesty নামে পরিচিত হইয়াছেন এবং আপদ যুদ্ধে বন্ধুর কাজ করিয়া যশোরাশি অর্জ্জন করিয়াছেন। সেই সন্ধ্যাকালে জনৈক নেপালি বন্ধু সমাগমে আমরা দু'জনে সেই অকটরলনি মনুমেন্টকে দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম ''আজ তোমার দীপালোকের বাহার কেমন সুন্দর দেখাইতেছে।" দেশীয় রাজন্যবর্গের আজ সেকালের কথা স্মরণ নাই, একালের ভাব সে অতীত ইতিহাসকে বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন করিতে বসিয়াছে। কারণ, দেশীয় রাজ্যকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে, অনেক লোকে অনেক ভাবে। কাজেই প্রশ্ন হইতে পারে, এভাব ঠিক কিনা। অশিক্ষিত বলিয়া ঘোষিত অথচ প্রাচীন বংশ বলিয়া বিখ্যাত, যাহাদের পূর্ব্বপুরুষ অনেকে রামরাজত্বী করিয়া গিয়াছেন, এই উপস্থিত ব্যারামের সময় তাহাদের হাতে চিকিৎসার ভার দিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না। তবে কথা এই, তাঁহাদের শিক্ষাদীক্ষা বর্ত্তমান সময়ে যাহা হইয়াছে ও হইতেছে তাহাতে তাঁহারা শাসন করিতে কোন পথ অবলম্বন করিবেন অথবা করিতে পারেন, সে বিষয়ে বিশেষ অনুধাবন করা আবশ্যক। কারণ, রাজাদের সুশিক্ষা এবং ব্যক্তিত্বের উপরই তাঁহাদের দায়িত্ব বৃদ্ধির প্রস্তাব সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করে।

প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক-দেশীয় নৃপতিবৃন্দকে এই বিস্তীর্ণ ভারতের শাসন সংরক্ষণের ভার দিতে হইলে বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদের শিক্ষাদীক্ষা তাহার অনুকূল হইবে কিনা এবং তাঁহারা সে গুরুভার বহন করিতে সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত আছেন কিনা। গুটিকয়েক আদর্শ রাজ্যের বর্তমান সুশৃঙ্খল শাসনপ্রণালী লক্ষ্য করিলে ভারতীয় নৃপতিগণ যে রাজ্যশাসনে ও প্রকৃতিপুঞ্জের অশেষ কল্যাণবিধানের সম্পূর্ণ উপযুক্ত সে বিষয় আর কাহারও দ্বিধা থাকে না, এমন কি অনেক শিক্ষিত ইয়োরোপীয়ান পর্য্যন্ত ভারতীয় রাজন্যবর্গের ধীরতা দেখিয়া সে কথা স্বীকার করেন। কিন্তু এ সব রাজ্য ছাড়া ভারতের অন্যান্য রাজন্যবর্গ এখনও সেরূপ উন্নতমনা (অবশ্য আধুনিক মতে) হইতে পারেন নাই বলিয়া অধিকাংশ ভিন্ন দেশীয় ও ভারতবাসীর বিশ্বাস। অবশ্য তখনকার ভাবের কথা বলা যাইতেছে যে, এই সব শ্রেণীর নৃপতিবৃন্দকে আমার বিশ্বাস সেই কালের Conservative Government এর কর্ম্মচারীবর্গ এখনকার উদারনীতি গভর্ণমেন্টের অনুকূল শিক্ষাদীক্ষা দিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে তাঁহাদিগকে মাত্র কতগুলি figure head (পুত্তলিকা) রূপে স্থান করিতে চেষ্টা করা হইয়াছিল। নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তটি এ প্রসঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আমরা যখন স্কুলের ছাত্র ছিলাম তখন আমাদের ক্লাসে দুইজন মদন নামের বালক ছিল। ''নামে মিত্র যমে টানে" এবং স্কুল মাষ্টারও টানিয়া থাকে। একের দোষ ও গুণ মধ্যে মধ্যে অপরের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া অনেক সময়ে বিভ্রাট ঘটাইত। এক সময়ে এক মদন উৎকট জ্বর রোগে আক্রান্ত হয়। ইংরেজ ডাক্তার নিজ বাড়ী হইতে ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া দিত। মদন আরোগ্য লাভ করিল বটে, কিন্তু হঠাৎ প্রকাশ পাইয়া বসিল-মদন মুরগীর জুস খাইয়া ফেলিয়াছে। মদনের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা হইয়াছিল, কিন্তু অদ্য পর্য্যন্ত বেচারার নাম রহিয়া গেল 'মুরগী-মদন'। হিন্দুকে মুরগীর জুস খাওয়ার ব্যবস্থা করা যেমন চিকিৎসকের অন্যায় দেশীয় নৃপতিবৃন্দকে বিলাতী উপায়ে শিক্ষিত করাও তেমনি,-প্রাণটা হয়ত তাহাতে বাঁচে, কিন্তু দেশের নিয়ম ও সংস্কারদিতে সেটা এত আঘাত করে এবং এমন ভয়ানক আপদ জঞ্জাল আসিয়া জুটে যে, প্রাণ রাখাই সে অবস্থায় কষ্টকর হইয়া উঠে। বিদেশীভাবে শিক্ষার সহিত বিদেশী আবর্জ্জনাও সংসর্গগুণে আসিয়া জুটে। সে কালের ইংরেজ কর্ম্মচারীর প্রয়াস ছিল রাজাকে public money and public utility বুঝাইতে এবং সে উপায়ে সোজা রাখিতে। অপর পক্ষে রাজন্যবর্গ কিন্তু কিছুতেই তাহা বুঝিতে চান না; কারণ তাহারা public money কি তাহা বুঝেন না এবং public utility কি তাহার তত্ত্ব রাখেন না। তাঁহার বোধ হয় বঙ্কিম বাবুর কমলাকান্তের ভাবে utility অর্থে বুঝেন-''তোমরা কেবল চাষ করিয়াই খাও।" তাঁহাদের প্রজাবর্গও বুঝে চাষ করাই তাহাদের একমাত্র কার্য্য, চাষের জমির মূল্য রাজার প্রাপ্য। কেবলমাত্র এজন্যই ইংরেজ কর্ম্মচারী ও

ভারতীয় নৃপতিবৃন্দের মধ্যে অনেক রাজ্যে (with few honourable exception) খটখটি এবং মসীযুদ্ধ,তৎপরে প্রকাশ্য আদালত পর্য্যন্ত শ্রাদ্ধ গড়াইয়াছিল; ইতিহাস তাহার সাক্ষী। দৃষ্টান্ত, উত্তরপশ্চিম প্রান্ত প্রদেশের কাশ্মীরের মহারাজা, –প্রমাণ তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউনের নিকট কাশ্মীর অধিপতি মহারাজার পত্র;-

"Incase this liberty is not allowed me by the Supreme Government and I have to remain in my present most miserable condition, I would most humbly ask Your Excellency to summon me before you (and I will be most happy to obey such summons) and shoot me through the heart with your hands and thus at once relieve an unfornate prince from unbearable misery, contempt and disgrace for ever."

ভাবার্থ-যদি সুপ্রীম গভর্ণমেন্ট আমাকে স্বাধীনতা প্রদান করা শ্রেয় না মনে করেন এবং আমাকে এই অতি শোচনীয় অবস্থায় রাখাই তাঁহাদের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে হে রাজপ্রতিনিধি বড়লাট সাহেব মহোদয়! আপনার নিকট আমার সানুনয় অনুরোধ আমাকে আপনি আপনার সমক্ষে উপস্থিত হইতে অনুমতি করুন। স্বহস্তে আমার বক্ষে গুলী করিয়া এই হতভাগ্য রাজা নামধারী জীবকে, তাহার এই হেয় ঘৃণ্য অবস্থা হইতে চিরদিনের জন্য অব্যাহতি দিন।

পক্ষান্তরে তুল্য অবস্থায় ভারতের উত্তপূর্ব্ব প্রদেশে ত্রিপুরার মহারাজা একই কারণে যাহা করিয়াছিলেন, অমৃতবাজার পত্রিকায় নিম্ন উদ্ধৃত উক্তি হইতে বুঝা যাইবে।

"The incident naturally caused great consternation in Bengal, firstly because it happened immediately after the abdication of the throne by the Maharaja of Kashmere; and, secondly, because, the Maharaja of Tippera was regarded as one of the model Princes in India. When we announced the startling news of the practical dethronement of the Maharaja, we were informed that the Government, had no knowledge of the fact, and that Mr. Greer had acted of his own motion'.

ভাবার্থ-ত্রিপুরারাজের সিংহাসনচ্যুতিতে বঙ্গদেশে মহা আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে তাহার কারণ প্রথমঃ ঘটনাটা কাশমীররাজের সিংহাসনচ্যুতির পরই ঘটিল, দ্বিতীয়তঃ, ত্রিপুরার মহারাজকে সর্ব্বসাধারণে আদর্শ নৃপতিরূপে ভক্তি করে। কিন্তু এ ব্যাপারে গভর্ণমেন্ট দোষী নন, এ বিষয়ে গভর্ণমেন্টের আদেশ না লইয়াই গ্রিয়ার সাহেব নিজ দায়িত্বে এ হঠকারিতা করিয়া বসিয়াছেন।

ইহা হইতে প্রতীয়মান হইতেছে একজন নৃপতি যেখানে গুলি দ্বারায় মৃত্যুকে আহ্বান করিয়াছিলেন, অপর পক্ষে, অন্য নৃপতি স্বীয় তেজবলে জেদ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং স্বীয় প্রাপ্য আদায় করিয়া লইয়াছিলেন। ত্রিপুরা ক্ষুদ্র রাজ্য হইলেও প্রাচীন রাজ্য বটে এবং তাহার পাছে ভিমরুলের চাকের মত Frontier policy ছিল না। কিন্তু ত্রিপুরার পেছনে অনেক দেশীয়-শত্রু চাটুকারবৃত্তি দ্বারায় স্বীয় অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য প্রায় অন্ধ হইয়া লাগিয়াছিল। এ আপদ হইতে এখনও কোন রাজ্য, এমন কি ক্ষুদ্র জমিদার পর্য্যন্ত, মুক্ত নন। চাটুকারগণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাজার কি যে মহা অপকার ঘটায় তাহা সকলেই অবগত আছেন, বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। ত্রিপুরাতেও ইহার অভিনয় অনেক প্রকারে হইয়া গিয়াছে। দেশের সুপ্রিম গভর্ণমেন্ট ও পার্শ্বসহচর দ্বারাই রাজন্যবর্গের কেন, সমস্ত লোকেরই মনের ভাব গঠিত হয়, সঙ্গ যে চরিত্রের প্রধান উন্নতি অবনতির কারণ, তাহা সর্ব্বজনবিদিত।

মোগল সময়ে ভারতীয় নৃপতিবৃন্দ হিন্দুভাব প্রায় পরিত্যাগ করিয়া মোগলাই হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের "দরবার", "লেবাস", "চোপদার", "পানদান", "খানাদান", "উজীর" প্রভৃতি শব্দের দ্বারায় ইহা বুঝিয়া লওয়া সহজসাধ্য বলিয়া মনে করি। এমন কি, সে অবধি কোন কোন বংশে মুসলমান পত্নীর আমদানী হইয়াছিল, এবং এখনও অনেক "রাজকুলে" তাহাই রীতি নীতি বলিয়া স্থিরতর থাকিবার প্রমাণ, ইতিহাসে পাওয়া যাইতেছে। সে সময় সাগর পার হইতে এক সভ্য জাতি আসিয়া

ভারতে Constitutional ভাব পৌঁছাইয়া দিল এবং ক্রমে ক্রমে ভারত লাল রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া পড়িল। এক্ষণে ইংরেজ চান সমস্ত নৃপতিবর্গকে Constitutional Prince (Native prince or chief) সদ্য দধির মত বানাইয়া তুলিতে; কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র বলে ''সদ্য দধি প্রাণহারী হইয়া থাকে।" এমন সময় স্বনামধন্যা ভিক্টোরিয়া মহোদয়া (Empress of India) ভারতেশ্বরী আখ্যা গ্রহণ করিয়া ভারতীয় নৃপতিবৃন্দকে নিজ কোলে আশ্রয় দিলেন, এবং তাঁহাদিগকে ক্রমে ক্রমে ''রাজা" বানাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে সময় বিখ্যাত রাজা Sir T. Madhab Rao বলিতেছেন ঃ-

Native Princes being absolute rulers they appear at first sight to be the sole source of all obstacles to any change; but a nearer acquaintance will show that view to be not quite correct. As a body they are undoubtedly intelligent, and they are not all equally devoid of a love for their subjects, or the desire to govern them well, yet the general complaint is that their rule is oppressive. How is this to be accounted for? The fact is the princes are after all individuals and are not only subject to the unwholesome influences of their early training, but in the absence of any system are helplessly in the hands of their surroundings. Now these surroundings consist of vested interests of all sorts in whose eyes the one merit on which the existence of the State rests indiscriminate charity to idlers of sorts and indulgence to the privilege and official classes, and the one sin is strictness in the expenditure of the taxes or justice to the toiling Ryot.In such a situation zeal for reform or love of economy cannot be expected to flourish nor can any reform, if introduced by a stong-willed ruler, be trusted to be safely carried out for any time or continued by a successor. Is it then a wonder that they should let well alone?

প্রথম দর্শনে ভারতীয় নৃপতিগণকে সর্ব্বপ্রকার উন্নতির অন্তরায় বলিয়া মনে হইলেও, তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইবার সুযোগ ঘটিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, এ ধারণা নির্ভুল নহে, ভারতীয় নৃপতিগণের অধিকাংশই সাধারণতঃ বুদ্ধিমান ও প্রজার হিতসাধনে সদা চেষ্টিত, কিন্তু তথাপি তাঁহারা প্রজাপীড়ক একথা উঠে কেন? ইহার কারণ আছে, রাজন্যবর্গও মানুষ, তাঁহাদের মতিগতি ও তাঁহাদের বাল্যশিক্ষা, সংস্কার ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। তাঁহাদের পারিপার্শ্বিক সুযোগ সুবিধা, অবস্থা বলিতে এখন বুঝিতে হয় অন্যের চক্ষু-অন্যের দয়া-সরকারী আমলাতন্ত্রের খেয়াল,-এ অবস্থায় কি কাহারও সংস্কারের জন্য উৎসাহ থাকিতে পারে?

Sir Madhab Rao এ সমস্যা পূরণার্থে একটা প্রকৃষ্ট উপায় বলিতেন ঃ-

"How, then, is reform to be introduced and maintained in the face of these obstacles? It has been already shown that, though a ruler is inclined to introduce measures of reform, the inertia of his surrounding and the vested interests arrayed against the change would thwart their successful execution even during his own life-time and the changes after him would be still more uncertain unless there was continuous extraneous help against which such obstacles would be powerless; and this help would be effectually forthcoming if the Political Agents were to share with the Raja his responsibility for efficient administration. In that case the Political Officer will be able to realise the difficulties in the way of the Prince better than he now can, and then and then but not till then, will his authority, and influence be truly utilized in the promotion of good Government in the State. The anomaly of the present system is that the Rajas are backward and even if they are personally educated their surroundings rivet them to that condition. To enable them, to rise above it, which the British Government not unreasonably expects of them it is bound to give

them the needful aid especially when it can do it without inconvenience or sacrific and this I submit it can do by holding its Political officers formally responsible along with the Native Rulers for the Character of their administration."

এই সকল বাধার পথে তাহা হইলে কি উন্নতিমূলক সংস্কার সম্ভব নহে? রাজন্যবর্গের পারিপার্শ্বিক পারিষদ ও প্রধান পাণ্ডাগণের আধিপত্যে সকল চেষ্টাকেই কি ব্যর্থ করিয়া দিবে? উপায় কি নাই? আছে! যদি রাজার ন্যায় পলিটিক্যাল অফিসারগণকেও রাজ্যের উন্নতি অবনতির জন্য দায়ী করা হয়, তাহা হইলে এ অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধিত হওয়া সম্ভব। যে অবস্থায় রাজ্যের রাজার ন্যায় পলিটিক্যাল অফিসারকেও রাজ্যের উন্নতির জন্য বাধ্য হইতে হইবে (চাকুরির মায়া বড় দায়!) ও এক্ষণে পলিটিক্যাল প্রভুর যে শক্তি ও প্রাধান্য 'রাজা চরাইতে' নিয়োজিত রাজ্যের উন্নতি অবনতিতে চাকুরী রক্ষা করিতে হইলে, তাঁহাদের সে শক্তি রাজ্যের কল্যাণে নিশ্চয় প্রয়োগ করিতে হইবে ও রাজন্যবর্গকে তাঁহারা সাহায্য করিতে বাধ্য হইবেন।

তাৎকালিক দুইটি স্বাধীন রাজ্যের ঘটনা পর্য্যালোচনা করিলেই এ কথার সারবত্ত্বা পরিলক্ষিত হয়। সেই সময়ে কাশ্মীরের মহারাজা নিজ ইচ্ছামত মন্ত্রী নিযুক্ত করায় কিরূপ সুফল প্রসব করিয়াছিল, তাহা নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝা যায়-

"This work as well as his work as Chief Judge was so satisfactority performed that the Maharaja, in token of approbation almost doubled his remuneration.Shortly after this, the silk industry was started in Cashmere and Mr.Mookerjee was placed in charge of it. The Industry rapidly developed and expanded,and Mr.Mookerjee was favoured with the commendatory notice of the Government of India and the Secretary of State.

ভাবার্থ-মহারাজার প্রধান মন্ত্রীর কার্য্য ও তৎসঙ্গে অন্যান্য কার্য্য এরূপ দক্ষতার সহিত তিনি(নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়) সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন যে, কাশ্মীরাধিপতি তাঁহার গুণবত্তার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহার বেতন দ্বিগুণ করিয়া দিয়াছিলেন। এই সময় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে রেশম বিভাগের ভার প্রদত্ত হয়; অচিরে কাশ্মীরে রেশম শিল্প এরূপ আশাতিরিক্ত উন্নত ও প্রসারিত হইয়াছিল যে ভারত গভর্ণমেন্ট পর্য্যন্ত তাঁহার সুখ্যাতি করিয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করেন।

ইহা হইতেই প্রতীত হয়, রাজন্যবর্গ যদি নিজ নিজ ইচ্ছামত উপযুক্ত ব্যক্তিকে রাজ্যের প্রধান কার্য্যে নিযুক্ত করিতে অধিকারবান হন ও মন্ত্রীগণ যদি রাজ্যের উন্নতির জন্য দায়ী থাকিয়া কার্য করেন, রাজার মানসম্ভ্রম উন্নতি যদি তাঁহারা নিজের বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে সরকারনিযুক্ত পলিটিক্যাল অফিসার হইতে সে সকল দেশীয় কর্ম্মচারী দ্বারা রাজ্যের কম মঙ্গল সাধিত হয় না। ইহার প্রমাণের অভাব নাই। তাৎকালিক পুস্তিকা ও দৈনিক ইংরাজী পত্রিকায় ইহার প্রমাণ যথেষ্ট আছে।

প্রথমে যে সব উদ্দেশ্যে পলিটিক্যাল অফিসার নিযুক্ত হন, তাহা কতদূর সার্থক হইয়াছিল তাহা সে কালের বৃদ্ধেরা বেশ জানেন। ধরুন, যে উদ্দেশ্যে সার মাধব রাওয়ের সঙ্গে পলিটিক্যাল মহাশয়কে জুড়িয়া দেওয়া হয় তার কতখানি সফল হইয়াছিল? কাজকর্ম্মের সুবিধা হওয়া দূরের কথা, ফলে ত দাঁড়াইয়াছিল-উভয়ের মধ্যে খাদ্যখাদক ভাব। রাজা রাজ্যের জন্য পাশ্চাত্য সভ্য উপায়ে চলিতে চান না, আর Political Agent রাজাকে বাধ্য করিয়া যে মুরগীর জুস খাওয়াইতে চান ও জেদ করেন। কিন্তু এ কথা কাহারও মনে আসে না যে, যে পর্য্যন্ত রাজার স্বীয় অভিপ্রায় অনুসারে মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে না পারেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহার নিজ ইচ্ছামত প্রজাপালনের আশা অল্প এবং মন্ত্রীর উপর তিনি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন না। এ বিষয় বিখ্যাত জার্ম্মেন পণ্ডিত Max Muller (যিনি জীবনে ভারতে পদার্পণ করেন নাই এবং Indian Politics সম্বন্ধে একেবারে নির্লিপ্ত ছিলেন) বলিতেছেন-

" But when an opening had once been made for native talent was not wanting. The names

of such men as Sir Salar Jung in Hyderabed, Sir T.Madao Rao in Travancore,Indore, and Baroda,Sir Dinkar Rao in Gwalior, are well Known not in India only but in England also,and not the least successful among them was our friend Gauri-Samkara.

With all the narrow prejudices of Oriental Society,particularly in India, there was always carrier auverte aux talents.Gauri-Samkara was the son of a poor man, though he belonged to a good Brahmanic family. His education would not perhaps,have enabled him to pass the Indian Civil Service Examination, and yet what an excellent Civil servant would he have made. Examinations prevent many evils,but they cannot create or even discover the qualities necessary for a ruler of men.

If Bismarck made Germany, Gauri-Sankara made Bhavnagar.The two achievements are so different that even to compare them seems absurd,but the methods to be followed in either case are after all, the same; nay, it is well known that the making or regulating of a small watch may require more nimble and careful fingers than the large clock of a cathedral'.

ভাবার্থ-সুযোগ প্রদান করিলে ভারতীয় মেধার অভাব হয় না। হায়দ্রাবাদের স্যার স্যালারজঙ্গ, ত্রিবাঙ্কুর, ইন্দোর ও বরোদার মাধব রাও, গোয়ালিয়রের স্যার দিনকর রাও কেবল ভারতে সুপরিচিত নহেন— ইংলন্ডেও তাঁহারা সুবিদিত। ইহাদের মত আমাদের বন্ধু, গৌরীশঙ্করও কম শক্তিসম্পন্ন ও সুযশাঃ নহেন। গৌরীশঙ্কর বর্ণশ্রেষ্ঠ উত্তম ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। তাঁহার শিক্ষা সমৃদ্ধি এমন ছিল না যে, যদ্দ্বারা তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ; কিন্তু তিনি কার্য্যতঃ একজন শ্রেষ্ঠ সিভিল সার্ভেন্ট হইয়াছিলেন। পরীক্ষা হয়ত অনেক দোষ নিবারণ করিতে সমর্থ, কিন্তু উহা প্রকৃত লোকশাসক হইতে হইলে যে সব গুণের আবশ্যক, পরীক্ষা তাহার আবিষ্কারক বলিয়া কিছুতেই বিবেচিত হইতে পারে না।

বিসমার্ক যদি জার্ম্মেনী প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন, গৌরী শঙ্করও ভবনগরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যদিচ উভয়ের সাফল্যের মধ্যে অনেক অন্তর, দুইটি বস্তুর একত্র তুলনাই হয় না, তথাপি মূলগত নীতিতে দুইটি এক। উপাসনালয়ের সুবৃহৎ ঘটিকা—যন্ত্র হইতে অতিক্ষুদ্র ট্যাক ঘড়ির সংস্কার ব্যাপারে অধিকতর সাবধানতার সহিত অঙ্গুলী সঞ্চালন করিতে হয়, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ভট্ট মোক্ষমূলার ভারতের উপর শ্রদ্ধাবান ও ভক্তিবান ছিলেন সে কারণে তিনি ইউরোপ বসিয়া, হংস যেমন জলটুকু পরিত্যাগ করিয়া দুধটুকু গ্রহণ করিয়া থাকে, তেমনি ভারতীয় নৃপতিকুলের খবর রাখিতেন, সাত সমুদ্র তের নদীর পার হইতে। তাই তাঁহার প্রণীত Auld Lang Syne, My Indian Friends গ্রন্থে ভারতীয় নৃপতিগণ সম্বন্ধে যতটুকু বলিয়াছিলেন, লিখকের মনে হয় ঐ লিখার ভাবে, দুধটুকু ক্ষীর হইয়া গিয়াছে। উপরিউক্ত উদ্ধৃতাংশে তাহা বেশ অনুভব হয়।

ইংরেজ রাজপুরুষ Parliament এর member Sir, J, Rees দুঃখের বিষয় সম্প্রতি তাঁহার accident মূলে মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার Real India নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

" The case is still worse where it happens that the right of the chief to choose his own minister is practically taken from him,in consequence of advice tendered by the resident or by the local Government. There are always factions at these courts, one or another of which frequently

gets the ear of the Political Agent, and able officers of the State, well fitted to become ministers to their Maharajas, may not be popular with the little European clique at the capital. The craze for reform after British patterns, whether or not required, is such that it ever points towards the expediency of bringing in outsiders. The Officer thus introduced, almost invariably a capable Brahmin, who has eventually to revert to British employ and knows on which side his bread is buttered, immediately proceeds to justify his appointment by the introduction of wholesale changes in the administration of of ambitious schemes which dissipate the cash reserves of the State, and do not necessarily add to the happiness of its inhabitant.''

উপরি উদ্ধৃত অংশে দেখা যায়, ইংরেজ পর্য্যন্ত ধার করা গভর্ণমেন্ট কর্ম্মচারীকে কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে চায় না। অপিচ রিজ সাহেব বোম্বে প্রদেশের সিভিলিয়ান এবং পররাষ্ট্র বিভাগের কর্ম্মকর্তা ছিলেন। বোম্বাই প্রদেশে শত শত দেশীয় রাজ্য আছে, যাহারা শত উপায়ে রাজ্য শাসন করেন, তাঁহাদের রোগ ছিল 'Harpis'(সহস্র জ্বালা)। কাজেই রিজ সাহেব, স্বীয় অভিজ্ঞতায় ও সহানুভূতি দ্বারায় যে কথা বুঝিয়েছেন, আমাদের সে বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই। বোধ হয় এই জন্যেই ভূতপূর্ব্ব Viceroy Lord Chelmsford Chiefs conference এ ৩ রা নভেম্বর ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। যাহাকে আমরা বলি 'Viceroy's warning.'

" There is no reason why your Nobles and jagirdars should be in the future as they were when you first entered into possession of your State, the bulwarks of your rule if you place your reliance upon them and educate to work with you in your task and if they on their part recognise that it is their duty to serve you with loyalty''.

আমাদের একান্ত বিশ্বাস Viceroy এর উপদেশ মত, ও বন্ধুভাবে যে উপায় অবলম্বন করিতে নরেন্দ্রমণ্ডলকে বলিয়াছিলেন, তাহা আজ হউক বা কাল হউক কিংবা শতাব্দী কালেই হউক, তাহা অবলম্বিত হওয়া ব্যতিরেকে কোন দেশীয় রাজ্যের উন্নতি সম্ভবপর হইবে না, এই Warning যদি বিশ কিম্বা ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে হইত, তাহা হইলে কতকগুলি দেশীয় রাজ্যের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকিত। সুখের বিষয় এক্ষণে তিমির রজনী গত হইয়াছে। ' স্বল্প তিষ্টতি সর্ব্বরী'— অতএব অরুণ উদয় কাল অতি নিকটবর্ত্তী। ভারতের Moderates and Extremist গণ যেভাবে স্বীয় স্বীয় রাজ্য বা 'স্বরাজ' পান না কেন, এই ভারতের স্তম্ভ তুল্য Native States গুলিকে কোন পক্ষই ত্যাগ করিতে পারিবেন না। সুধীগণ চিন্তা করিয়া দেখুন এবং 'বে—সবুর' দল দূরবীক্ষণ এবং অণুবীক্ষণ দ্বারায় বিশ্লেষণ করিতে থাকুন যে, ইঁহাদের জন্য স্থান কোথায় রাখা হইবে?

ত্রিপুরা হইতে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। ডাক্তার শম্ভুচরণ মুখার্জ্জি কি কারণে ত্রিপুরার মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন।

"Why do you not publish an account of your life as Minister of Tippera'? The answer is - because I might then compromise my master and the little State I served and secondly, because I might thereby close the only career open to me in Native India. British officials try their utmost to keep able and writing natives out of the Native States, and any indiscretion on my part would arm them with a deadly weapon against me and the small class of aspiring natives educated in western learning who can manage states.''

এ ভদ্রলোককে স্বয়ং ত্রিপুরাধিপতি বাছনী করিয়া আনিয়াছিলেন। যদি তাঁহার আসন না টলিত, তাহা হইলে ত্রিপুরার ইতিহাস অন্যরূপ হইত। এই সময়ে কতকগুলি দেশীয় রাজ্যের সহিত ভারত গভর্ণমেন্টের সদ্ভাব ছিল না। মালাবারি লিখিয়াছেন—

" Owing to the incapacity of many of the ruling chiefs, the political agents slowly encroached upon the power and authority of the former and came to exercise, indirectly at any

rate, supreme control. This position has now become crystallized. The Supreme Government, no doubt, desires to ameliorate the condition of the Native States and their people through their accredited agents.A master ful 'political' loves to brush aside the ruler as of little account, practically relieving him of all responsibility. Lord mayo described him as 'a dangerous official.' He himself rules through a Prime Minister or a Council who intrigue against their own chief. It is to their advantage to prevent all good understanding between the Rajah and his political.''

তারপর Lord Curzon আসিয়া ভারতীয় নৃপতিবৃন্দকে সহানুভূতির সহিত এবং অনেক সময় School Master এর মত ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার গোয়ালিয়ার রাজ্যে রাজভোজের দিনে প্রদত্ত পূর্ব্বোক্ত বক্তৃতাটি আমার বিশ্বাস অনেকের শ্রুতিরোচক হয় নাই। কারণ Curzon রাজাদিগকে Subordinate officer রূপে পাইতে ও দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর দরবারে তিনি রাজাদের লইয়া যেমন ''প্রদর্শনী'' করিয়া ছিলেন এবং ভারতীয় শিল্প দ্রব্যের প্রতি অনুরাগী হইবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন, তেমন তাঁহাদিগকে পশ্চাৎবর্ত্তী রাখিয়া হস্তীর শোভা যাত্রা করিয়া উৎফুল্ল হইয়াছিলেন। দরবারের দিনে একটা ঘটনা আমাদের চক্ষে পড়িয়াছিল, 'রাজগণকে' কেবলমাত্র Viceroy কে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইবার অবসর দেওয়া হইয়াছিল এবং পরে করমর্দ্দন করিয়া লাটসাহেব তাঁহাদিগকে প্রীতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন—রাজ সহোদর Duke of Conoughtকে বামে রাখিয়া; ইহা অবশ্য ইংরেজী কায়দা। কিন্তু বরদার গাইকোয়ার সে ''কায়দার'' বিরুদ্ধে একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। Viceroy কে তিনি করমর্দ্দন করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজ ভ্রাতাকে তিনি ''সেলাম অভিবাদন'' করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। দর্শকগণ ইহাই অনুভব করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সে ছিল এক যুগ, ভবিষ্যতে দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে Morley-Minto ভারতে উদার নীতির প্রথম ভিত্তি সংস্থান করিয়া গিয়াছিলেন, সে সময় Lord Minto উদয়পুরের মহারাজের রাজ—ভোজে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে ভারতের রাজন্যবর্গের সহিত বর্ত্তমানে Government এর কি সম্বন্ধ তাহা তিনি তিনি স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছিলেন। তাহার ফলে অতীতে কি হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে কি হইতেছে তাহা ক্রমশঃ দ্রষ্টব্য।

পুরকালের রাম রাজত্বি রামচন্দ্রের সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়াছে। ঐতিহাসিক কালের রাজা অশোক চলিয়া গিয়াছেন,ভারতকুলকে শোকে ভাসাইয়া। তারপর অধীনতার যুগে ভারত বিদেশীর প্রবল প্রতাপের মধ্য দিয়াই প্রায় চলিয়াছে। কাজেই হিন্দুরাজগণের পক্ষে বিদেশী ভাব ও ভাষা, এমন কি পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত বিদেশী ধরণের হইয়াছে। সে রামের মত রাজা পাওয়ার আশা করিতে পারা যায় কি? ভারতবর্ষকে দেশীয় রাজাদের হাতে সমর্পণ করার এ সময়ে সুসময় উপস্থিত হইয়াছে কি? ইহাই বিবেচ্য বিষয় বলিয়া মনে করি।

'চন্দ্র সূর্য্য বংশ অগৌরবে ভ্রমে,
লজ্জা—রাহুমুখে লীন।'

ইহা কবির কাব্য হইলেও এই বাক্য প্রাণে লাগিয়াছে শিশুকাল হইতে। অল্প সংখ্যক ভারত নরপতি ব্যতীত আমরা দেখিতে পাই, প্রায় সকলেই রাজত্ব ছাড়িয়া রাজ্য শাসন করিতেছেন; মন্ত্রী ছাড়িয়া বিদেশী ধরণের council দ্বারায় মন্ত্রণা পাইতে চান। নিজেরা আয়াস আরামে থাকেন। পুত্রসদৃশ প্রজাবৃন্দের উপর দৃষ্টি রাখার তাঁহাদের অবসর কোথায়? এমন অবস্থায় ভারতবর্ষকে বিভক্ত করিয়া তাঁহাদের উপর ভার সমর্পণ করিতে যাঁহারা আশা পোষণ করিতেছেন, সে আশা কতকালে এবং কোন সময় সফলতা লাভ করিবে তাহাও বিবেচনার বিষয়।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে আমি মহীশূরের মহারাজার বিবাহ উপলক্ষে রাজ অতিথিরূপে তথায় গিয়াছিলাম। সৌভাগ্যের বিষয়, সে সময়ে আমি অনেক দেশীয় নৃপতি এবং নৃপতিবৃন্দের প্রতিনিধিবর্গের সহিত মিলামেশা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। সে উপলক্ষে আমি কয়েকজন দেশীয় নৃপতির সহিত বন্ধুতা স্থাপন করিয়াছিলাম এবং তাঁহাদের রাজ্যে অতিথি হইয়া গিয়াছিলাম। অবশ্য সে সময় ছিল এক যুগ, আর বর্ত্তমানে অন্য যুগ উপস্থিত হইয়াছে একথা সত্য, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষময় এক নতুন গোলযোগও উপস্থিত হইয়াছে—যাহা ভারত ১০/১২ বৎসর পূর্ব্বে স্বপ্নেও দেখে নাই। এক্ষণে Reform লইয়া নানা দলে নানা কথা বলে। ইহা আধুনিক যুগের চিহ্ন বলিতে হইবে। এ বিষয়ে আচার্য্য Max Muller ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন।

" When I see a circus a man standing with outstretched legs on two or three horses, and two men standing on his shoulders, and other men standing on theirs, and a little child at the top of all, while the horses are running full gallop round the arena, I feel what I feel when watching the Government of India. One hardly dares to breathe, and one wishes one could persuade one's neighbours also to sit still and hold their breath. If ever there were an accident, the crush would be fearful, and who would suffer most?"

ভাবার্থ—আমি যখন সার্কাসে একটি লোককে দুটি মানুষকে ঘাড়ে লইয়া তিন চারিটি ঘোড়ার উপর পা ছড়াইয়া দাঁড়াইতে দেখি ও আরও কতকগুলি লোক তাহাদের ঘাড়ে দাঁড়ায় এবং সর্ব্বোপরি একটি ছেলেকে কাঁধে লওয়া হয়, ঘোড়া পূর্ণবেগে গোলভাবে দৌড়াইতে থাকে, তাহা দেখিয়া আমার মনে যে ভাবের উদয় হয়, ভারত গভর্ণমেন্টকে মনোযোগের সহিত দেখিলে আমার মনে হয় তাহাই। সে অবাক কান্ড দেখিয়া নিশ্বাস লইতেও যেন সাহস হয় না, পার্শ্বের ব্যক্তির সহিত কথা কহিতেও যেন বাধ বাধ ঠেকে, শোয়াস্তি নাই যেন তাহাতে। যদি কোন আকস্মিক বিপদ ঘটে,—সব চুরমার! কি ভয়াবহ ব্যাপার! কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা ভোগান্তিটা হইবে কাহার বেশি?

উপরোক্ত বাক্যের সহিত বর্ত্তমান ভারতবর্ষের অবস্থা কতদূর মিলে তাহা সকলের বিবেচ্য বিষয়। তিনি অন্যত্র বলিতেছেন ঃ—

"Some young Indian Rajahs while travelling in Switzerland, found themselves in the same railway carrige with some Russian Princes and noblemen.They had been discussing among themselves some of their grievances in English. And the Russians, who of course understood English, after listening to them for some time, became very communicative, and began to explain to them the beneficent rule of the Tsar. They even went so far as to hold out a hope to them of an Indian Parliament, as soon as the Russians were settled in Calcutta. On parting they asked the Indian Princes, " When shall we see you at St. Petersburg?" And they were not a little taken aback when the strangers bowed and smiled, and said," We are going just now to be present at the opening of Parliament in London. We should like very much to see St. Petersburg afterwards, and to be present at the opening of your Parliament there...."

ভাবার্থ—কতকগুলি ভারতীয় রাজা সুইজারল্যাণ্ডে রেলে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তাঁহাদের সহিত কতকগুলি রুষদেশীয়

রাজকুমার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের দেখা। ভারতীয় রাজাগণ কতকগুলি সুবিধা অসুবিধার কথা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিতেছিলেন। ইংরাজী ভাষা অভিজ্ঞ রুষিয়েরা তাঁহাদের কথাবার্ত্তা কিছুক্ষণ শোনার পর আলাপে যোগ দিয়া বলিল—'জারের শাসনপ্রণালী কত সুন্দর।' তাঁহারা এ পর্য্যন্ত বলিতে দ্বিধা বোধ করিলেন না যে, তাঁরা কলিকাতায় পার্লামেন্ট স্থাপন করিতে আশা রাখেন। বিদায়কালে রাজাগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন ''সেন্টপিটারবার্গে আপনাদের সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে?'' অদ্ভুত রকমের সেলাম ঠুকিয়া ভারতীয় রাজন্যবর্গ তখন উত্তর করিয়াছিলেন '' এখন তো আমরা লণ্ডনে পার্লামেন্ট খোলাটা দেখতে যাচ্ছি, তারপর সেন্টপিটারবার্গে পার্লামেন্ট খোলাটা দেখবার ইচ্ছাটা খুবই আছে,—সেই উদঘাটন ব্যাপারে উপস্থিত হতে হবেই ত।''

বর্ত্তমান সময়ে দেশীয় নৃপতিবৃন্দ অনেকে Parliament of London দেখিয়াছেন এবং কেহ কেহ যোগ দিয়াছেন। রুষিয়ার কি অবস্থা হইয়াছে তাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন। কাজেই দেশীয় নৃপতিগণ ইংরেজ রাজভক্ত হইবেন সে কথা বলা বাহুল্য। কিন্তু দশ বৎসর মধ্যে ভারতবর্ষ Parliament পাইবার যে আশা অনেকে করিতেছেন, তাঁহারা নিজ নিজ রাজ্যে কখনও Parliament দিবেন, এ আশা বোধহয় সুদূরপরাহত। কারণ, তাঁহাদের পিতা পিতামহ, কি পৌরাণিককালে অথবা আধুনিককালেParliament দ্বারা রাজ্য শাসন করিতে চান নাই এবং তাঁহারাও করিবেন না। তবে তাঁহারা সুশাসন করিতে পারিবেন এরূপ আশা করা যায়—যদি তাঁহাদের ভাব এবং স্বভাব পরিবর্ত্তিত হয় এবং তদনুসারে তাঁহারা চলেন এবং চালিত হন। তাঁহাদের সুমন্ত্রীর দ রকার। মন্ত্রণা সভার আবশ্যক হইলে সুমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারেই তাহা হইবে, কিন্তু agitation দ্বারা কখনও হইবে না। Agitation এরপশ্চাতে যে সকল আপদ জঞ্জাল আছে এবং হয়, তাহা তাঁহাদের বিলক্ষণ জানা আছে। একথা দেশীয় রাজ্যবাসী প্রজাবৃন্দ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে এবং বোধ হয় তাহারা agitation রূপী বৃক্ষের ফল খাইতে প্রস্তুত নয়। মাঝে মাঝে কোন কোন রাজ্যে জনান্তিকে agitation সম্বন্ধে যে কথা শোনা যায়, প্রায় সকলই তাহা বিদেশের আমদানী। কিন্তু এ সকল এখনও বিক্রয় হইতেছে না দেশীয় রাজ্যবাসীর নিকট— বিদেশীর প্রতি সন্দেহ দোষে। দেশীয় রাজ্যবাসী বেশ আরামে বর্ত্তমান Moderate ও extremist দের দলাদলির তামাসা দেখিতেছে। হয়ত কোন কোন স্থানে সংক্রামক ব্যাধির বীজের মত রোগ উৎপাদন করিতে পারে, কিন্তু রাজ চিকিৎসক তাহার লক্ষণ বুঝে এবং তীক্ষ্ণ —বীর্য্য ঔষধ দ্বারায় ব্যাধি নির্ম্মূল করিতে পারে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতেছে, গত ২৩ শে এপ্রিলের সংখ্যা "Nation and Athenaeum নামক পত্রে একজন Indian correspondent লিখিয়াছেন—বর্ত্তমান সময়ে ভারত নৃপতিবৃন্দের অবস্থা কি?

" The Chamber of Princes, one of the many stillborn children Lord Chelmsford, attempted to give them a meeting-place where they could discuss matters affecting their class. The smaller rulers who had nothing to lose, repaired to it in shoals. Not so the larger fish.The Nizam for instance, with dominions as large as France and as populous as Egypt, does not want to hobnob with chieftains who may be far less powerful than his own vassals. The little Rajput chiefs alone are so numerous that they can outvote any combination that can be brought against them, and do outvote, since they are organized under an able leader, the Maharaja of Bikanir.''

ইঁহারা যে আরামে আছেন একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইঁহারা যথেষ্ট সম্মান অর্জ্জন করিয়াছেন একথা সত্য। পূর্ব্বে যাঁহারা Political agent কর্ত্তৃক চালিত হইতেন বর্ত্তমানে তাঁহারা প্রকৃত স্বাধীন হইয়াছেন। ঐ পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে যে "The Political agent of to-day is a wilted and almost pathetic.They have orders to treat the

Princes of India as if they were Princes and not "naughty boys''. দেশীয় রাজ্যবাসী বলিয়া একথা আমাকে বিশ্বাস করিতে হইতেছে। পণ্ডিত ব্যক্তির কথা মানা উচিত এবং তাঁহারা আমাদের দৃষ্টান্ত অনুকরণীয়। ভট্ট Maxmuller জার্ম্মেন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত Dukedom রাজ্যের অধিবাসী। তিনিAuld Lang Syne, first series, European বন্ধুবর্গের Recollection লিখিতে যাইয়া "Recollection of Royalities''পূর্ব্বাধ্যায়ে তাঁহারই Duke কে উপলক্ষ করিয়া প্রায় পর্ব্ব সমাপন করিয়াছেন। অন্যান্য Crown Heads দের সম্বন্ধে অধিক কিছু বলেন নাই। তাহার কারণ ঐ Dukedom ক্ষুদ্র; এমন কি এক রাস্তা পার হইলেই তাঁহার Frontier পরিত্যাগ করা হয়। একটি দুষ্ট লোককে Duke তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, কোন এক অপরাধের জন্য। ঐ দুষ্ট লোক রাস্তার অপর পারে গিয়া ভিন্ন রাজ্যে উপস্থিত হইয়া ঢেলা মারিতে মারিতে Duke এর রাজপ্রাসাদের দরজা জানালা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন । Max Muller এমন ক্ষুদ্র রাজ্যবাসী হইয়াও গর্ব্ব করিতেন এবং Duke কে তিনি পিতৃবৎ দেখিতেন। লেখক যদি ত্রিপুরা রাজ্য সম্বন্ধে কোন কথাবার্ত্তার অবতারণা করে, তাহা হইলে পাঠকবর্গ বেজার হইবেন না। কারণ, দৃষ্টান্তস্থলে আমাকে অন্য রাজ্যের কথা লইয়া আলোচনা করার সুবিধা হইবে না বলিয়া মনে করি।

বর্ত্তমান ত্রিপুররাজ্য কালে সাম্রাজ্য তুল্য ছিল। ইরাবতী নদী হইতে পবিত্র গঙ্গাকুল পর্য্যন্ত ইহার সীমা ছিল। কালচক্রে ঐ রাজ্য চতুঃ সহস্র বর্গ মাইলে পরিণত হইয়াছে,—বাজীকর যেমন হস্তস্থিত তাসগুলিকে আকুঞ্চিত করিতে করিতে এত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র করেন যে, পরে ফুঁ দিয়া তাহাও উড়াইয়া দেন। ইহা অবশ্য আপ্রাসঙ্গিক কথা। কিন্তু শঁম্ভুচন্দ্র মুখার্জ্জি মহাশয় অগাধ পণ্ডিত ছিলেন এবং উঁচু দরের সাহিত্যিক ছিলেন, একথা বোধ হয় আজও অনেকে জানেন। যখন ত্রিপুরায় সর্ব্ব প্রথম Political agent নিযুক্ত হইলেন তখন Redtape ও Fullscap আপনা হইতে আসিয়া পৌঁছিল, ইংরেজী ধরণে। প্রাচীন বংশের যেমন গুণ আছে, দোষও ততোধিক আছে এবং ইহাও স্বাভাবিক। Political লিখা পড়া করার জন্য বীরচন্দ্র, শম্ভুবাবুকে আপনা হইতে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং তিনি আসিয়াছিলেন ও নিজ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে তিনি কেন চলিয়া গেলেন তাহা পূর্ব্বে শম্ভুবাবুর পত্রে প্রকাশ হইয়াছে। কতকগুলি কারণের মধ্যে কয়েকটা ঘটনা দৃষ্টান্তস্থলে বলা যাইতেছে। বীরচন্দ্র ছিলেন রক্ষণশীলবাদী অথচ উদারনীতির প্রতি অনুরাগী। কিন্তু নিজ রাজ্য সম্বন্ধে কোন কথা উপস্থিত হইলে তাঁহার মত যাহাতে রক্ষা হয়, সে বিষয়ে তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। শম্ভুবাবু বীরচন্দ্রের অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু Political agent এর সন্দিগ্ধমূলক দৃষ্টির মধ্যে পড়িয়া গেলেন। ইতিপূর্ব্বে বীরচন্দ্র ঢাকায় যাইয়া Lord Northbrooke (Viceroy) সহিত State visit দিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য Return visit দিলেন না। বীরচন্দ্র ক্ষুণ্ণ হইলেন না, কিন্তু সুবুদ্ধির ন্যায় হাসিয়াছিলেন। তাঁহাকে Raja of Hill Tippera নামে Viceroy নিমন্ত্রণ পত্রে অভিহিত করিলেন বটে, কিন্তু বীরচন্দ্র ইহার অর্থ বুঝিলেন না। দেশের এবং দশের কেহই 'Hill Tippera এই Out landish নাম জানে না এবং বলে না। এমন কি ইংরেজী হইতে বাঙ্গালা তরজমা করিতে গিয়া Government Correspondence মধ্যে 'পার্ব্বত্য ত্রিপুরা' বলিয়া অভিহিত করিতে হয়। তদানীন্তন Political Agent কে তিনি ঐ নামে 'বদনাম' করার অর্থ কি তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এই বিষয় লইয়া তিন পুরুষ যাবৎ দিস্তায় দিস্তায় কাগজ খরচ হইয়াছে। অনেক ঝগড়া ঝাটিও হইয়াছে। সুখের বিষয় বর্ত্তমান উদারনীতির পৃষ্ঠপোষক গভর্ণমেন্ট ঐ অলক্ষ্মী নাম পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে সেই পৌরাণিক Tripura নামে অভিহিত করিবার জন্য Gazetted করিয়া দিয়াছেন। তখন শম্ভুবাবুর সহিত সর্ব্বপ্রথম এ বিষয় লইয়া যে কেলেঙ্কারি হইয়াছিল, ঐসব কাগজ পত্র দেখিলে ও শুনিলে যেন বালকগণের যুদ্ধের অভিনয়ের ন্যায় মনে হয়। এভাবে কতকাল চলিয়া গেল। Return visit লইয়া উভয় পক্ষ তিন পুরুষ যাবত ঝগড়া করিয়াছিলেন। কিন্তু সুখের বিষয় উদারনৈতিক Govern-

* সতীদাহ প্রথা বৃটীশ রাজ্য হইতে ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে লর্ড বেন্টিঙ্ক কর্তৃক আইন দ্বারা নিবারিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ হইতে সতীদাহ নিবারিত হওয়ার ৫৪ বৎসর পরে ত্রিপুরা রাজ্য হইতে সতীদাহ প্রথা নিবারিত হইয়াছে।

ment স্বেচ্ছায় তাহা পূরণ করিয়া দিয়াছেন। সহমরণ প্রথা পৌরাণিক কাল হইতে এ রাজ্যে ছিল ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। অবশ্য ইহা যে Barbarous প্রথা একথা বলিতে দ্বিধা বোধ করি না। কিন্তু বীরচন্দ্র মাণিক্য প্রজার কথা শুনিতেন এবং অনেক সময় মানিতেন। এ সতীদাহ প্রথা লইয়া যে ধরণের লিখা পড়া হইয়াছিল Government বীরচন্দ্রের সমস্ত গুণকে ভুলিয়া গেলেন এবং এই দোষটাকে প্রবল দোষের মধ্যে গণ্য করিলেন। কাজেই বীরচন্দ্র মনে করিলেন '' সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল'', তিনি আইন করিয়া ঐ প্রথা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। ভালই করিয়াছিলেন। এ বিষয় Bengal Administration Report 1888 প্রকাশ করিয়াছে।

❋'' The Maharaja has in accordence with advice given to him, prohibited by a duly promulgated order, the practice of Suttee which formerly was permitted.''

লেখক মনে করে, উপরের লিখিত প্রথম ২টি ঘটনা লইয়া যেরূপ তুমুল কাণ্ড হইয়াছিল; তখনকার দিনে কেবলই এই ধরণের লিখা পড়া চলিত। বীরচন্দ্র ইংরেজ রাজের যথার্থ ভক্ত ছিলেন—যেমন অন্যান্য ভারত নৃপতিবৃন্দ ছিলেন ও আছেন। তিনি অনেক সময় সুহাস্য বদনে বলিতেন, ''ইংলণ্ডের রাজা ভারতের সম্রাট। তিনি যেন মরাল পাখী, নিজ গর্ব্বে গর্ব্বিত এবং তাহার চলা ফিরাও তদ্রুপ। কিন্তু বেতনভোগী ইংরেজ কর্ম্মচারীবৃন্দ Viceroy ও Lt. Governor রাজহংস। ইহারা সর্ব্বদা উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করে। Political agentগণকে আমি পাতিহংস মনে করি। ইহারা কেবলই 'খাই খাই—দাও দাও' এবং 'কাদাখোঁচার' মত কাদা খাইতে ও মাখিতে সদা ব্যস্ত। ভারতের ভাগ্যে ব্রিটীশ মরাল আসিয়া আমাদের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে রক্ষা করিয়াছেন, নতুবা আমাকে হয়ত কালে ব্রহ্মদেশবাসী অথবা চীনা পুতুল হইয়া পড়িতে হইত।'' এই উক্তি লেখকের স্মরণে আসিয়া এখনও মরমে প্রবেশ করিতেছে। বীরচন্দ্রের মত সর্ব্বগুণালঙ্কৃত এবং আশ্রিতবৎসল রাজা আমরা কি কখনও পাইতে পারিব? প্রাচীন বংশে এরূপ হওয়া বিচিত্র হইবে না। কাশ্মীরের বৃদ্ধ মহারাজা এখনও বাঁচিয়া আছেন। তাঁহার প্রচারিত পুস্তিকায় তাঁহার দুর্দ্দিনের ঘটনাগুলি পাঠ করিলে বুঝা যায়, তিনি সিংহাসন পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া রক্ষা পান নাই। নীলাম্বর মুখার্জ্জির আত্মীয় স্বজনের সহিত আমার বন্ধুতা ছিল। এক্ষণে তিনি স্বর্গে এবং তাঁহার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে অনেকে তাঁহার গতি লাভ করিয়াছেন। গত দিল্লী দরবারের সময় তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার উপর যে সব Star ও Ribbon প্রভৃতি সম্মান বর্ধিত হইয়াছিল, তাহাও দেখিয়াছিলাম। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাকে বহুল সম্মানে সম্মানিত এবং বহু ভাষায় তাঁহার গুণাবলীর মহিমা এমন কি Viceroy এর মুখে প্রচারিত। অবস্থা দেখিয়া লেখকের যেন চক্ষু কর্ণের বিবাদ ঘুচিয়া গেল। দিল্লীর দরবারের দিন রাত্রে সম্রাট রাজভোজ দিয়াছিলেন। তাহাতে অনেক হিন্দু রাজা মহারাজা যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইত, যদি এই প্রাচীন হিন্দুরাজা পথে না দাঁড়াইতেন। এ বিষয়ে কোন কোন ঘটনা লেখকের মনে আছে, তাহা এখানে প্রকাশ করা দরকার দেখি না। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, প্রাচীন ত্রিপুরা রাজ্যের উপর তাঁহার শ্রদ্ধা বিদ্যমান আছে। তিনি মহারাজকে স্বেচ্ছায় দরবার বসার পূর্ব্বে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক প্রাঙ্গণে লইয়া গেলেন এবং দীর্ঘকাল আলাপ করেন। সেদিন Government ত্রিপুরার নরপতিকে ''পুরুষানুক্রমে'' মহারাজা উপাধি দিয়া তিন পুরুষের কেলেঙ্কারি দূর করিয়া দিলেন। Lord Ronaldshay উদারনীতিতে এ কার্য্য করিয়াছিলেন এ কথা আমাদের বলিতে ইচ্ছা করে। ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দে বীরচন্দ্রকে ব্যক্তিগতভাবে মহারাজা উপাধি দিয়া তদানীন্তন Government হয়ত মনে করিয়াছিলেন Obstinate বালককে (?) এই উপায়েই শান্ত রাখিতে হইবে। কিন্তু বর্ত্তমানে উদারনীতি গভর্ণমেন্ট সর্ব্ব বিষয়ে খোলাসাবাদী। তিনি কেন প্রেমে বাদ সাধিবেন! সব আপদ ক্রমে ক্রমে ভারতীয় নৃপতির দরবার হইতে দূর হইতেছে এবং হইবে। এই জন্যই Nation and the Athenaeum পত্রে লিখিত হইয়াছে, "The pride is not always personal. Though a model Ruler may feel that he represents his State and family and must uphold their honour and they must insist upon it.''

পুরাতন প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া আধুনিক প্রসঙ্গের কথা বলিতে ইচ্ছা করে। বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় নৃপতিবৃন্দের অবস্থা ও তাহাদের শিক্ষা দীক্ষা সময়োপযোগী কিনা? Chambers of Princes (Narendra Mandal) নব প্রবর্ত্তিত রাজমণ্ডল

বটে, কিন্তু সাবধানতার সহিত দেখিতে হইবে, এ সময় নরেন্দ্র মণ্ডলের দ্বারায় আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইবে কিনা? পক্ষান্তরে ভারতের নৃপতি মণ্ডলের মধ্যে ভারতবর্ষকে ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেওয়া সুপরামর্শাধীন হইতে পারিবে কিনা তদ্বিষয়ে বিশেষ আলোচনা আবশ্যক।

যে বৎসর মহীশূর রাজ্যের নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য যাই, সে বৎসর জনৈক বন্ধুর উপদেশ মত মান্দ্রাজ পথে যাইতে হইয়াছিল এবং ফিরিবার সময় মান্দ্রাজ হইয়া বোম্বাই পথে রাজপুতনার কতিপয় স্থান দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করি। বন্ধুবরের উপদেশ মত একজন দাক্ষিণাত্যের ছাত্রকে সঙ্গে লইতে হইয়াছিল পথপ্রদর্শকরূপে। এই ছাত্রটি মহীশূর রাজ্যবাসী। কাজেই আমার বেশ সুবিধা হইয়াছিল। রেল পথে বিশ্রম্ভালাপের মধ্যে বুঝিতে পারিলাম, তিনি একজন আধুনিককালের Extremist (চরমপন্থী) দলের লোক। তখন ছিল India for Indians (ভারতবর্ষ ভারতবাসীর জন্য) ভারতবর্ষের চরমপন্থী দলের বুলি। আর এই ছাত্র বন্ধুটি কেবলই বলিত Mysore for Mysorean (মহীশূর রাজ্য মহীশূরবাসীর জন্য), বাচ্চা টিয়া পাখীর মত কেবলই ঐ বুলি কপচাইত এবং মহীশূরের তদানীন্তন দেওয়ান সার শেসাদ্রিআয়ার K.C.S.I স্বনামধন্য পুরুষের শ্রাদ্ধ—মন্ত্র আওড়াইত। মান্দ্রাজে পৌঁছিয়া ঐ ছাত্র বন্ধুর অনুরোধে একটি প্রসিদ্ধ মান্দ্রাজী সার্কাসে যাই। তথায় দেখিলাম সেই ঘোড়ার খেলা। তবে এখানে এই তফাৎ ছিল যে, সর্ব্বোপরি একজন অভিনেত্রীর কাঁধে একটি বালক ডিগবাজী খেলিতেছে। তখন আমার মনে পড়িল Maxmuller কৃত "Auld Lang Syne" বহির কথা এবং তাহার মর্ম্মান্তিক সমালোচনার বিষয়। বেশ বাজি করিতেছিল, আমি চিত্রার্পিতের ন্যায় দেখিতে ছিলাম এবং আমার এই ছাত্র বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ' এই যে ঘোড়ার বাজি দেখিয়া represent করে কি তুমি বলিতে পার?' ছাত্র বন্ধুটি অবাক হইয়া আমার মুখের দিকে তাকাইতে ছিল। খানিকক্ষণ পরে উত্তর দিল, " আমি আপনার কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না।" তখন আমি তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম 'এই ঘোড়াগুলি বর্ত্তমান ভারতবর্ষ এবং এই প্রধান অভিনেতা হচ্ছে ব্রিটীশ গভর্ণমেন্ট। সর্ব্ব উচ্চ শিরে যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেটি আছে, মেয়ে লোকের কাঁধে চড়িয়া, সে হচ্ছে দেশীয় রাজ্য। আর মাঝে মাঝে ঐ ছেলেটা ডিগবাজি খেলিতেছে, তাহা হচ্ছে বর্ত্তমান উন্নত দেশীয় রাজ্যগুলি।' বেচারি আমার কথা কিছুই বুঝিল না। বাড়ি ফিরিবার সময় চন্দ্রালোকে মান্দ্রাজের Harbour (পোতাশ্রয়) দেখিতে গেলাম। গরম ছিল অত্যন্ত। কিন্তু সামুদ্রিক হাওয়ায় শরীর শীতল হইতেছিল এবং আমাদের আলাপ প্রলাপ চলিতেছিল অনেক ঘন্টা পর্য্যন্ত। তখন তাহাকে বলিয়াছিলাম " মনে কর দেখি যদি হঠাৎ এই ঘোড়ার খেলা বিপদগ্রস্ত হইয়া পরে তখন এই খেলার মধ্যে ঐ বালকটির জীবন সংশয় হইবে নিশ্চয়।" তখন আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম তুমি একজন মহীশূরবাসী, Representative assembly পাইয়াছ। Sir Sheshadriayer এর পদপ্রান্তে বসিয়া দেশীয় রাজ্যের রাজনৈতিক আলোচনা কর কয়েক পুরুষ পর্য্যন্ত। ফলে হয় ত সময়ে তোমরা Parliament এর মত ক্ষমতা পাইতে পার। কিন্তু Mysore for Mysorean এই উক্তিটি বর্ত্তমানে পরিত্যাগ কর।" ইহা ২২ বৎসর পূর্ব্বের কথা। সৌভাগ্যবশতঃ লেখক ত্রিপুররাজ্যের সহিত মহীশূর রাজ্যের কোন ঘটনায় পড়িয়া Sir Sheshadriayer এর সুনজরে পড়িয়াছিল। আমি তাঁহার ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। এ সূত্রেই আমি তথাকার রাজ—উদ্বাহে নিমন্ত্রিত এবং ত্রিপুরা রাজপ্রতিনিধি হইয়াছিলাম। কাজেই এই যাত্রায় 'রথ দেখা কলা বেচা' উভয় কার্য্য আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। আমার পক্ষে ইহা তীর্থ যাত্রার মত হইয়াছিল। ক্ষুদ্র বৃহৎ কয়েকটি রাজ্যে গতিবিধি করিতে পারিয়াছিলাম। সৌভাগ্যের বিষয়, এখন পর্য্যন্ত ঐ বন্ধু মহল আমার ভাগ্যে খোলা আছে। এখনও তাঁহাদের সহিত পত্রাদি দ্বারায় সূত্র রাখিতে সক্ষম হইতেছি। বিগত দুই দিল্লীর দরবারে ইঁহাদের দর্শন স্পর্শন সুখ পাইয়াছিলাম। কাজেই অল্প বিস্তর তাঁহাদেরই কথা বার্ত্তা লইয়া এই প্রবন্ধের ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিয়াছি। ভুল ভ্রান্তি অনেক থাকিতে পারে। কিন্তু ভারতের দেশীয় রাজ্যের উন্নতিকল্পে আমার ভক্তি শ্রদ্ধাময় চিন্তা দিন দিন বাড়িতেছে বই কমিতেছে না।

এক্ষণে প্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা করিতে চাই। যদি বিধাতা তেমন ঘটায়, তখন এসব দেশীয় রাজ্যগুলি কি সমস্ত ভারত শাসন করিতে সক্ষম হইবে? এবং বর্ত্তমান সময়ে দেশীয় রাজ্যগুলির নরপতিগণ সেজন্য প্রস্তুত আছেন কি? আমার কিন্তু সন্দেহ হইতেছে যে, দেশীয় রাজ্যের শাসনকর্ত্তাগণ এখনও মন্টেগু ও চেম্‌সফার্ড প্রদত্ত রিফর্ম গভর্ণমেন্টকে আকাশকুসুমই

ভাবিতেছেন। ইহা অবশ্য সত্য যে Advanced এবং Model রাজ্যের রাজাগণকে ছাড়িয়া দিলে বহুসংখ্যক রাজ্যের রাজাগণ এখনও নিজ নিজ গণ্ডী ছাড়িয়া দিতে অনিচ্ছুক। ইঁহারা ইংলণ্ডের রাজার ভক্ত এবং তাঁহার উপর কায়মনোবাক্যে নির্ভর করিতেছে। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে আজও দেখা যাইতেছে, কোন রাজ্যে জনৈক ইংরেজ প্রধান কর্ম্মচারী পরিদর্শনার্থ যাইবার সময় অতিবৃষ্টির দরুণ রাস্তার নিকটবর্ত্তী লোকালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া সে ঘরটাকে পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ''এমনই গোঁড়া হিন্দু'' একথা জনৈক ইংরেজ কর্ম্মচারীর পুস্তকে উল্লেখ আছে। সৌরাষ্ট্রীয় ও কাথিওয়ার অনেক রাজ্যে এখনও বিলাতী মদ পর্যন্ত পান করে না। গৃহে চুয়ান মৌয়ার প্রস্তুত মদ তাহাদের পানীয়। এ আচরণ দেখিয়া আমি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে জনৈক বন্ধু রাজা উদরে হাত দিয়া বলিয়াছিলেন ''শির হইতে হৃদপিণ্ড পর্য্যন্ত ইংরেজকে দিয়াছি। কিন্তু উদরটাকে কিছুতেই দিতে পারি না।' কোন দেশীয় রাজ্যের Residency তে রাজপুত সিপাহী পাহাড়ার কার্য্য করিতেছিল। এই ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছিল '' ৮্ টাকা পাইয়া আমি সিপাহীর কার্য্য করিয়া বক্ষঃস্থলে ইংরেজের বিরুদ্ধ গুলী খাইয়া মরিতে পারি, কিন্তু ইংরেজের স্পর্শিত জল স্পর্শ করিতে কখনও রাজি হইতে পারি না।'' প্রবন্ধ বাড়িয়া যায়, এজন্য এসব অবান্তর কথা বলিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলি সকলই ভাবপ্রবণ দেশ। Sentiments ত্যাগ করিতে পারে না এবং চায় না। ইহাও তাহারা জানেন এবং মানেন যে Sentiment rules the world যদি তাহা না হইত তাহা হইলে পবিত্র চিতোর নগরী অদ্য পর্য্যন্ত সমস্ত জাতি মাত্রেরই চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিত কি? এহেন Sentiment বজায় থাকিতে নব্য তন্ত্রের সব বিষয়ই তাঁহারা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক, বরং তাঁহারা গোড়া আঁকড়াইয়া আছেন। নব্য Chambers of the Princes কে লইয়া যত নাড়াচাড়া হইতেছে এবং রকম বেরকমের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ভাব দেখান হইতেছে, তত্রাচ অনেক ভারত নৃপতি সে কুলে কিছুতেই যাইতে চায় না। তাহার কারণ Sir Valentime Chirol বিলাতের 'Time' পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন বিশদভাবে এবং পরিষ্কাররূপে, তিনি বলিতেছেন ঃ—

" Disguise it as one may the creation of a council of princes is a hazardous attempt to harness the most conservative forces in India to the new State chariot side by side with the democratic forces embodied in an elected Indian Legislative Assembly.'' কারণও যথেষ্ট দিয়াছেন।

" Some still very conservative and almost medoeval, some on genuinely progressive lines, some with a mere veneer of European modernity, are all equilly jealous of their rights and their dignity. The Native States cannot, however, live wholly in a water-tight compartments. They are all more or less directly affected by what goes on in British India just across their often very artificial boundaries. Their material interests are too closely bound up with those of their British Indian neighbours.''

যেসব বাধা অগ্রবর্ত্তী রহিয়াছে সে বিষয় Chirol সাহেব নির্দ্দেশ করিতেছেন।

" But the creation at this juncture of a Council of Princess as an organic part of the new scheme of Constitutional Government raises very different issues.In the first place, though it has been engineered with great skill and energy by a small group of very distinguished Princes, mostly Rajput, it has received no support at all from other and more powerful Princes, such as the Nizam of Hyderabad, the Gaekwar of Boroda, and the Maharaja of Mysore.। ''

গতবার দিল্লীতে Duke of Conought এই chambers of Prince এর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সে সময় হঠাৎ কলিকাতা বাসায় বসিয়া Telephone পাইলাম, আমার জনৈক বন্ধু ব্যক্তি His Highness কলিকাতায় উপস্থিত। Club হইতে খোঁজ লইয়া আমার বাসার ঠিকানা পাইয়াছেন। তাই তিনি আনন্দ এবং উৎকণ্ঠিতভাবে আমাকে দেখিতে প্রতীক্ষা

করিতেছেন। তের বৎসর পর দেখা। গাঢ় আলিঙ্গনের সহিত আমাকে নিজের কাছে টানিয়া লইলেন এবং জানিতে দিলেন, দিল্লীতে আজ Duke of conought দরবারে বসিবেন। তিনি কম দরের লোক, এত অধিক দরের লোক উপস্থিত থাকিতে তাঁহার অনুপস্থিতিতে দরবারের কোন ক্ষতি হইবে না পরন্তু—

'পয়সা দেকে জুতি খানা—
এ্যাসা দরবার মে নেই জানা।'

তাই তিনি ডাক্তারের উপদেশ মত কলিকাতা চলিয়া আসিয়াছেন এবং বড় বাজারের সন্নিকটে বাসা লইয়াছেন। আশা করেন, এ যাত্রা মুক্তার ব্যবসা করিয়া কিছু লাভ করিতে পারেন। বলা বাহুল্য, রাজাটিকে লোকে বলে ভয়ানক কঞ্জুস। যেন কাঠের রুটি—মাছি পর্যন্ত বসে না। কিন্তু রাজাটি জানেন জহরতের ব্যবসা পাকা রকমে। বাৎসরিক আয় ৬/৭ লক্ষ টাকা; কিন্তু মূল্যবান পাথর ক্রয় বিক্রয় করার দরুণ যে লাভ পান Bank বলে তাহার সংখ্যা প্রায়—১০,০০,০০০ টাকা। কলিকাতা জহুরী বিশেষের যোগে এ বৎসরের দরবার উপলক্ষে তিনি প্রায় ৩/৪ লক্ষ টাকা পাইবার আশা পাকা রকমে করেন। কোন এক ধনী মহারাজা নিঁখুত মুক্তার মালার জন্য প্রায় আহার নিদ্রা বর্জ্জিত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার নিকট সেইরূপ জিনিষ ছিল, তাই তিনি কলকাতার জহুরীকে মধ্যস্থ করিয়া বেশ এক হাত মারিতে চান। উদ্দেশ্য, এবারের লাভে তাহার রাজ্যে একটি খাল কাটাইতে হইবে—প্রজার হিতার্থে ও রাজ্যের অর্থাগমের ইচ্ছায়। পিতৃপুরুষের কতকগুলি কীর্ত্তি রক্ষণীয় মন্দিরের জীর্ণসংস্কার আশু কর্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। তাই তিনি কলিকাতা চলিয়া আসিয়াছেন। বন্ধু মহারাজা পাইতে চান একজন চক্ষু চিকিৎসক, যিনি রোগটাকে একটু বাড়াবাড়ি করিয়া Certify করেন। আমি ঐরূপ ডাক্তারের খোঁজ জানি কিনা? বন্ধু রাজাটি যদিও কৃপণ বটে, কিন্তু এইরূপ সময় অর্থ ব্যয় করিতে কৃপণতা দোষ বর্জন করিতে পারেন। বলা বাহুল্য, তিনি সেরূপ ডাক্তার পাইয়াছিলেন এবং অনেক টাকা দিয়া Certificate লইয়াছিলেন, আমার যোগে নহে—জুহুরীর গোমস্তার যোগে।

এই অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিবার উদ্দেশ্য—লেখক তাঁহার রাজ্যে গিয়াছিল এবং তাঁহার ক্রিয়াকলাপ এবং হালচাল প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিল। রাজাটি বোম্বের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত রাজা। তিনি রাজ্যশাসন করেন মছ্‌লন্দে বসিয়া, আলবোলায় তামাকু সেবন করিতে করিতে। অপরাহ্ন কালে কিঞ্চিৎ অহিফেন সেবন করিতেন দেশাচার মতে। ইনি তাঁহার রাজ্যের মা বাপ এবং প্রজা সকলের বন্ধু বান্ধব। দরবারে বসিয়া ইনি প্রত্যহ একদিকে নৃত্য গীত দেখিতেন, অপর দিকে খাস মুন্সীকে লইয়া নথী প্রস্তুত করিতেন। জনৈক বৃদ্ধ রসিক Court Jester বা মোসাহেবরে সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করিতেন। সম্মুখে বসিয়া যে দুই ব্যক্তি চাল অর্থাৎ দাবাখেলা খেলিতেছিল, তাহাদের চালের মাত্রা বেশ Watch করিতেন এবং বুঝাইয়া দিতেন। হঠাৎ যদি শুনেন প্রজাগণ মধ্যে কেহ উৎকট রোগে ভুগিতেছে, অথবা Accident এ পড়িয়াছে, তৎক্ষণাৎ দরবার কিয়ৎকালের জন্য বরখাস্ত করিয়া সেই রোগীর নিকট যাইয়া আতুরের সেবা করিতেন। কাহারও মৃত্যু হইলে শবানুগমন করিতেন, কাজেই তিনি যে প্রজা বৎসল এ বিষয় বলা বাহুল্য। বোম্বে হইতে আমি তাঁহার সঙ্গে তাঁহার রাজ্যে যাই। ২/৩ দিনের জন্য গিয়াছিলাম, কিন্তু আমাকে অনেক দিনের জন্য থাকিতে বাধ্য করা হইল এবং আমিও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আনন্দে একজন Model হিন্দু রাজা ও রাজ্য দেখিতে ও শুনিতে সুবিধা পাইয়াছিলাম। বলা বাহুল্য, ইনি অদ্য পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছেন। ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ হইলেও সুখে ও ভোগে তিনি অদ্যাপি যুবকের ন্যায়। সব কার্য্যে তৎপর আছেন এবং Motor car পরিবর্ত্তে ঘোড়ার পিঠ পছন্দ করেন। হাওয়া গাড়ী দেখিলে সহাস্যে বলিয়া থাকেন 'ইয়ে রাজাকা সোয়ারি লায়েক নেহি হ্যায়'। রাজকোষের তিনিই তহবিলদার। রাজপ্রাসাদের একটি অন্ধকার কামরা ছিল; Treasury- র Iron chest —এর চাবি থাকিত মহারাজার হাত বাক্‌সে। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার নিজ পরিবেক্ষণায় সব ব্যয় চলিত। দুই একজন রাজ সম্পর্কান্বিত কুমার শ্রেণীর লোক ছিল Treasury বিভাগের কর্ম্মচারী। তাঁহাদের প্রমুখাৎ শুনিয়াছিলাম মহারাজা পারতপক্ষে Post Card ব্যতীত দু'পয়সার Stamp Correspondence এ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। আধুনিক উপায়ে ও ব্যয়সাধ্য ছাপা ডাক কাগজ ও লোফাফা ইনি ব্যবহার করিতেন না। কেবলমাত্র গভর্ণমেন্টের সহিত Correspondence এ যাহা ব্যবহার করিতেন, তাহা অতি মাত্রায় হিসাবের

সহিত। আমার নিকট তাঁহার কতকগুলি পত্র আছে, তাহা দেখিলে আধুনিক আমলাতন্ত্র-রাজ্যের কেরাণীকুল নিশ্চয় হাসিয়া ব্যাকুল হইবে।

কিন্তু তিনি তাই বলিয়া কৃপণ ছিলেন না। যদিও দান দাতব্য সম্বন্ধে মুক্তহস্ত ছিলেন না, তথাপি প্রার্থীর আশাপূর্ণ করিতে কার্পণ্য করিতেন না। তবুও ঐ রাজ্যের Assistant Political Agent এর মুখে শুনিয়াছি 'He is hopelessly miser' এজন্য তাঁহার সহিত আমার অনেক মতান্তর ঘটে," তাহা বর্ণনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার মধ্যে আমি একজন হৃদয়বান রাজার প্রতিকৃতি যাহা পাইয়াছি তাহা চিরস্মরণীয়। এই মহাযুদ্ধে তাঁহার যুবরাজকে পাঠাইবার কালে তিনি আমাকে জানাইয়াছিলেন, 'ক্ষাত্রধর্ম্ম পালন করা আমাদের কর্ত্তব্য। পুত্র অর্থে পিতার যে অভিলাষ পূর্ণ করে, কাজেই আমার পুত্র এ বৃদ্ধ পিতার আশাপূর্ণ করিয়াছে ও পিতৃ আশীর্ব্বাদ পাইয়াছে ইহাই তাহার তখ্‌মা তাবিজ।"

অপর পক্ষে এবার Prince of Wales আসা উপলক্ষে একজন প্রসিদ্ধ এবং ধনাঢ্য দেশীয় নৃপতিকে দেখিতে সুবিধা পাইয়াছিলাম, কলিকাতায় বসিয়া। ইনি বিলাতি মজ্‌লিশে বিলাতিয়ানা ভাবে চলিতে সদা প্রস্তুত। Ballএ নাচিতে পারেন বলিয়া শুনিয়াছি এবং ইংরেজ মহিলা মজ্‌লিশে ইহার অবারিত দ্বার। ঘোড়দৌড়ে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। তাঁহার A.D.C র মুখে Club এ বসিয়া সেই নরপতি সম্বন্ধে অনেক গল্প গুজব শুনিয়াছি। তন্মধ্যে একটী কথা শুনিয়া আমার A.D.C সহ মতান্তর ঘটিবার কারণ হইয়াছিল। মহারাজা বাস করেন ইংরেজী হোটেলে এবং তাঁহার বহুপত্নী বাস করেন কলিকাতার উপকণ্ঠে একটী সুবিস্তীর্ণ ভারাটীয়া বাড়ীতে। বাড়ীটি সর্ব্বদা হোগলা বেড়ার ঘেরাটোপের ভিতর থাকিত এবং সদর দরজায় বাক্‌সওলার বাজার বসিত। রাণীরা সংখ্যায় কতজন A.D.C মহাশয় তাহা বলিতে পারেন না। কারণ অন্দর মহলের খবর রাখা A.D.C র কর্ত্তব্য এবং করণীয় নহে। তখন আমি বলিয়াছিলাম 'লক্ষ্ণৌ এর রাজকীয় কবরখানায় নবাবগণের অনেক বেগমের কঙ্কাল সমাহিত আছে। কিন্তু কেহ যদি কবরখানা দেখিতে যায়, তখন প্রহরিগণ জলদগম্ভীর স্বরে দর্শককে সাবধান করিয়া দেয়, 'উধার মৎ যানা, হুঁয়া বেগম—মহাল হ্যায়।' কথাটা A.D.C মহাশয়ের শ্রুতিরোচক হয় নাই বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু আমারও রুচিকর হয় নাই। অবিরাম গতিতে ইংরেজ মহিলাগণ এরূপ বহুপত্নিক রাজার সহিত করমর্দন এবং Ball এ নাচিয়া থাকেন কিরূপ চিত্তে? অবশ্য প্রচুর অর্থে হয় ত তাহা ঢাকিয়া যায়। কারণ 'অর্থেন সর্ব্বনাশা।'

এ দু'টি রাজার ছায়াচিত্র পাশাপাশি করিয়া ধরিলে মনে হয়, বর্ত্তমান সময়ে ভারত নৃপতিকুল সেই সার্কাসের ঘোড়ার খেলার বালকের মতই রহিয়া গিয়াছেন। উহাদের নাকি ষাইট বৎসরেও নাবালকত্ব দূর হয় না। এই জন্যই Chirol সাহেব বলিয়াছেন—

" Some are still very conservative almost medoeval and some are with veneer of European modesty. But they are still equally jealous of their right and dignity."

প্রত্যেক নরপতির হাতে বিভিন্ন রঙ্গের সন্ধিপত্র রূপে তাস খন্ডগুলি যা আছে, তাহা মিলাইয়া 'বিন্তি খেলা' খেলাইতে অথবা ঐসব সন্ধির স্বর্ত্তগুলির মাহাত্ম্য ত্যাগ করিয়া ইউরোপীয়ভাবে 'Auction Bridge' খেলায় জুয়ার মাত্রা বাড়াইয়া দিতে তাহারা রাজি হইবেন না। কারণ পঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহের বাণী দৈববাণী বলিয়া মানিয়া থাকেন। British Government is a safe friend but a dangerous enemy ইহা বিশেষভাবে বুঝিয়াও দেশীয় রাজন্যবর্গ Water tight বাক্‌সবন্দী হইতে এখনও চান না। কারণ অভ্যাসের বিপরীতভাবে চালিত হইতে একেবারেই নারাজ।

দেশীয় রাজন্যবর্গ কেন বর্তমান রাজনীতি অনুসারে নির্ম্মিত Water-tight compartment এ থাকিতে চান না? ইঁহার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। কতকটা তাঁহাদের দোষে—আর কতকটা ভারতগভর্ণমেন্টরূপী চিকিৎসকের হিন্দু রোগীকে মুরগীর জুস খাওয়াইয়া শীঘ্র শীঘ্র আরামের বৃথা প্রয়াসে; অথবা অসময়ে চারাগুলিকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য সাহেবী মালীর অতিব্যগ্রতায়ই ইহার কুফল। এ সব Seedlings (চারাগাছগুলিকে) Transplantation (স্থানান্তরিত) করিবার পূর্ব্বে যতদূর সাবধানতার দরকার এবং কালসাপেক্ষ New Scheme এ (নূতন সংস্কারে) তেমন সাবধানতা অবলম্বন করা হইতেছে না

বলিয়া তাহা নষ্ট হইবার আশঙ্কা এখনও তাহাদের অন্তরাকাশ হইতে দূর হয় নাই। বিশেষতঃ ইহাদের অবস্থা তদ্রূপ নহে যে, কেবলই রাজ্যময় Experimental farm (পরীক্ষাগার) করিয়া এই বিদেশীর ও দুষ্প্রাপ্য চারাগাছগুলির জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরিত করিবার দায়ীত্ব লইবে, এবং তাহা বিশেষজ্ঞ মালীর কোনরূপে কর্ত্তব্যও নহে।

অনেক বিদেশীয় প্রবল জাতি ভারতে আসিয়া অধিকার স্থাপন করিলেন এবং কালক্রমে চলিয়া গেলেন। একের কহিনুর অন্যের ভাণ্ডারে গেল। হস্তান্তরের সহিত হৃদয় তন্ত্রীর স্বকীয় ভাব ছিন্ন হইতে লাগিল; তাহাদের চিহ্নগুলির মধ্যে দেশীয়রাজন্যবর্গের ধর্ম্মের ও মর্ম্মের কোনরূপ চিহ্ন রহিল না। রহিল কেবল কতকগুলি মর্ম্মর নির্ম্মিত হর্ম্ম্যাবলী ও শোক গাথায় জগৎ বিখ্যাত শিল্পকলার নমুনা,—সুন্দরী সমাধি আগার। কত মতে কেবলই মুশাবিদা হইল, সে সব এখন ইতিহাসের পৃষ্ঠা ব্যতীত মর্ম্মবাণীতে পাওয়া যায় না। তাহাতে হইল কি? যার যার জাত্যাভিমান, গর্ব্বিত পোষাক পরিচ্ছদ, আদ্দব কায়দা, লুপ্তপ্রায়; ধর্ম্মাধিকরণের নামে অধর্ম্মের প্রশ্রয়। ইহাই কি ভারত নৃপতিবৃন্দের মোক্ষ লাভের উপায় এবং ইহার উপর নির্ভর করা কি নিরাপদ? দ্রোপদীর লক্ষ্যভেদ পণের অর্থ করিতে গেলে বলিতে হয়,—ভারতবর্ষ যেন দ্রোপদী সুন্দরী। আর তিনি যেন পণ করিয়া স্বয়ম্বরা হইতে চান। মাঝে মাঝে কর্ণরূপী শ্রীসম্পন্ন বীরপুরষ উপস্থিত হন; তখন যেন বেচারি দ্রোপদীকে বলিতে হইতেছে (মর্ম্মের ভাব চাপা রাখিয়া) ''আমি সূত পুত্রকে বরণ করিব না।'' সুন্দরীর স্বয়ম্বর সভায় এখনও দুর্জ্জয় অর্জ্জুন আসিয়া উপস্থিত হন নাই। ভারত নৃপতিকুলের অবস্থা তদ্রূপ।

সেদিন লয়েড জর্জ্জ ব্রিটীশ ভারতে Reform (সংস্কার) সম্বন্ধে সন্দেহ মনে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন House of Commons এর নিকট। তাঁহার ভাব কুড়াইয়া নিলে পর যাহা বুঝা যায় তাহার মর্ম্ম এই;—''বর্ত্তমান নব্যনীতি পরীক্ষা স্থলে লইতে হইয়াছে, Hastily কেন, Rashly, কিন্তু ইহাকে যখন পরীক্ষাগারে উপস্থিত করা হইয়াছে তখন পরীক্ষাদানের ব্যবস্থা করাই সঙ্গত হইবে। এই উপলক্ষ্যে তিনি স্পষ্ট বাক্যে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—''

" The Native States are not governed on these principles now, and it remains to be seen whether a system of this kind, adopted to Western needs perfected by centuries of experiment, and marked at many stages, in fact at every stage with repeated failures a system which the west has perfected for its own conditions and its own temperament, is suitable for India.''

যাহাতে প্রজাবর্গ শাসনের চাপে কাতর হয়, দেশীয় রাজন্যবর্গ কোন দিনই পরীক্ষার্থে এমনতর উপায় করেন নাই এবং করিবেন না। Sir Gay Fleetwood Wilson বরাবরই মনে করিয়া আসিতেছেন ''দেশীয় রাজন্যবর্গের প্রজাগণ ব্রিটীশ প্রজা হইতে সুশাসন পাইয়া থাকে এবং তাহারা সুখী। হাতে এহেন একটি পাখী থাকিতে অরণ্যের শত শত পাখীর জন্য তাঁহারা লোভ করেন নাই এবং করিবেন না। তাঁহারা মনে মনে ভাবেন—

''তোমায় কত ফাঁকি দেবে,
তুমিও কতক দেবে ফাঁকি,
তোমার ভোগে কতক পড়বে,
পরের ভোগে থাকবে বাকি।
মান্ধাতারি আমল থেকে
চলে আস্‌চে এম্‌নি রকম
তোমারি কি এমন ভাগ্য
বাঁচিয়া যাবে সকল জখম।''

ফাঁকি দিতে কেহই এ বেচারি রাজাদিগকে কসুর করে নাই। মান্ধাতার আমল হইতে যাহা চলিয়াছে এবং যত ভুগিয়াছে

অদৃষ্টবাদীর মত তাহাই তাঁহারা মানিয়া সহিয়া লইয়াছেন ও লইতে প্রস্তুত।

যে কারণেই হউক, আর যে ঝগড়ার ফলেই হউক Montagu মহাশয় রঙ্গমঞ্চ হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছেন। ইহার ফল কু কিম্বা সু হইবে কেহ বলিতে না পারুক, কিন্তু প্রধান রাজতন্ত্রধারী বলিতেছেন —" Difficulties have arisen and weakness been exposed in the working of the new system; but this was inevitable. we must not jump to the conclusion that because there have been difficulties drawbacks and failures that the experiment has been a complete failure in itself." ইহার উপর "ভীষ্মদেব খোস—নবিশের" কোন টীকা টিপ্পনী করিবার দরকার আছে কি? ইংরেজ জাতি নাছোড়বান্দা। ইহাদের রাজ্যে তপনদেব কখনও অস্তগমন করেন না। তাঁহাদের দখলীয় দেশবিদেশে বর্ষা প্রতি ঋতুতে ভাগাভাগি করিয়া পাইয়া থাকে। কাজেই for experimental sake ইহারা দশ পাঁচ বা ততোধিক বর্ষ অপেক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু ভারত নৃপতিবৃন্দ ভারতের এক বর্ষাকে মানিয়া আসিয়াছেন ও আসিতেছেন যেমন তাহাদের পিতৃ পিতামহগণ করিয়াছিলেন। অতিবর্ষা অথবা বর্ষাহীনতার দুঃখকষ্ট অদৃষ্টসাপেক্ষ বলিয়া সুখে এবং ভোগে থাকিবে।

অপ্রাসঙ্গিকক্রমে বলিতেছি, একবার আমরা কয়েকজনে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ও রাজপুতনায় পরিভ্রমণার্থ গিয়াছিলাম। পথে বৃন্দাবন ধামে উপস্থিত হই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্ত্তমান "বানদ্রবনে" বনে বনে বা কুঞ্জে কুঞ্জে বানরপুঞ্জের অত্যাচার অত্যধিক দেখিয়া এই মণ্ডল ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছিলাম। একজন দেশীয় রাজ্যবাসী বন্ধু একটি বেশ উপায় উদ্ভাবন করিলেন; একটি গুড়ের মটকা খরিদ করিলেন; তাহার ওজন প্রায় দুই মন। ইহা আনিয়া ভাঙ্গিলেন সাধারণ রাস্তার ঠিক মাঝে। বানরগণের একটা ধর্ম্ম এই যে, ইহারা Jurisdiction মানিয়া চলে। Public Road কাহারও সম্পত্তি নহে;বৃন্দাবনের বানরবাহিনী ইহা বেশ জানে। তাই এই গুড়ের চাকা লইয়া বানরবর্গের মধ্যে তুমুল ঝগড়া আরম্ভ হইল। গুড় খণ্ড উঠাইয়া লইয়া যাইতে পারে না, অথচ দন্তে কাটা ব্যতীত আস্বাদন করার উপায় নাই। বানরবাহিনী মধ্যে রক্তারক্তি হইয়া গেল। বন্ধুবর বেশ তামাসা দেখিতেছিলেন। আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "এ Reformed scheme এবং শেষ ফল রূপ সুবর্ণ—গোলক পাওয়ার দৃষ্টান্ত।" আমার বোধ হয় Montagu Chelmsford ভারতবাসীর মধ্যে একটা বিবাদের স্বর্ণগোলক ফেলিয়া দিয়াছেন; তাই এক্ষণে প্রধানমন্ত্রী গালে হাত দিয়া বসিয়াছে এবং গোলকটিকে Complete failure ক্ষণভঙ্গুর ধাতু বলিয়া মনে করিতেছেন, বর্ত্তমান ভারতের অবস্থা Moderate and extremist দলের সৃষ্টি বজায় থাকিতে আমার ধারণা এই দুই দলই সময়ে হয়রাণ হইয়া পড়িবেন। Moderateগণের নাঁকিসুরের কথা এবং extremistগণের বীর রসের কথা শুনিয়া বোধ হয় ইহাদের মধ্যে কোন রসই থাকিবে না। কিন্তু আমাদের রাজাগণ কখনও বেসুরা যন্ত্র বাজায় নাই এবং বাজাইবে না। বেহালার কান মলিয়া সুর ঠিক করিবেন এবং তবলার উপর ঘা দিয়া সুপথে আনিবেন যেমন তাঁহাদের পিতৃপিতামহগণ করিয়া গিয়াছেন।

ইহারা কখনও ব্রিটিশ অধিকার নষ্ট করিতে দিবে না এবং তাঁহাদেরও হস্তস্থিত সন্ধিপত্রগুলি ত্যাগ করিবে না। যাহা এক্ষণে ব্রিটিশ Nation কেবলই মুশাবিদা করিয়া যাইতেছেন এবং পরক্ষণে Complete failure বলিয়া আপশোস করিতেছেন। ভারতীয় নৃপতিবৃন্দ সে রাজনীতিতে চলিয়া "নব রাজনীতি" পাইতে চাহিবেন না। বরং তাঁহারা প্রতি পদে পদে তাঁহাদের স্বরাজ রক্ষা করিবেন স্বীয় বুদ্ধি বলে চলিবেন এবং মনে রাখিবেন যে, " স্বধর্ম্মে নিধন" প্রাপ্ত হইয়াও পরধর্ম্মকে ভয়াবহ মনে করিবেন।

এ বিষয়ে ব্রিটিশ রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী British Parliament এ স্পষ্টবাক্যে বলিতেছেন—

"We have a duty not merely to vast-territories in India where we exercise supreme control, but we also owed duty to the great Princes of India and to Indian States which are Feudatories of His Majesty the King Emperor, They constitute about one third of India. We owe an un-

doubted duty to them.They have been loyal to the throne and to the Empire under conditions where loyalty was tried in every fibre and where loyalty was vital to the existence of the Empire. There has been nothing more glorious in the whole story of the Empire than the rallying of those Princes and these peoples to British Empire at a moment when we needed any strength which we could command either in our own Territories at home or throughout the vast domain of the British Empire.''

এ বাক্যের তাৎপর্য্য কি? তাহা বোধ হয় বলা অত্যুক্তি । যে কোনরূপ উপায়ে অথবা অর্থ ব্যয়ে ইংরেজ তাহাদের স্বার্থ বজায় রাখিবেনই।প্রধানমন্ত্রী মহাশয় সেইভাবেই উক্তি করিয়াছেন—

" The British Empire means at all costs to continue to discharge that sacred trust and to fulfil that high destiny.''

দেখা যাইতেছে British Nation এর মুখপাত্র প্রধানমন্ত্রী এই উদ্দেশ্য প্রধান বলিয়া মনে করেন, এবং এই ভারতীয় নৃপতিবৃন্দের অধিকারকে তিনি কিছুতেই উপেক্ষা করিবেন না। অথচ ইহাদের মধ্যে অধিক ভাগ অদ্যও Despotic এবং রক্ষণশীল নীতিতে পুরা মাত্রায় চলিতেছেন। ইহা দেখিয়া শুনিয়া ব্রিটীশ—শাসিত প্রদেশে পুরাপুরি স্বরাজ পাওয়ার সম্ভাবনা করা সুদূর পরাহত বলিয়া মনে করি। তত্রাচ Moderate ও extremist সম্প্রদায় ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কেহ কেহ নাঁকিসুরে কথা বলিতেছেন এবং বিরুদ্ধপক্ষ দর্পরসে অভিনয় করিতেছেন। কাজেই বলিতে ইচ্ছা করে আমরা দেশীয় রাজ্যবাসী, দেশীয় রাজ্য কি ভারত ছাড়া?

আমার সেই রাজ বন্ধুর মূল্যবান প্রস্তর ব্যবসা প্রসঙ্গ বলিয়াছি; একদিন দেখিতে পাইলাম তিনি অনেকগুলি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ হীরক খণ্ড লইয়া বড় ব্যস্ত আছেন; এবং জহুরীগণের সহিত বাক বিতণ্ডা জুড়িয়া দিয়াছেন। তিনি চান এ সব প্রস্তর খন্ডের ''ইতিহাস''। পাথরের ইতিহাস আছে বৈ কি? তোড়া বান্ধা থলিটী হস্তগত করিয়া খুলিয়া দেখিলাম সবগুলি 'uncut diamond' ,আমি কৌতুহলী হইয়া জানিতে চাহিলাম 'uncut diamond' হইতে 'cut diamond'এর মূল্য অধিক বলিয়া মনে করি। তখন তিনি ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন ''হীরকগুলিকে কাটিতে গেলে ওজনে কম হইয়া পড়ে। তাহা আপনি লক্ষ্য করিয়াছেন কি?''আমি তখন—অভিজ্ঞের ন্যায় গর্ব্বভরে বলিয়াছিলাম 'আমি নিশ্চয় জানি Brilliant হীরক খণ্ড ওজনে কম হইলেও মূল্য কম হয় না; তাই মহারাণী ভিক্টোরিয়া কহিনূরকে কাটিয়া ছাঁটিয়া লইয়াছিলেন এবং তাহা এখনও রাজতোষাখানায় Tower of London এ রক্ষিত আছে''।

তিনি কপোল দেশে অঙ্গুলী সঞ্চালন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন 'বন্ধু'! ওটা অদৃষ্টবলে পাওয়া গিয়াছিল; কিন্তু আমার এগুলি ক্ষুদ্র অতি ক্ষুদ্র হইলেও অর্থ বলে পাইতেছি এবং হয়ত অর্থ বলে Double interest এ আরও অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিব, যদি এগুলির ইতিহাস পাই ও ততদিন পর্য্যন্ত এগুলি uncut অবস্থায় থাকে।'' একটা ছোট পাথর লইয়া আমাকে বলিয়াছিলেন '' এই uncut diamond খানা যে বেচারা বিক্রয় করিয়াছিলেন, দৈবদোষে সিপাহী যুদ্ধের সময় রাজবিদ্রোহী বলিয়া তাঁহাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহারই স্ত্রী শোকসন্তপ্তা অথচ জমিদারী হইতে তাড়িতা হইবার সময় এই এক খণ্ড প্রস্তর লইয়া ভাগ্যবন্তের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া যে মূল্য পাইয়াছিলেন তাহাই তাঁহার জীবনোপয় হইয়াছিল। এক্ষণে ইহা অনুসন্ধান করিয়া আমি সংগ্রহ করিয়াছি।'' এ অপ্রাসঙ্গিক কথা বলার উদ্দেশ্য, এ শ্রেণীর রাজাগণের সংখ্যাই অত্যধিক। তাঁহাদের ভাব ও স্বভাবকে তাঁহারা কখনও পরিত্যাগ করিবেন না। এবং এই সব প্রস্তরকে যেমন Cut করিবে না তাঁহারাও তাঁহাদের স্বভাব চরিত্র রীতি নীতি পরিত্যাগ করিবেন কিনা সেটা সন্দেহ স্থল। Chamber of Prince প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য মহৎ হইতে পারে কিন্তু এ Grinder দ্বারা এ মূল্যবান প্রস্তররূপী রাজাগণকে Cut করিয়া লওয়ার প্রয়াস হয়ত কোনকালে কোন দিনে ইহাদিগকে পাশ্চাত্য রীতি নীতিতে Europeanised করা যাইতে পারিলেও ইঁহাদের ধমনীর রক্ত স্বদেশীও সতেজ থাকিবেই। অতএব আমার বিবেচনায় ভারতের সমস্ত রাজন্যবর্গকে সিপাহীর মত এক লাইনে ভুক্ত করা ব্যতীত তাঁহারা Well drilled হইবেন না। কাজেই ৮/১০ বৎসরের মধ্যে ইংরেজ শক্তি ব্যতীত স্বরাজ পাওয়া কখনও কেবল আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়াই সম্ভবপর হইবে না।' কারণ ইংরেজ জানে যে, তাঁহাদের অর্জ্জিত ভারত সাম্রাজ্যকে এ সময়ে ছাড়িয়া দেওয়া

কাপুরুষতার কার্য্য হইবে। তাই Mr. Lloyed George খোলসাভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনে বলিয়াছেন।

" I think it is right that we should say that if there is a change of that kind in character of the Legislature and in purpose of those who are chosen in design of responsible and chosen leaders of the Indian people that would constitute a serious situation and we should have to make clear that Britain will in no circumstances relinquish her responsibility to India. That is a cardinal principle not merely of the present Government but I feel confident that it will be the cardinal principle with any Government that could command the confidence of the people of this country. It is important that should be known not so much in this country, for there is no doubt about it here, but in india where for many reasons there seems to be doubt disseminated sometimes fortuitously, sometimes quite unintentionally, and sometimes from facts which seem for moment to justify conclusions of that kind. It is right that not merely here but in India it should be thoroughly understood that is the fundamental principle which will guide every party that ever has any hope of commanding the confidence of the people of this country. We stand by our responsibilities. We will take whatever steps are necessary to discharge or to enforce them.''

বর্ত্তমান সময় ইহাও দেখা যায় Reformed Scheme এর চাপে পড়িয়া অনেক স্বদেশী ব্যক্তি এবং কয়েকটি ভারতের নৃপতি সদ্য Reformed হইয়া যেন নিদ্রাখিতের ন্যায় ব্যস্তসমস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। '' যা রটে তা বটে''; একথা সত্য হইলে বলিতে হয় Lord Sinha প্রাদেশিক সুবাদারের (Governor) পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন অনিদ্রাজনিত রোগে বা মূলে। এখন আবার শুনা যাইতেছে বিকানীরের মহারাজা যিনি Reformed Scheme এর ধ্বজাধারী, এমন কি— আপনার রাজ্যেও তাহা প্রচলন করিয়া Plants গুলিকে Transplant করিতে বসিয়াছেন তিনি এমনি রোগগ্রস্ত হইয়াছন যে এযে কি ''ক্ষেত্রজরোগ'' বিলাতের পরীক্ষাগারে ''ন ভূত ন ভবিষ্যতি'' অবস্থায় ধরা যাইতেছে না এবং রোগ প্রতীকারের ব্যবস্থা কোনও জাতির ভেষজগণের অধিকারের মধ্যে আসিতেছে না। আমরা বলি এ রাজনৈতিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা ব্যতীত অন্য উপায় নাই। টবে পুঁতিয়া তুলসী বৃক্ষ দেশ বিদেশে নেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ঐ উপায়ে Rare and Costly plants স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে না। বরং মস্তিষ্কজনিত রোগের লক্ষণ হয়ত প্রকাশ পাইয়া যাইতে পারে, সে আশঙ্কা করাও অস্বাভাবিক নহে। যখন বিদেশী বঁধুয়াগণ ভারতীয় নৃপতিবৃন্দকে বর্ত্তমান সময় বন্ধুভাবে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিতেছেন, ইহা সুলক্ষণ বটে। ফুটবল খেলার ওস্তাদগণ Goal-Keeper কে চিনিয়া থাকেন ও চিনিতে পারেন। এ সময় নৃপতিবৃন্দের পক্ষে সমধিক সাবধানতা লওয়ার দরকার এবং বলটার প্রতি শ্যেন পক্ষীর ন্যায় দৃষ্টি রাখা তাহাদেরই কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্য কঠোর হইলে তাহা যেমন নির্ম্মমভাবে পালন করাই ধর্ম্ম হইয়া থাকে, ভারতীয় নৃপতিবৃন্দের বিশ্বাস ইহারা এই সন্ধিস্থলে কঠিন কর্ত্তব্য কঠোরভাবে করিতে সক্ষম হইবেন। ইঁহাদের এ চরিত্র ক্রমশঃ প্রকাশ পাইয়া বসিতেছে এবং বসিবে। বর্ত্তমান অবস্থায় ইঁহাদের কি করা কর্তব্য তাহা তাঁহাদের প্রজাবৃন্দের ভাবা উচিত। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস ভিন্নদেশীয় ব্রিটীশবাসী কর্ম্মচারীর পরিবর্ত্তে নিজ নিজ আত্মীয় ও প্রজাবৃন্দকে সুশিক্ষিত করিয়া কাজকর্ম্মে সহায়তা নেওয়া সঙ্গত হইবে। শাস্ত্রে বলে স্বদেশজ সৎকুলে জাত অর্থ উৎপাদক প্রভৃতি গুণে গুণবান ব্যক্তিকেই নৃপতি মন্ত্রী পদে বরণ করিবেন'। দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান যাইতে পারে; এ শ্রেণীর লোকে যেমন রাজভক্ত এবং প্রজাবৎসল হইতে পারে; তেমন গুণ অন্য দেশীয় mercinery কর্ম্মচারী দ্বারা কখনও সম্ভবে না। এজন্য Lord Chelmsford ও ভাবিয়া যাহা ঠিক করিয়াছেন, তাহা তিনি বিগত chiefs conference ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা নভেম্বর তারিখে এ Warning address এ বলিয়াছেন; উপস্থিত ভারত নৃপতিবর্গের বিদিতার্থে—

"There is no reason why your nobles and jagirdars should be in the future at they were when you first entered into possession of your State, the bulwarks of your rule if you place your

reliance upon them and educate to work with you in your task and if they on their part recognise that it is their duty to serve you with loyalty.''

ছায়া পূর্ব্বগামী। অতএবই রাজপ্রতিনিধি এরূপভাবে ও ভাষায় বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, আমরা একথা সহজেই অনুমান করিতে পারি। Viscount Peel একটু সাবধানতার সহিত বলিতেছেন যে, পুরুষানুক্রমিক (Hereditary) রাজা এবং রাজতন্ত্রধার দেশের ও দশের যেমন উপকার করিতে পারে, 'ভুঁইফোর' কর্ম্মচারী দ্বারা সেরূপ সম্ভবেনা। এ বিষয়ে উক্ত Viscount এর কথিত উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

" I remember on one occasion some years ago talking with a great Indian chief and he expressed to me the greatest respect for the late Lord Salisbury, then Prime Minister. But I found that this respect was not based so much upon his great ability or upon his foreign policy as upon the fact that having been Prime Minister himself he had been able to secure the reversion of the Prime Ministership to his nephew. And when I was able to assure him that even other members of the family formed part of the Government his admiration rose even to the verge of ecstasy. One peer...that distinguished statesman and master of foxhounds...defended the hereditary principle tooth and nail. 'It is the fashion' he remarked to say that the hereditary principle is out of date and all that sort of thing. It is however the only really sound principle upon which you can found any institution. (A peer it is eugenic) Yes, whether it is the monarchy or the House of Lords or a pack of foxhounds, the three most important institutions in the country that I can think of.''

এ জন্যই পূর্বে আমি বলিয়াছিলাম, বর্ত্তমান নৃপতিদের সুমন্ত্রীর প্রয়োজন। রাজা যদি বিলাসী বা উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির হইয়া পড়েন, অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে সুমন্ত্রী রাজা ও প্রজার মধ্যে পড়িয়া রাজ্যের কর্ণধার রূপে যেরূপ উভয়ের স্বার্থকে সার্থক করিয়া নিতে পারেন, তেমন অন্যত্র কোথায়ও সম্ভবে না। সুমন্ত্রণার জন্য স্বীয়রাজ্যের সুশিক্ষিত সুসন্তানদের নিযুক্ত করিলে, তদ্বারা মন্ত্রণা সভা গঠিত হইলে,—রাজ্য এবং রাজ্যের প্রজাদের স্বার্থ—রক্ষিত হইবে ক্রমশঃ রাজ্যশাসনে সুশিক্ষিত প্রজাগণ রাজাকে রাজ্যশাসনে সাহায্য করিলে উভয় কুল রক্ষা পাইবে। বর্ত্ত মান ভারতে স্বায়ত্তশাসনের যে বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়াছে তাহা হইতে এসব দেশীয় রাজ্য রক্ষা পাইবে। ক্রমশঃ এই সব দেশীয় রাজ্যের সুদৃষ্টান্ত ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষ স্বীয় পন্থা আবিষ্কার করিতে পারিবে।

দিল্লীর দরবার ও ভারতীয় নৃপতি বৃন্দ *

কার্জ্জনের এই দিল্লীর দরবার লইয়া ভারতে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আজ টলমল্। দেশীয় নৃপতিবর্গের মধ্যে এই টলমলানির মাত্রা অধ্যাপক জগদীশ বাবুর নব আবিষ্কৃত ''কম্পন'' হইতেও আশ্চর্য্যজনক। বড়লাট কৈফিয়তে বলিয়াছেন কাহারও এবং রাজসূয় ব্যাপারে অর্থনাশ হইবে না রাজাদের পর্য্যন্ত না। কিন্তু আমরা ত দেখিতেছি অর্থনাশ কেবল নহে ভারত—নৃপতিদের সর্ব্বনাশ হইতেছে। নমুনা দেখুন।

বড়লাট বলেন রাজারা এই উৎসবে যোগ দিবেন কেবল তাহা নহে তাঁহারা এ কার্য্যে ব্রতী হইবেন। তাঁহারা এ উৎসবের মধ্যে কেবল দর্শক নহেন তাঁহারা বড়লাটের সহায় হইয়া রাজ ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিবেন। কিন্তু ফলে হইতেছে কি? ''তোমার দই তোমার চিরা আমার কেবল মাথার কিড়া'' আপনারা সাজগোজ করিয়া ঘরের পয়সা খরচ করিয়া ঘরের ভাত দিল্লীতে খাইয়া বিনা মাহিনা আপ্ খোরাকিতে এ দিল্লীর রাজসূয় যজ্ঞাহূতিতে যোগ দেন। আপনারা নিজ নিজ বংশ মর্য্যাদা ভুলিয়া সেলামি তোপের বরাদ্দ মতে আপনাদের সম্মান গ্রহণ করিবেন কিন্তু মনে মনে যাহাই ভাবুন বাহিরে কিন্তু প্রকাশ করিবেন কাহারও প্রতি এ দরবারে উচ্চ নীচ ভাব প্রকাশ করা হয় নাই। সবাই যেন ভাবেন যে যার যার কৃষ্ণ তার তার দক্ষিণে, এই বিচিত্র রাজমন্ডপে আপনারা সখিভাবে নাচিয়া গাহিয়া যান, কৃষ্ণপ্রাপ্তি অদৃষ্টে থাকিলে ঘটিবে বই কি? আপনারা উদ্ধার পাইতে চেষ্টা করুন, আপনাদের বন্ধন ছেদন করিয়া দিলাম, এই মহারাসে আপনারা গলাগলি করুন, আপনাদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুতা স্থাপিত হউক, আমি তৃপ্তিবোধ করি। আপনারা আমাকে কিন্তু টানাটানি করিবেন না; এত আপনাদের ঘরের কাজ আপনারা সম্পন্ন করুন, আমি আপনাদের বাড়ী যাইয়া ঘুরিবার অবকাশ পাইব না। তার পরিবর্ত্তে আপনাদের একত্র করিয়া আমার দর্শন স্পর্শন শ্রবণের সুবিধা দিব।

এই গেল দিল্লী দরবারের গৌর চন্দ্রিকা। পালা কিন্তু আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত গাহিতে হইবে '' দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ'' তবে পালা আরম্ভের পূর্ব্বে ধূয়ার ধুম ও গৌর চন্দ্রিকার একটা রীতি আছে মনে করিবেন না এ আসরে কৃষ্ণ যাত্রা বা নিমাই সন্ন্যাস হইবে। এ যাত্রার পালা যাহা অভিনয় হইবে তাহাতে ''রাজাদের বস্ত্র হরণ'' হইবে সেটা অধিকারী যিনি তিনি বুঝিয়াছেন।

প্রথম কথা ব্যয়—দেশীয় রাজ্যগুলোর মধ্যে অধিকাংশের আয় অপেক্ষা ব্যয় বাহুল্য—প্রায় ঋণে ডুবিয়া আছে বলিলেও হয়। এই যে গরীব প্রজার অর্থগুলি দরবারের আহুতি স্বরূপ ঘৃত কিনার কার্যে ব্যয় হইতে লাগিল ইহাতে যে অনেকগুলি রাজ্য ঋণ পাশে বদ্ধ হইতে চলিল। মহামতি কার্জ্জন যাহাই বলুন না কেন ব্যয় করিতে কোন রাজাই কুণ্ঠিত নহেন। আমরা বলি না লর্ড কার্জ্জন জানিয়া শুনিয়া এ ব্যয় করিতে দিতেছেন কিন্তু ব্যয়ে যে হইতেছে, হইবে তার খবর তিনি রাখেন কি? ঐত সেদিন ইদোরের মহারাজ বিলাত হইতে আসিয়াই সম্রাট দরবারে হাজির হইবার ব্যয়ের জন্য লর্ড কার্জ্জনের কাছেই হাত পাতিয়া বসিলেন। অন্য পরে কা কথা। আমরা জানি অনেক দেশীয় নৃপতি এই দরবারে আহূত হইবার দরুন ঋণী হইতেছেন ও নিজ সম্মান রক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করিয়া হয়রাণ হইতেছেন তবুও বুঝি সম্মান রক্ষা হয় কি না হয়।

---

* ১৯০৩ খৃঃ দিল্লী দরবার উপলক্ষে তৎকালে লিখিত।

ইংরেজ সদাগরগণ এক হাত মারিতেছেন খুব। একবার কলিকাতায় জহুরি (অবশ্য ইংরেজ) গণের ঘরে প্রবেশ করিলে দেখা যায় ব্যাপারটা কি? প্রত্যেক রাজার এজেন্ট সেখানে, কার হাউদা কত মূল্যের , কার শিরপেঁচ কত সুন্দর, কার আসবাব কত কিস্‌মতের ইত্যাদি ইত্যাদি। হ্যায় হাউদা শিরপেঁচ আসা ছোটা পর্য্যন্ত তৈরী হইতেছে ইংরেজ সৌদাগরের ঘরে! কি কান্ড বলুন দেখি? লক্ষ লক্ষ টাকার খত্ লিখিয়া দিয়া রাজা, মহারাজ, নবাব মাথা তুলিয়া একে অন্যকে ঐশ্বর্য্য দেখাইতে যাইয়া ইংরেজ সদাগরের নিকট যে শির নীচু করিতেছেন, প্রজার রক্ত গুলি ইংরেজ সদাগরের শরীরে প্রবেশ করিতে দিতেছেন কেন? না আজ দরবারে যেন মণিমুক্তার বাহার দিয়া আমি ধন্য হই—এই মনের ভাবে লর্ড কার্জ্জন বলিতেছেন "আপনারা সমাগত নৃপতিবৃন্দ মিলামিশা করুন"। উত্তম কথা, ফলে তাহা হইবে কি? এই নৃপতিবৃন্দের মধ্যে একটা ভয়ানক আত্মসম্মান বোধ আছে যে, কে কার কাছে অগ্রে যাইবেন। ইংরেজ বহুরূপীকে হয়ত বা তিনি অগ্রে যাইয়া দেখা করিতে পারেন কিন্তু এক রাজা অন্য রাজার মধ্যে রাম বল, সেটা কি হয়? তবে দেখা যাইতেছে ও সুখেও ইঁহারা বঞ্চিত হইবেন। তারপর এই ১২ মাইল যোজন শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছে, যাঁহাদের পক্ষে উঠানই সমুদ্র বিশেষ, ঘর হইতে আঙ্গিনা বাহির তাঁহাদের পক্ষে কতদূর সুবিধা হইবে বলা যায় না। অতি সহিষ্ণু বড়লাটই সেজন্য রাজাদের সহিত দেখা প্রতি দেখার সাবকাশ পাইলেন না। তবে ফলে এই হইবে, দরবার আসরে তারা নিজ নিজ গন্ডির মধ্যে বসিয়া একে অন্যের প্রতি কটাক্ষপাত করিবেন। লর্ড কার্জ্জনের দরবার বক্তৃতার সময় তাঁহারা একে অন্যের মণি মুক্তার বাহার দেখিবেন ও অনুকরণে রাজকোষের শ্রাদ্ধ করিবেন। কারণ এমন ঐশ্বর্য্য—আসরে রাজা রাজরাদের ঐশ্বর্য্য পূর্ণ মাত্রায় প্রদর্শিত হইবে। ঈর্ষার বীজ বপন হইবে। তবে সুখের বিষয় এই ইংরেজ সম্রাটের প্রভাবে শান্তি সুখের মধ্যে মেষ মহিষে একত্রে জল পান করিতেছে। যুধিষ্ঠিরের রাজস্ব ব্যাপারেই কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মূল ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রের পরিবর্ত্তে নিজ ক্ষেত্রটীর সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে। দেশে পৌঁছায়াই লাগাও খরচ আমার অর্থ সামর্থ্য থাক্ বা নাই থাক্ অমুক রাজার মত হীরা জহরৎ চাই। বিলাত যাইয়া তাঁহারা কাঠের আসবাবে লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই বলিয়া লর্ড কার্জ্জন বিধি ব্যবস্থা করিয়া তাঁদের শ্বেত দ্বীপে যাওয়ার বাধা দিলেন, হীরা চুন্নি পান্না মতির লোভ যে এঁদের হাড়ে হাড়ে জড়িত!!

তারপর মানের পালা যতই কেন বুঝান হউক না কিন্তু রাজারা যখন চক্ষে দেখিলেন, তোপের মাপকাঠীতে ওজন হইয়াও রক্ষা পাইলেন না তার উপর আবার অদৃষ্ট পরীক্ষার উপরও মানীর মান নির্ভর করে। সম্মান ভোগীদের মধ্যে পিতার গঙ্গাপ্রাপ্তি দরুণ যাহার সিংহাসন (নম বিষ্ণু গদি Throne নয় God) প্রাপ্তি ঘটিয়াছে তিনি জ্যেষ্ঠ গুরু অভেদে অগ্রে বসিলেন হাতির মিছিলে ও দরবারে এই নিয়মই রক্ষা হইবে। কাজেই কাঁচ কাঞ্চনে সমান অধিকার কোন প্রভেদ রহিল না। ভারতীয় নৃপতিগণের মধ্যে আর্য্য বংশাবতংশ চন্দ্র সূর্য্য বংশধর ক্ষত্রিয় রাজাগণ আবহমানকাল বংশ মর্য্যাদায় যে অভিমান করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের মানের পালা এখানেই লুপ্ত হইতে হইল। এটা তাঁহারা কি মর্ম্মান্তিক বোধ করিবেন না? যে ভারত ভূমিতে অদ্য পর্য্যন্ত জাত্যাভিমানের হাড়ে হাড়ে জড়িত রহিয়াছে, যে জাত্যাভিমানের দরুণ রাজপুতনায় কি বিপ্লব না গিয়াছে আজ দিল্লীর দরবারে তাহার বহুল ছড়াছড়ি, তাহার মর্য্যাদার লাঘবতা কি চন্দ্র সূর্য্য বংশীগণের পক্ষে অকাতরে সহ্য করিতে হইবে না? বিধি বিড়ম্বনায় আজ যাঁহাদের শত সহস্র বৎসরের পুরাতন বৃহৎ রাজ্য ক্ষুদ্র পরিসর হইয়া ইংরেজী মাইল পরিমিত হইয়া পড়ায় ও যাঁহারা একমাত্র প্রাচীনতার অভিমানটীকে বক্ষে চাপিয়া রাখিয়া সুখানুভব করিতেছেন, তাঁহাদের সে স্থলে কি বঞ্চিত হইতে হইবে না? দেখা যাইতেছে যাহাতে রাজাদের মধ্যে এই ভাবটী না আইসে সেজন্য বড়লাট বড় ব্যস্ততা প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের গন্ডি ঠিক করিয়াছেন তবুও তিনি সামলাইতেই পারিলেন না। একটা মাপ কাঠী তাঁহাকে ধরিতেই হইল। কিন্তু নিজামই হউন আর সামান্য গ্রাম পরিমাণ রাজ্যের রাজাই হউক তুলনায় মান রক্ষা করিতে যাইয়া অনেকের মনে একটা মানভিক্ষার ভাব থাকিয়া যাইবে।

আবহমান কাল ভারতে একটা প্রাচীনতার মর্য্যাদা চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীনতার সে মর্য্যাদা লাঘবের কারণ ঘটিবামাত্র ভারতবাসী মর্ম্মবেদনা অনুভব করে। ভারতীয় নৃপতিদের মধ্যে সে ভাবটা বড় পাকাপাকি রকমে বর্ত্তমান। তাঁহাদের নিজ নিজ

রাজ্য মধ্যে তাঁহারা সম্মানের থালি। এই বংশ মর্য্যাদাই তাঁহাদের একমাত্র অন্তরের জিনিষ। তাঁহারা যতটা ইহা মনে করেন ইংরেজ তাহার ততটা ধার ধারেন না। এই লম্বা চৌড়া রাজাদের নামাবলীর মধ্যে তোপ অনুসারে ইহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে,—হাতির মিছিলে সম্রাট প্রতিনিধির পেছনে তাঁহাদের স্থান নির্দ্দেশের তালিকা বাহির হইয়াছে। ইঁহাদের বংশ মর্য্যাদার পরিবর্ত্তে তোপের মর্য্যাদা ধরিয়া তাঁহাদের স্থান নির্দ্দেশ ভারতবাসী হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম। কাজেই ভারতবাসী এ মাপকাঠীর মানে ভুল ধরিবেন ও দেখিবেন। যিনি পাদুকা—বাহক ছিলেন আজ তিনি যদি তোপের পরিমাণে আমার উচ্চে স্থান পাইলেন তাহা আমার পক্ষে কিন্তু অসম্মানই হইল। এ মোটা কথা বুঝাইবার বা বুঝিবার ঘোরপ্যেঁচ কি আছে?

তবে বলিবেন ইহার উপায় কি? কি উপায়ে এই শতাধিক নৃপতিকুলকে সামলান যায়? আমাদের উত্তর একই কথা-প্রাচীনতাকে রক্ষা করুন। ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষার্থে লর্ড কার্জ্জন যাহা করিতেছেন এ ক্ষেত্রে তাহা করিলেই উত্তম হইত। তোপের আওয়াজে ভারত নৃপতির কুল জন্মায় নাই, তোপের পরিমাণে তাঁহারা বংশ মর্য্যাদা ভুলেন নাই- ভুলিবেনও না। যে বংশমর্য্যাদা তাঁহারা আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন, সেটাকে তোপ দিয়া উড়ান বড় দায়। চন্দ্র সূর্য্য থাকিতে তাঁহাদের বংশধরগণ বংশ মর্য্যাদার পক্ষপাতিত্ব ত্যাগ করিবেন না। রাজপুত-ললনা যদি অগ্নিতে প্রবেশ পূর্ব্বক বংশ মর্য্যাদার মান রক্ষা করে থাকেন, রাজপুত কি তাহা পরিত্যাগ করিবেন?

দিল্লী দরবারে ধন সম্মান সবই খোয়ানি যাইবে একথা হইতেছে না। তবে লর্ড কার্জ্জনের কৈফিয়ৎ শুনিয়া আমরা যে সন্তুষ্ট নহি, তাহাই বলিতে বাধ্য হইলাম। আমাদের মনে হয়, এই রাজসূয় ব্যাপারের পূর্ব্বে প্রাচীন প্রথামত যদি লর্ড কার্জ্জন দেশীয় নৃপতিদের মধ্যে যাঁহারা সৎপরামর্শ দাতা এমন কয়েকজন নৃপতির পরামর্শ নিতেন, তবে তাঁহারা এ বিষয়ে সুপরামর্শ দিতে পারিবেন। কিন্তু ইহাতে হয়ত কেহ মনে করিতে পারেন তাঁহারা হয় নিজ স্বার্থানুসারে উপদেশ দিতেন, ইহা অতি অশ্রদ্ধেয় কথা। কারণ, এমন ক্ষুদ্রতা রাজাদের সম্ভবে না। রাজপুরুষগণ কর্ম্মচারী—তাঁহাদের পক্ষাপক্ষ অবলম্বনে স্বার্থপূর্ণ উপদেশ দানের সম্ভাবনা থাকিলেও রাজা মহারাজাগণ ভিন্ন উপাদানে গঠিত। তাঁহারা দেশের রাজা দেশের মঙ্গল ও সম্মান অগ্রে দেখেন। এই সেদিন মাধবরাও সিন্ধিয়া বিজয় পতাকা উড়াইয়া যখন হোলকার রাজ্যে রাজদর্শনে গেলেন তখন যে অভাবনীয় সম্মানে হোলকারকে অভ্যর্থনা করিলেন কোন ইউরোপিয় রাজার পক্ষে তাহা স্বপ্নাতীত। হোলকার রাজার পাদুকাবাহী ছিলেন, মাধবরাও। তিনি নিজ প্রতিভায় বীরত্বে বিজয়ী নামে অভিহিত হইলেন। স্বয়ং ইচ্ছা করিয়াই হোলকার রাজাকে দর্শন করিতে গেলেন। হোলকার পূর্ব্ব সম্বন্ধ ভুলিয়া মাধব রাওকে রাজ সম্মানে সম্মানিত করিতে প্রয়াস পাইলেন। মাধবরাও হোলকার সন্নিহিত হইবামাত্র পূর্ণ দরবারে নিজ রাজবেশের ভিতর হইতে লুক্কায়িত পাদুকা বাহির করিয়া হোলকার রাজার সম্মুখে ধরিয়া দিয়া জোড়করে দাঁড়াইলেন। হোলকার স্তম্ভিত হইলেন বটে কিন্তু পর মুহূর্তেই তাঁহাকে কোল দিলেন! এ ঘটনা ইতিহাসের পত্র শোভা করিতেছে। কাজেই বলিতে হয়, ভারতীয় নৃপতিগণ এ বিষয়ে সদা উপদেষ্টা হইতেন।

পুরাতত্ত্ব আলোচনায় দেখা যায় যুধিষ্ঠিরও বিরাট রাজসূয় ব্যাপারে প্রথমে নৃপতিবর্গের পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংরেজ সম্রাট প্রাচীনতার গৌরব রক্ষা করিতে প্রয়াসী হইলে, কোটী কোহিনুর অপেক্ষা মূল্যবান প্রাচীন ভারতবর্ষটির প্রাচীনতার উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন হইবে। আন্তরিকতায় যত রাজ্য স্থায়ী হয় তত স্থায়িত্ব গোলাগুলি বা মেশিন কামানেও সম্পাদিত হয় না। আশা করি ভারত সম্রাট ভারতের প্রাচীনতার উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবেন। ভারতবাসী নূতন রাজ্য চায় না নূতন হাকিম চায় না তারা সবই পুরাতনের পক্ষপাতী, তাই শত শত বৎসরের মোগল সাম্রাজ্য স্থায়ী হইল না। ইংরেজ সম্রাটের দ্বারা ভারতের প্রাচীনতায় মর্য্যাদা রক্ষিত হইলে ভারত কোটী কোহিনুর সমফল প্রদান করিবে সন্দেহ নাই।

দিল্লীর শিল্প প্রদর্শনী

রাষ্ট্রনীতি রক্ষার্থ, অথবা লর্ড কার্জ্জনের বাহাদুরির জন্যই হউক কিংবা ভারতীয় নৃপতিবৃন্দকে নিয়া একটা তামাসা করার জন্যই হউক দিল্লীতে ১৯০৩ সালে একটা দরবার হইয়া গিয়াছে। তাহাতে যে সব আড়ম্বর তামাসা ধুমধাম হইয়াছিল, জগতে তাহার বহুল প্রচার হইয়াছে। একটা বিধি ব্যাপার হইয়াছে, সমাচার পৃথিবীতে আসিতে বাকি রহে নাই। ভারতীয় নৃপতিবৃন্দ তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছেন; এখনও তাহার জের বহিতেছেন। নব সম্রাটের মুকুট গ্রহণের পর ভারত নৃপতিবৃন্দের মুকুট—শোভিত শির নত করার সুবিধা নিবারও দরবারের অন্যতর অভিপ্রায় ছিল। দরবারে তাঁহাদের আত্মনিবেদনে, তাঁহাদের সম্রাট প্রতিনিধির সহিত হস্ত কম্পনে, সম্রাট ভ্রাতার সহিত আলিঙ্গনে, দর্শক মাত্রকেই সে ভাবটা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সৌভাগ্যবশতঃ যাঁহারা দরবার উৎসবের দিনে দরবার মন্ডপে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা এ অভিনয় হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। যাহা হউক, দরবার ব্যাপারের একটা কৈফিয়ত সরকার পক্ষ হইতে আমাদের স্বনামধন্য রাজপ্রতিনিধি দিয়াছেন, তাহাতে গৌরচন্দ্রিকায় বলা হইয়াছিল ''রাজন্যবর্গেরই এই দরব ার, তাঁহাদের নিবেদন ভারত সম্রাটের নিকট পৌঁছাইবার ভার লর্ড কার্জ্জন দরবার সিংহাসন সম্মুখে দন্ডায়মান হইয়া গ্রহণ করিলেন ও বিলাতে সম্রাট সকাশে স্বয়ং প্রতিপ্রেরণ করিবেন সম্রাট ভ্রাতা স্বয়ং বামদিকে বসিয়া। আমরাও তাহাই মানিয়া নিলাম, কেননা রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

''চাইনারে মন চাইনা
মুখের সঙ্গে যেটুকু পাই
যে হাসি আর যে কথাটাই
যে বলা আর যে ছলনা
তাইনেরে মন তাইনে''

কিন্তু এ বিরাট ব্যাপারের মধ্যে যাহা কিছু খাঁটি, যাহা কিছু দ্রষ্টব্যের শিক্ষার আক্কেলের জিনিষ তাহা এই শিল্প প্রদর্শনীতে ছিল একথা ভারতবাসী মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইয়াছে। ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থান হইতে সমাগত দর্শকবৃন্দ এই শিল্প প্রদর্শনী দেখিয়া প্রত্যাশা করিতে পারিয়াছিল যে ''ভারতের শিল্প'' আজও যাহা বর্ত্তমান আছে তাহার তুলনা অন্যত্র সম্ভবে না। প্রাচীনতার জন্য ভারত গরিমা করে বটে, কিন্তু এ গরিমার যথেষ্ট কারণ আছে, এ গরিমা গায়ের জোরে—মুখের কলের বলে রাক্ষসী প্রতিদ্বন্দ্বিতার বলে নহে, সেদিনের সভ্যতার প্রচন্ড উত্তাপের ঝলমলানি প্রতাপের দ্বারা হয় নাই। ভারতে প্রাচীন সভ্যতার যে একটা সাহিত্য ছিল, ভারতে আর্য্যদিগের যে প্রতিভা ছিল, যে আরাম ও শান্ত সুশীল ধীরতা ছিল, তাহারই মহিমার নিদর্শনস্বরূপ—ভারত শিল্প ফুটিয়া উঠিয়াছে। হিন্দুর সাম্রাজ্য পতনের পর মুসলমান তাহার সম্মান দান করিতে কৃপণতা করে নাই, শিক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই, ব্যবহার করিতে ক্রটী করে নাই। বাদশাহ ও নবাবগণ উহার রক্ষাকল্পে রাশি রাশি অর্থ জলের মত ব্যয় করিয়া আত্মপ্রকাশ লাভ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে আজও ঐ সব অতি আশ্চর্য্য শিল্প ভারতে টিকিয়া আছে।

কোন কোনটা লুপ্ত হইয়া থাকিলেও যাহা এ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছে তাহাও কেবলমাত্র মুসলমান বাদশাহের রাজানুগ্রহের সঞ্জীবনী সুধার ফলে বলিতে হয়। রাজানুগ্রহ ফলেই শিল্পীগণ এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল, রাজানুগ্রহে দেশান্তরের হস্ত নির্ম্মিত কলা খচিত দ্রব্যাদি, হাতের নির্ম্মিত সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্রাদি উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া দূর দুরান্তর বিদেশাদিতে প্রভা বিস্তারের সুবিধা পাইয়াছিল। বৈদিশিক ঐতিহাসিকগণের ইতিহাসে, তাঁহাদের ভ্রমণবৃন্তান্তে এই সব দ্রব্যাদির ভূয়সী প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়— চমৎকারীতার আভাস দেখা যায়। কত গল্পগুজব—কত রহস্যময় আখ্যানে এই সব দ্রব্যাদির বিষয় লিখিত হইয়াছে তাহা উল্লেখ করিতে গেলে বাহুল্যতা দোষে দুষ্ট হইয়া পরে। অন্দরমহলে মহিষীগণের অঙ্গশোভা করিতে বিলাসিতার এরকম সহায় হইত ভারত শিল্প। ইহাই প্রতি অঙ্গের শোভা বর্দ্ধনের একমাত্র উপাদান ছিল। বাদশাহগণ শিল্পের আদর করিতে যাইয়া ভারতবর্ষকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। ভারত—ললনা রাজঅন্তঃপুরের মহিষী হইলেন— ভারত শিল্প তাঁহাদের আপাদ মস্তক সাজাইয়া দিল। মোগল পাঠানের স্বদেশের সাজগোজগুলি কাঠখোট্টার মত নিজে নিজেই লুপ্ত হইল। ভারত শিল্প তাঁহার স্থান নিজ মহিমায় দখল করিয়া লইল। ভারত শিল্পই দেখাইল—ভারত বিজয় করিয়া মুসলমান যেন ভারতবর্ষের মান ভাঙ্গিতে গিয়া ''দেহি পদ পল্লব মুদারম্'' বলিয়া হীরা—মাণিক্য—খচিত পা খানা ধরিয়া মান ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ভারতের দুর্দ্দিনের মধ্যে ঐ ভাবটাই বুঝি জলেতে বিজলী খেলা দেখাইয়া ছিল হায়রে সেদিন!!!

তাহার পর ভাগ্যলক্ষ্মী যখন মোগল বাদশাকে ত্যাগ করত ঃ ইংরেজ জাতির অঙ্কশায়িনী হইলেন, তখন ভারতশিল্প অভিভাবকবিহীনা বিধবার ন্যায় পিতৃকুল আশ্রয় লইয়া দীন হীন অবস্থাপ্রাপ্তা হইলেন—হিন্দুর বিধবার সাজ পরিয়া নিরাভরণ হইলেন। রাজামহারাজের ঘরে ভারত—শিল্প প্রাণহীন প্রাচীনত্বের নিদর্শনস্বরূপ গচ্ছিত হইল। তাহাদের চিহ্নমাত্র যাহা কিছু এই দিল্লী প্রদর্শনীতে Loan Collection বিভাগে এবার দেখা গেল। সম্প্রতি প্রকাশিত Indian Art of Delhi 1903 নামক—গবর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত Sir George Watt এর গ্রন্থে তাহা সচিত্র বিশতভাবে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থখানা উপাদেয় এবং শিক্ষাপ্রদ। ইহারই উপলক্ষে এই প্রবন্ধ লিখা হইতেছে।

ইংরেজ ভারতে প্রভাব বিস্তার করিলেন। ইতিপূর্ব্বে ভারতের ভান্ডার লুটপাট হইয়া গিয়াছিল। ময়ূর সিংহাসন নাদির সাহ লুট করায় ভারত সিংহাসন মূল্য হইল। সঙ্গে সঙ্গে ভারত শিল্পও হস্তান্তরিত হইল; ইংরেজ ভারতে শনৈঃ শনৈঃ রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে নানা দেশীয় রাজন্যবর্গের যুদ্ধাদি হইতে লাগিল। মাহারাট্টা শিখ মুসলমান রাজপুতগণ ইংরেজী প্রতাপের সম্মুখে পরাজিত বা সন্ধিসূত্রে গ্রথিত হইল। সে সময়ের ভারত ইতিহাস কেবলই ইংরেজী জয় পতাকার কাহিনীতে পূর্ণ হইল। রাজা, রাজ্য ইংরেজী প্রবল শক্তির নিকট নত মস্তকে সামন্ত রাজ শ্রেণীতে ভুক্ত হইল। ১৮৫৮ সালের ১ লা জানুয়ারীতে শান্তি সুখের মধ্যে পরলোকগতা মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতেশ্বরী হইলেন। এই কালের মধ্যে কত রাজ্যে কত গোলমাল, কত যুদ্ধ বিগ্রহ, আত্মকলহ রাজদ্রোহিতা প্রভৃতি ঘটনার ঝঞ্ঝাবাতে কত শত ছোট বড় প্রলয় হইয়া গেল ইতিহাসেই তাহার সাক্ষী রহিয়াছে। কিন্তু কত ঘরের কত শত সহস্র মণি মাণিক্যাদি শিল্প দ্রব্যাদি কোথায় গিয়া পড়িয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহার খোঁজ খবর কে নিয়াছে? ব্রিটিশদ্বীপেই বা কত প্রেরিত হইয়াছে। সামান্য সৈনিকগণ পর্য্যন্ত লুটের মধ্যে কত সামগ্রী স্বদেশে নিয়া অল্প বিস্তর মূল্যে ধনবানদিগকে সমর্পণ করিয়াছে তাহার কোন ঠিকানা করা যায় না। একমাত্র টিপু সুলতানের লুণ্ঠিত অপহৃতাবশেষ ধনাগার হইতে ৩০ কোটি টাকা মূল্যের ভারতীয় শিল্প দ্রব্য পাওয়া গিয়েছিল। সে সব দ্রব্যের তালিকা দৃষ্টে জানা যায় শিল্পদ্রব্যের পরিমাণ, ব্যবহার, উপযুক্ত অন্যান্য দ্রব্য হইতে শতগুণে অধিক ছিল। শ্রীরঙ্গপট্টম জয়ের পর ইংরেজ রাজ পুরুষগণ ঐ সব দ্রব্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন—চক্ষু ঝলসিয়া গিয়াছিল। টিপুর দরিয়া দৌলতবাগের কাষ্ঠনির্ম্মিত ভবনখানা দেখিয়া তাহারা চ মৎকৃত হইয়াছিলেন। কাষ্ঠের উপর ঐরূপ সুন্দর খোদকারী ইউরোপে সম্ভবে নাও করা যায় না। অথচ টিপু সুলতানের দুই পুরুষমাত্র রাজত্বে ঐ সকল দুর্ল্লভ বস্তু নির্ম্মিত ও সংগৃহিত হইয়াছিল।

যাহা হউক, শিল্প দ্রব্যাদি এখনও অতি প্রাচীন রাজবংশে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু শিল্পী আর নাই; তাহারা উপযুক্ত উৎসাহ অভাবে—পৃষ্ঠপোষক অভাবে অন্নাভাব—ব্যবসা হইতে ব্যবসান্তর গ্রহণ করায় বংশ পর্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে। এমন কি

কোন কোন শিল্প সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে। তাহার নাম কত করিব? এই ইংরেজ রাজ্যে ভারতীয় শিল্প অনাদৃত হইয়াছে বলা আমার মতে অন্যায়, কিন্তু রাজানুগ্রহ পায় নাই ইহা সত্য। কোম্পানির আমলে দেশজাত দ্রব্যের ব্যবসাই বিস্তার লাভ করিয়াছিল। শিল্পদ্রব্য তাহাদের ব্যবসার উপযুক্ত ছিল না। চনা, গম, পাট প্রভৃতি যত লাভের—শিল্পদ্রব্য তাহার তুলনায় কিছুই নহে। ইংরেজ সদাচার রাজা সৌদাগরী করিতে লাগিলেন—সস্তাদরে বিলাতী দ্রব্য ভারতে পৌঁছাইতে লাগিলেন—দেশের তাঁতিকুল বৈষ্ণবকুল উভয় কুল গেল। শিল্প টিকে কিসে? শিল্পীগণও পাট বুনিতে লাগিল, ধান চাষ করিতে গেল। বানারসী ঢাকাই আমাদাবাদী দিল্লিওয়ালা, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতির শিল্পীগণ জাতি নষ্ট করিয়া চাষাভুষা হইল। ভাগ্যক্রমে দু এক জন দেশীয় রাজা ও ধনবান সখ করিয়া কোন কোন দ্রব্যের খরিদ্দার ছিলেন, তাই প্রাণে প্রাণে দু একটি ঘর বাঁচিয়া গেছে; কিন্তু তাহাদের অবস্থাও পূর্ব্ববৎ রয় নাই। ফ্যাসনের সঙ্গে সঙ্গে সস্তাদরে জিনিষের দরকার হইল। বিলাতী সূতা ও রং এবং গিল্‌টির সংশ্রবে ভারত শিল্প—কুলে বর্ণশঙ্কর জন্মিয়া এখনকার দেশীয় শিল্প এক অভিনব অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। সিগারেট্ বাক্স দিয়াসলাকার বাক্স দস্তানা রুমালের বাক্স মেম্ সাহেবে বিবিদের গাউনের উপরে ভারত শিল্প লজ্জার মাথা খাইয়া অপমানের তিলক কাটিয়েছে। দেশীয় শিল্পের এইরূপ নানাপ্রকারের অপব্যবহার দেখিলে অবাক হইতে হয়। হিন্দুদের দেবী চুরুটের ভস্ম ফেলিবার আধারে; চা দানের টিপায়ের পায়ারূপে পরিণত হইয়া ভারতীয় শিল্প ইংরেজের ঘরে শোভা পাইতেছে। ইহারও একটি সার্থকতা এই হইয়াছে যে ভারত শিল্পের উপর বিলাতী দৃষ্টি পড়িয়াছে। ইংরেজ রাজ্য যখন দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইল, তখন দেশের দ্রব্যাদি তাহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। শিল্পকলার আদরের স্থান এক্ষণে ইউরোপে, তাই ইউরোপ ভারত শিল্প—দ্রব্যাদির আদর করিতে অগ্রসর হইয়াছে। এমন কি, এক্ষণে রাজানুগ্রহ কতক পরিমাণে এদিকে ফিরিয়াছে বলা যায়। কতক পরিমাণ বলিবার উদ্দেশ্য এই বলিব যে, হিন্দু মুসলমান রাজাদের মত ইংরেজ রাজ এই সব শিল্প দ্রব্যের জন্য অজস্র টাকা ব্যয় করিতে পারেন বটে, কিন্তু সার্থকতা ইহাতে কিছু নাই মনে করেন। তাই এইরূপভাবে অর্থনাশকে অল্প ব্যবহার রূপে ধরিয়া নেন এবং Patronise নামক ইংরেজ শব্দে যতদূর বুঝায় ততদূর করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। অন্ততঃ এতটুকু অনুগ্রহ লর্ড কার্জ্জন করিয়াছেন ও তাহা তিনি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—মুক্তহস্তে নহে। নতুবা দিল্লীর প্রদর্শনীর দ্রব্যাদির অধিকাংশ ভারত সম্রাটের তোষাখানার জন্য খরিদ হইত। কিন্তু তবুও বলি, লর্ড কার্জ্জন ভারত শিল্পের উন্নতি ও পুনরুদ্ধারের জন্য যাহা করিয়াছেন তজ্জন্য আমরা সর্ব্বান্তকরণে তাঁহাকে ধন্যবাদ দেই। যদি ভারতে স্থায়ী রাজ প্রতিনিধি হইবার আশা তাঁহার থাকে, ভারতের শিল্প দেবতা তাঁহার সে আশা পূর্ণ করুন।

প্রবন্ধের মুখবন্ধ মাত্র হইল, এক্ষণে প্রবন্ধ বিষয়ে অবতারণা করা যাউক। লর্ড কার্জ্জন ভারতে পদার্পণের পূর্ব্ব হইতেই ভারতীয় শিল্প দ্রব্যের উপর ইংরেজদিগের একটা সখ জন্মে, ক্রমে তাঁহাদের ঐসব দ্রব্যাদির প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত হয়। তাঁহারা ঐসব জিনিষের খরিদ্দার হইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে ভারতের প্রধান প্রধান নগরগুলিতে এইবার পণ্য বথীকার প্রতিষ্ঠা হইতে লাগিল। দিল্লীর চাঁদনি চকে, লাহোর বাজারে,বারাণসী বম্বে মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে এসব দ্রব্য বৈদেশিক ভবঘুরে দের নিকট বহুগুণ মূল্যে বিক্রী হইতে লাগিল। Indian curio না দেখা হইলে কোন ভ্রমণকারী আপন দেশে দশ জনের কাছে কল্কে পায় না। এই কলিকাতা নগরীতে রাস্তায় রাস্তায় দেশীয় দ্রব্যের দোকান খোলা হইতেছে—বেশ বিক্রয়ও হইতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয়, দেশীয় লোকের মতি গতি কিন্তু বিলাতী জিনিষের দিকে ভয়ানক ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। এসব কথা নিয়া সম্প্রতি আলোচনা কম হয় নাই, তাহার ফলে দেখা যায় আমাদের মধ্যেও অনেকেরা এক্ষণে দেশের দ্রব্যের আদর করিতেছেন। ইহা সুখের কথা আশার কথা বটে।

লর্ড কার্জ্জন ও তাঁহার পত্নী ভারত শিল্পে দ্রব্যের উন্নতিকল্পে বিশেষ মনোনিবেশ করিয়াছেন, স্বয়ং ভারতেশ্বরীর রাজবেশ ভারতবর্ষের কারুকার্য্যে প্রস্তুত হইয়াছিল, লাটপত্নী দিল্লীর দরবার ঘটিত নানা উৎসবে ভারতীয় সুন্দর বস্ত্রাদিতে সুশোভিতা হইয়াছিলেন। বিগত ১৯০২ সালের ২৯ শে ডিসেম্বর তারিখে দিল্লীতে ভারত শিল্প প্রদর্শনী খুলিবার সময় যে ভাষায় অন্তরের

কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে সকলকেই এক বাক্যে স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, লাট কার্জ্জন যথার্থই ভারত শিল্পের বন্ধু এবং উদ্ধারের কর্ত্তা। তিনি সেইদিন দেশীয় ভদ্রমণ্ডলীকে—বিশেষ ভারতের রাজন্যবর্গকে উল্লেখ করিয়া যে কথা বলিয়াছিলেন আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহারা পুরুষানুক্রমে তাহা স্মরণ রাখিবেন এবং প্রতিপালন করিবেন ও দেশের মঙ্গল সাধন করিবেন। Tottenham court-নিবাসী গৃহসজ্জা নির্মাতাদের তুলনায় তিনি এদেশের দ্রব্যগুলিকে সম্মান দিয়াছিলেন, বহুল পরিমাণে ঐ সব দ্রব্যের বিস্তার হয় তাহার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি Tottenham court হইতে গালি পর্যন্ত খাইয়াছিলেন। Tottenham court -কেননা, ভারতের বড় বড় রাজ—রাজড়া তাহাদের খরিদ্দার। পাছে লাট সাহেবের যুক্তিতে তাঁহাদের খরিদ্দার ছুটিয়া যায়। লাট কার্জ্জনের ঐরূপ ভাষা প্রয়োগের কারণ যথেষ্ট ছিল। তিনি দেশীয় অনেক রাজ্যে ঘুরিয়াছেন। আশা করিয়াছিলেন, প্রাচীন রাজ্যগুলির রাজভবনে তিনি প্রাচীন ভারতশিল্পের সমাদর ও শোভা দেখিতে পাইবেন। কিন্তু যাহা দেখিলেন তাহাতে তৃপ্তিলাভ দূরের কথা, তাঁহার বিরক্তি ও ক্ষোভের কারণ হইল। তিনি দেখিতে পাইলেন, তৃতীয় শ্রেণীর বিলাতী গৃহসজ্জায় রাজাবাস সজ্জিত, অতি কদর্য্য বিলাতী টিম্‌টাম্ দ্রব্যাদিতে কলঙ্কিত, নকলের না কাল গ্লাসের দ্রব্যে শ্রীভ্রষ্ট এবং নিতান্ত শ্রীহীন বিলাতী গালিচাতে গৃহ—প্রাঙ্গণ মণ্ডিত। সোনা ফেলিয়া বরং কাচের আদর, মণি মাণিক্যের স্থানে কুৎসিত নকল আদৃত, শাল, ঢাকাই বস্ত্রের পরিবর্ত্তে অসংলগ্ন বস্ত্রাদিতে রাজবেশ ইংরেজ দর্জ্জির নির্ম্মিত, রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত বিলাতী নমুনায় গঠিত। এমন কি, কোন রাজ অন্তঃপুরে রাজবাসীদের পরিধেয় বসনে পর্য্যন্ত বিলাতী সাটিন মখমল্ দখল বিস্তার করিয়াছে। তিনি এই সব দেখিয়া অবাক হইয়াছিলেন, অন্তরে ভারতশিল্পের জন্য ব্যাথা পাইয়াছিলেন, তাই প্রদর্শনী উপলক্ষে তাঁহার আত্মনিবেদন বিদেশীয় শিল্পদের নিকট কঠোর ঠেকিয়াছিল। কিন্তু ভারতবাসীদের নিকট তাঁহার বাক্য বড় মর্মস্পর্শী হইয়াছিল। তাহার পর যখন প্রদর্শনী গৃহের দ্বার মোচন হইল, দর্শকবৃন্দ যথার্থই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কার্জ্জনের কথা সদভিপ্রায় পূর্ণ। এই প্রদর্শনীতে না ছিল কি ? শিল্প জগতে যাহা উত্তম শ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারে, এই শিল্পাগারে প্রত্যেক শ্রেণীতে নানা জাতীয় নানা দেশের তদ্রূপ বহু প্রকারের জিনিষ ছিল। ভারত শিল্পের এই ভাবে একত্র সমাবেশ ও সাধারণের দৃষ্টিপথে আনয়ন করার উপায় এই সর্ব্বপ্রথম। কাজেই দিল্লীর দরবার উপলক্ষে এই মহৎ কার্য্যটি যথার্থই ভারতের একটি মঙ্গলজনক ব্যাপার হইয়াছিল; এবং দরবারের মহিমা প্রকাশ পাইয়াছিল। প্রদর্শনী মন্ডপটিও এদেশীয় মন্দিরের অনুকরণে প্রস্তুত হইয়াছিল। গৃহের ভিতর ভারতের রাজন্যবর্গের বংশ চিহ্ন, রাজচিহ্ন বিশিষ্ট পতাকাদিতে সজ্জিত হইয়াছিল প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ ভারতের নানা দেশীয় দ্রব্যাদিতে অতিরিক্ত মাত্রায় পূর্ণ ছিল। যেদিকে দেখা যায় কেবলই বিচিত্র দ্রব্যাদির বাহার। কাষ্ঠের ধাতুর পশমের সুতার, দাঁতের হাড়ের পশু শৃঙ্গের , কাগজের কত শত সহস্রাধিক দ্রব্যজাতে এ গৃহটি পূর্ণ হইয়াছিল, তাহা যিনি দেখিয়াছেন তিনি চক্ষুর সার্থকতা লাভ করিয়াছেন। সকলেই, কি দেশী, কি বিদেশী, এই সব দ্রব্য দেখিয়া এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন ভারতবর্ষে এরূপ বিচিত্র সুন্দর এবং দুর্ল্লভ শিল্প সম্ভবে ইহা পূর্ব্বে তাহাদের ধারণা ছিল না। দেশীয় রাজন্যবর্গ নিজ দেশজাত দ্রব্যাদির মূল্য জানিতে যাইয়া লজ্জিত হইয়াছিলেন। এমন সস্তায় এরূপ সুন্দর দ্রব্য পাওয়া যায়, তাঁহাদের ধারণা অতীত ছিল। আমরা দেখিয়াছি, একজন রাজা আর মূল্য জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা পাইয়া কেবলমাত্র জিনিষ পছন্দ করিয়া লইতে ছিলেন, আর মূল্য জানাইতে গেলে তিনি দুহাতে নিষেধ করিতেছিলেন— আর যেন মূল্যের উল্লেখ করিয়া তাহাকে লজ্জা দেওয়া না হয়। একজন ইংরেজ মহিলা রাজার এই বাক্য শুনিয়া সঙ্গিনীর প্রতি ইঙ্গিত করিতেছিলেন, আর বলিতেছেন "Now the Native chiefs seem to be getting wise." "সঙ্গিনী উত্তর করিলেন; "They ought to" আর হস্তস্থিত লক্ষ্ণৌ চিকনের রুমাল খানার প্রতি বারংবার দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। এদিকে ভারত নৃপতিবৃন্দ একে অন্য দেশের শিল্পকলার মাহাত্ম্য বুঝিতেছেন, ক্রয় করিতেছেন, ফরমাইস দিতেছেন, কারিগরের খোঁজ নিতেছেন এদৃশ্য কি কখন কেহ প্রত্যাশা করিয়াছেন ? শিল্প প্রদর্শনীতে তাহা সত্যসত্যই দেখা গিয়াছিল।

দেশীয় রাজগণ ও উপাধি ব্যাধি

ভারতবর্ষে নানা প্রকার ব্যাধির বহুকাল হইতে সঞ্চার হইয়াছে,তাহাদের মধ্যে উপাধি একটি প্রধান ব্যাধি। এই ব্যাধিটির বহু উপসর্গ, আবার ইহা সংক্রামকও বটে—এবং বংশ পরম্পরগত দোষেও দুষ্ট। দুরারোগ্য উপাধি—ব্যাধি যতই প্রবলতা লাভ করে ধনীকে তত অধিক মাত্রায় লঘু করিয়া তোলে। তখন ইন্দ্রনাথ বাবুর সেই অভিনব পঞ্জিকার উপাধি লোলুপ ব্যক্তির সহিত ''তুলারাশির'' তুলনা সত্যই বলিয়া মনে হয়। দেশের যিনি গরীবের মা—বাপ ছিলেন, যথার্থ দেশের জন্য যাঁহার প্রাণ কাঁদিত, ব্রাহ্মণ কায়স্থ সকল জাতির নিকট যাঁহার প্রকৃত রাজোচিত সম্মান ছিল, আদালত ফৌজদারী যাঁহার মুখের কথায় মীমাংসা হইয়া যাইত, যাঁহার গৃহ দরিদ্রের মুষ্টিভিক্ষার জন্য অবারিত থাকিত, রাস্তা দিয়া যাতায়াত কালে যিনি দুহাতের সেলাম পাইতেন, আশীর্ব্বাদ পাইতেন উপাধির দরবার কল্পে রাজধানীতে বাস করিয়া তাঁহার বংশধরকে আজ লোক সম্মান প্রাপ্তির পরিবর্ত্তে সাহেবকে সম্মান করিতে প্যায়দাকে প্রতি নমস্কার দিতে ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে—দরিদ্র প্রজা ও অতিথির প্রাপ্য রাজধানীর বহু ব্যয় সাধ্য ভোজে ব্যয় করিতে হইতেছে। আজ তাঁহার ভদ্রাসন দীন হীন, দেবায়তন শ্রী ভ্রষ্ট, অতিথিশালা জনশূণ্য; উৎসব ও আনন্দের দিনে যেখানে মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া মনে হইত সেই উৎসব মণ্ডপ নাটমন্দির আজ পোড়ো বাড়ির মত হতশ্রী। বিজয়ার পর যে বৈঠকখানায় প্রীতি আলিঙ্গনের আগ্রহাতিশয্যে আনন্দ উছলিয়া উঠিত, আজ সেই বৈঠকখানা বন্ধ! এক একটি শ্রাদ্ধ ব্যাপার বা বিবাহোৎসবে যাহার বাড়ীতে যজ্ঞকাণ্ড উপস্থিত হইত, দেশের সমস্ত লোকের আহ্বান পড়িত, সমস্ত সামাজিক দেহ আনন্দের স্পন্দন অনুভব করিত, আজ রাজধানীর বিলাসভোগের মধ্যে তাঁহার সেই সুনাম গুটিকতক ইয়ার বন্ধুর নিমন্ত্রণ বিনিময়ের মধ্যে সঙ্কুচিত। যাঁহারা পিতৃপুরুষ দেবতা প্রতিষ্ঠা, ঠাকুরসেবা এবং বহুবিস্তৃত দীর্ঘিকাদি খনন দ্বারা প্রজা সাধারণের উপকার করিয়া পূণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাঁহাকে আজ সহরের কলের জলের জন্য, নাগরিক নাট্যশালা স্থাপনের জন্য ইংরাজ রাজপুরুষ বিশেষের স্মরণার্থ পাথরের পিণ্ডদান কার্য্যের জন্য কত রকম বেরকম চাঁদার খাতায় সহি দিয়া ধন্য হইতে হইতেছে। অথচ সেই খাতায় মুক্তহস্তে অঙ্কপাত করিয়াও তিনি শঙ্কিতনেত্রে বারংবার নিজের ভাগ্য বিধাতার ন্যায় রাজপুরুষের মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন।

উপাধি জিনিষটা আমাদের দেশে সকল সময়েই ছিল। হিন্দু মুসলমান আমলেও উপাধি দান প্রথা প্রচলিত ছিল। হিন্দুদের সময়ে উপযুক্ত পাত্রে উপযুক্ত কালে বিশেষ বিশেষ কার্য্যকলাপের পরিচায়ক ও সাহিত্যাদি বিষয়ের দক্ষতাবাচক উপাধিদানের ব্যবস্থা চলিয়া আসিয়াছে। মুসলমান সম্রাটগণ দেশের প্রকৃত রাজাদিগকে রাজযোগ্য উপাধিদানে ক্রটি করিতেন না। আজকালকার ভূমিশূণ্য ভূমিপাল, রাজ্যশূণ্য রাজা, রাজা বাহাদুর, মহারাজা, মহারাজা বাহাদুর তখনকার সময়ে দেখা যাইত না। মুসলমানের ফরমান পাইবার জন্য মোগল রাজধানী পর্যন্ত যাইয়া দরবার করা বিস্তৃত ভারতবর্ষের অনেক ধনবানেরও সামর্থ্যে কুলাইত না। আর ইংরেজ রাজা যেমন রাজ কর্ত্তব্যগুলি উপাধি—লোলুপদের অর্থে সারিয়া লইতে সচেষ্ট ,মোগল পাঠানদের সে ভাব সে দৃষ্টি মাত্রেই ছিল না, রাজকার্য্য রাজাই করিতেন। ইংরেজ সদাগর রাজা এদেশে আসিয়া যখন মোগল সম্রাট হইতে দেওয়ানি লইয়া পরে মোগল সম্রাটের বংশধরকে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করিয়া দিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন, তখন উপাধিদান কার্য্যটা স্বতঃই তাঁহাদের হইল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাহাদুর তখন উপাধির—দানসাগর করিতে বসিলেন, পাত্রাপাত্র

ভেদ নাই, নফরের পুত্র রাজা হইল, মনিবের পুত্র নফর হইলেন। সে কমিশরিয়টের মদের পিপার ভার পাইয়া টাকা অর্জ্জন করিল, ইংরেজ সদাগর রাজা তাহাকে ''রাজা'' উপাধি দিলেন। ইংরেজ সেপাইদের জন্য রাস্তা করিয়া দিয়া নীচ জাতীয় লোক উচ্চ উপাধি পাইল। নিজ সম্পত্তি বা প্রসার শস্যক্ষেত্র রক্ষা করিতে যাইয়া উচ্চ শ্রেণীর ভাগ্যবান্ পুরুষ অধম হইয়া পড়িলেন। সাহেবের মনসন্তুষ্টি করিতে যাইয়া কেহ কেহ সাহেবগণ যাঁহাদের দ্বারে কৃপা - প্রার্থী ছিলেন, তাঁহাদের মাথার উপর আসন পাইলেন। ইংরেজ রাজ—পুরুষের অপকীর্ত্তি কাহিনী প্রচার করিতেছেন বলিয়া যাঁহাকে সন্দেহ করা হইল তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিয়া তাঁহারা বধ—সাধনান্তে অনেকে ইংরেজের প্রীতি উৎপাদন করিলেন এবং প্রভুপ্রসাদে গ্রামের মোড়ল হইয়া বসিলেন। এই ত গেল মধ্যযুগের কথা। তারপর ভারতবর্ষের শাসন–ভার ১৮৫৮ সালে সদাগরদের হস্ত হইতে স্বয়ং মহারাণী গ্রহণ করিলেন, এই সময় হইতে বৎসরে দুইবার উপাধি প্রদানের অব্যবস্থা হইল—বর্ষা এবং শীত ঋতুতে উপাধির লিষ্টি বাহির হইতে লাগিল। সেই ব্যবস্থা এখনও চলিয়া আসিতেছে। বর্ষাকাল যদিচ বৎসরে একবারই উপস্থিত হইয়া থাকে, উপাধি—বর্ষা কিন্তু বৎসরে দুইবার ঘটে। এই দুইবারই কত লোককে যে আকাশপানে তাকাইয়া থাকিতে হয়, ইংরেজ দেবতার নিকট কত মানত করিতে হয়, ইংরেজ পুরোহিতের দ্বারা কত ইংরেজী যাগ—যজ্ঞ করাইতে হয়, ভুক্তভোগী ভিন্ন সেই অসাধ্য সাধনের তত্ব অপরে কি বুঝিবে?

একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত লেখকের আজও স্মরণ আছে। একবার পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণের উপলক্ষে আমাকে কোন ইংরেজ হাকিমের আতিথ্য গ্রহণ করিতে হয়। একদিন প্রাতঃকালের পর আমরা দুইজনে ফটো তুলিবার ইচ্ছায় বাহির হইব, বেশ পরিবর্ত্তনের জন্য নিজের কামরায় প্রবেশ করিয়া শুনিতে পাইলাম, সাহেবের আর্দ্দালির সঙ্গে কে যেন বাহিরে কথোপকথন করিতেছে,—লোকটি সাহেবের দেখা পাইবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। আর্দ্দালি সেই ব্যক্তির নামালঙ্কৃত তাসখণ্ড হস্তে লইয়া একটু মিঠে-কড়া ভাষায় এই সময়ে সাহেবের নিকট যাওয়ার অক্ষমতা বুঝাইবার বৃথা প্রয়াস পাইতেছিল। লোকটি যত বাধা পাইতেছে ততই ব্যগ্রভাবে পেয়াদাকে ''বাপধন'' প্রভৃতি ভাষায় তোষামোদ করিয়া, এমন কি হাতে কিছু দিয়াও, তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছে—কিন্তু পেয়াদা কিছুতেই সম্মত না হইয়া ক্রমশঃ সুর চড়াইয়া সাহেবের সঙ্গে দেখার সে সময় নহে, ইহাই বুঝাইতে লাগিল এবং বুধবার ১০টায় সময় সাহেব যখন সকলের সঙ্গে দেখা করিয়া থাকেন, সেই দিন তাহাকে আসিতে উপদেশ দিল। লোকটি কাতরভাবে বুঝাইতেছিল—বুধবার বড় ভিড়, এত জনতার মধ্যে তাহার কথা সাহেবকে বুঝাইয়া বলিবার সুবিধা হইবে না, আর তাহার বড় দরকারী কাজ, না বলিলে নয়, বড় জরুরী কাজ। পেয়াদাটা যেন আরও পাইয়া বসিল। বলিল জরুরি হউক আর নাই হউক, এখন সাহেবকে সে কিছুতেই এই তাস দিতে পারিবে না।

ভাঙ্গা হিন্দী এবং আলাপের ধরণেই বোঝা গেল, ব্যগ্র ব্যক্তিটি বঙ্গসন্তান। এমন সময় সাহেব প্রস্তুত হইয়া আমার সন্ধান করিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে বারান্দায় আসিয়া দেখি, একটি ষাট বছরের বৃদ্ধ বাঙ্গালী স্থূল কায়াটি চোগা চাপকানের দ্বারা যথাসাধ্য ঢাকিয়া সামলা মাথায় দন্ডায়মান। সাহেবকে দেখিয়া তিনি লম্বা চওড়া সেলাম ঠুকিলেন। সাহেব প্রতি নমস্কার পর্যন্ত ভুলিয়া বলিয়া উঠিলেন, ''কিহে Wardlee রায় বাহাদুর, তুমি মনস্থির করিয়াছ?'' ভদ্রলোকটি জোড়হাতে বলিলেন—''হুজুরের হুকুম পালন করিতে এ অধম সর্ব্বদা প্রস্তুত তবে এত অধিক মাত্রার হুকুমটি অধীনের উপর অসাধ্য ভারের মত চাপান হইয়াছে।'' সাহেব বলিলেন, ''বেশ, যখন ভার সহিতে পারিবে, তখন রায় বাহাদুরী পাইবে।'' এই বলিয়াই, টম্ টম্ প্রস্তুত ছিল, সাহেব রওনা হইয়া পড়িলেন। বৃদ্ধ মানুষটি পিছনে পিছনে ছুটিয়া সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া আমাদের সন্নিহিত হইতে অশক্ত হইলেন এবং ফ্যাল ফ্যাল করিয়া ছুটন্ত টম্টমের পানে তাকাইয়া রহিলেন। সাহেব আমাকে বলিলেন, ইনি একজন ধনবান ব্যক্তি। পূর্বে উকিল ছিলেন, মক্কেল ঠকাইয়া জমিদারী নিলামে উঠাইয়া স্বয়ং সস্তাদরে কিনিয়া বেশ অর্থসঞ্চয় করিয়াছেন। সহরে অনেকগুলি বাড়ীই ইঁহার, এমন কি, সাহেব তাঁহারই ভাড়াটিয়া। কুকর্ম্মে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, তবুও অভাব হয় নাই, সৎকর্ম্মের জন্য ইঁহার নিকট হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করা সাহেবের ইচ্ছা। নগরের টাউন্ হলটি তাহারই প্রদত্ত ত্রিশ হাজার টাকায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক্ষণে লোকটি উপাধির জন্য বড় ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন। সাহেবের পূর্ব্ববর্ত্তী হাকিম সুপারিশ করিয়া গিয়াছিলেন,

সে আজ আট বৎসরের কথা। এবার এই সাহেবের অভিপ্রায় জানিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের চিঠি আসিয়াছে, এ ব্যক্তিকে ''রায় বাহাদুর'' উপাধি দেওয়ার পক্ষে তাঁহার মত কি? সাহেব সময় বুঝিয়া তাঁহার নিকট সাহেবদের ক্লাবের জন্য একটা বিলিয়ার্ড টেবিল চাহিয়া বসিয়াছেন; টেবিলটি পাইলে আর তাঁহার জন্য সুপারিস করিতে কোন আপত্তি থাকিবে না। কিন্তু লোকটা বড় কঞ্জুস,—কিছুতেই টাকার মায়া ছাড়িতে পারেন না, হাজার টাকা দিতে কষ্ট বোধ করিয়া কেমন থতমত করিতেছেন। শুনিয়া আমি অবাক্ হইয়া গেলাম। ইংরেজের ক্লাবে বিলিয়ার্ড টেবিলের দরকার,—যে ক্লাবে শুধু বাঙ্গালী কেন, কোন দেশীয় লোকেরই প্রবেশাধিকার নাই, এমন কি সাহেবের বিশেষ অনুরোধেও যে ক্লাবে যাইতে আমি দ্বিধা বোধ করিয়াছি, সেই ক্লাবের জন্য একটি বাঙালির নিকট হইতে ৬ হাজার টাকা আদায় করিতে সাহেবের বিশেষ অনুরোধেও যে ক্লাবে যাইতে আমি দ্বিধা বোধ করিয়াছি, সেই ক্লাবের জন্য একটি বাঙালির নিকট হইতে ৬ হাজার টাকা আদায় করিতে সাহেবের লজ্জা হওয়া দূরের কথা, বরং একটা স্পর্দ্ধার ভাবই প্রকাশ পাইতেছিল। আমি তাঁহাকে এই কথা বুঝাইতে গেলে তিনি উত্তরে বলিলেন, ''যে ব্যক্তি অকার্য্যে অর্থ ব্যয় করিতে পারে, পিতৃশ্রাদ্ধে অর্থব্যয়ের ভয়ে হিঁদুয়ানি ছাড়িয়া উপধর্ম্মের দোহাই দিয়া অর্থরক্ষা করিয়াছে, ইংরেজ রাজার নিকট উপাধি প্রাপ্তির জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিতে কাতর হয় নাই, একটি ইংরেজ ক্লাবে ছ হাজার দিলে সে ব্যক্তির পক্ষে অর্থের বরং একটা সার্থকতা হয়। পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে গেলে ইঁহাকে অন্তত আরও দশগুণ অর্থ ব্যয় করিতে হইত।'' আমি নিজেকে ধিক্কার দিয়া এই প্রসঙ্গে আলাপ বন্ধ করিলাম, কিন্তু বিধি—বিড়ম্বনায় আমাকে আর এক নতুন বিপদে পড়িতে হইল। জানি না, কি উপায়ে সেই উপাধি—পাগলা বৃদ্ধটি আমার খবর পান, আর আমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য অতিমাত্রায় বিনয়পূর্ণ একখানি পত্র লিখিয়া পাঠান। আমি তাহার প্রতিষ্ঠিত টাউনহলের পুস্তকাগারে যাইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে স্বীকার করিলাম। যথাসময়ে তাঁহার দেখা পাইলাম। আমাকে লইয়া তিনি সাধারণ পুস্তকাগারের হলে গিয়া প্রথমতঃ ভিত্তিগাত্রে সংবদ্ধ প্রস্তর ফলকে তাঁহার দানকাণ্ড বিবৃতিখানি দেখাইলেন—সাহেবদের সঙ্গে একত্র তাঁহার ফটো তোলা হইয়াছে, তৎপ্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলেন। ৩০ বৎসর কাল সেই স্থানে আছেন, কত সাহেব—সুবা তাঁহাকে কত প্রকারে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, তাহার কুর্‌চিনামা আওড়াইলেন, ছোটলাটগণের মধ্যে কাহাকে ম্যাজিষ্ট্রেট অবস্থায় ব্যবসায়ঘটিত ব্যাপারে জব্দ করিয়াছিলেন, কোন্ ছোটলাট—Belvedere এ তাঁহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া তাঁহাকে ধন্য করিয়াছেন ইত্যাদি নানা প্রকার প্রসঙ্গের বাহাদুরী দ্বারা রায় বাহাদুরীর পূর্ব্বাভাষ দিতে লাগিলেন। তৎপরে যখন পুস্তকাগার পরিদর্শন ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম, তখন সেখানে যাইবার দরকার নাই বলিয়া আগ্রহ সহকারে তিনি নিষেধ করিতে লাগিলেন। বলিলেন এখানে কোন ভাল কেতাব বা কাগজ রাখা হয় না, আর যে সকল খবরের কাগজ লওয়া হয়, তাহাও সাহেবদেরই ব্যবহারে সর্বাগ্রে লাগিয়া থাকে ৩/৪ দিন পরে দেশের লোকেরা প্রসাদ পান। এই জন্য তিনি মাসিক ২ টাকা চাঁদা দেওয়া অর্থের অপব্যবহার এমন কি, পাপ মনে করিয়া বন্ধ করিয়াছেন, সেই অবধি সে কাম্‌রায় পদধুলি পর্য্যন্ত দেন নাই। লোকটি দাম্ভিকতার সহিত বলিলেন ''কি বলেন মশায়, আমরা পয়সা দেব আর কাগজ পড়বেন ওঁরা।'' —তারপর শুনিলাম, দুকথাই সত্য। তিনি মাসে মাসে চাঁদা দিতেন না, —এজন্য ঢের বাকীর দায়ে তাঁহার নাম কাটিয়ে দেওয়া হইয়াছে, আর সাহেবরা নিজেদের কাগজ লওয়া বন্ধ করিয়া দিয়া এখানকার কাগজ লইয়া যান্ এজন্য দেশীয় অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি পুস্তকাগারের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছেন। গুটিকতক খোসামুদে লোক—তাহার মধ্যে অশিক্ষিত ধনীর সংখ্যাই অধিক, চাঁদা দিয়া কাগজ জোগাইতেছে। তাহাদের লাভ কমিটির অধিবেশনের সময় সাহেবকে সেলাম দিতে পারে ও এক কুর্‌ছিতে বসিবার অধিকার পায়।

রায় বাহাদুর উপাধির জন্য তাহার এত অধিক আগ্রহ কেন প্রসঙ্গক্রমে যখন এ প্রশ্ন উঠিল তখন বৃদ্ধ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—''আমার বাড়ী অমুক স্থানে, সেখানে আমাদের শত্রু পক্ষ একজন রায় বাহাদুর হইয়াছেন, তাঁর বাহাদুরীতে আমরা সবংশে নীচু হইয়া আছি। তাই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, রায় বাহাদুর না হইলে দেশের আর মুখ দেখাইব না। এমন কি গৃহিনীর এত মনোদুঃখ যে রায় বাহাদুর পত্নী না হইলে তিনি দেশের নামটি পর্যন্ত শুনিতে ইচ্ছা করেন না। প্রতিপক্ষ ব্যক্তিটি গভর্ণমেন্টের চাকুরী করিয়া ''রায় বাহাদুর'' হইয়াছে, তাঁহাকে টাকা খরচ করিতে হয় নাই। মাত্র ৮০০/—টাকা নজর দিয়া খেলাৎ লইয়াছেন। আমার কিন্তু টাউন্ হলে নির্ম্মাণের জন্য ৩০ হাজার টাকা এবং ছোট বড় নানাকার্য্যে আরও তিন হাজার টাকা দিয়াও অব্যাহতি

হইল না।”

উপাধিলোলুপতা আমাদের দেশে বৃদ্ধি পাইবার একমাত্র কারণ দশজনের কাছে বেশ যশঃ ও সম্মান সম্ভ্রম লাভের আশা কিন্তু আমরা দেখিতেছি তাহার বিপরীত। মনে করুন একজন, টাকার জোরে রাজা হইলেন। গভর্ণমেন্ট ‘‘রাজা” উপাধি র্সব্বত্রই ব্যক্তিগতভাবে জীবদ্দশাকালে পর্য্যন্ত দান করেন। কাজেই বংশধরেরা ‘‘যে তিমিরে”—‘‘সেই তিমিরে’ই পড়িয়া থাকেন। যিনি রাজা হইলেন, তাঁহার পত্নী ‘‘রাণী” হইলেন না; ব্যাকরণ শাস্ত্রে এরূপ প্রথা অসিদ্ধ হইলেও, ইহা আধুনিক রাজ—ব্যবহার সম্মত বটে।

‘‘রাজার” পুত্র স্বয়ং ‘‘কুমার” নাম ব্যবহার করিতে পারেন বটে, কিন্তু সরকার বাহাদুর তাঁহাকে ‘‘বাবু” নামেই অভিহিত করিবেন। লাভের মধ্যে এই হয় যে, এই রাজাগিরি রাখিতে যাইয়া পরাণুকরণবৃত্তি অসামান্যরূপে বাড়িয়া উঠে এবং তাহাতে উপাধিধারীকে একেবারে বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়। একটি অসংলগ্ন রাজচিহ্ন—কল্পিত coat of arms গাড়ীতে রাখিতে হইবে। একটা রৌপ্য নির্ম্মিত ছোটাসহ চোবদার কোচ্ বাক্সে না রাখিলে রাজার গাড়ী বলিয়া লোক সম্মান না—ও করিতে পারে। ঘোড়ার ওষ্ঠে পৃষ্ঠে ললাটে কল্পিট রাজচিহ্ন, না হইলে মানাইবে না। এই সকল কল্পিত উপায়ে নিজ সম্মান রক্ষা করিতে রাজাটির প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া পড়ে। ছোটলাটের উদ্যান—সম্মিলনীর শোভার্থ ইঁহাদের উপস্থিতি প্রয়োজনীয়, কিন্তু লাট বা ছোটলাট তাঁহাদিগকে চিনিবেন না। একদিন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম একজন ‘‘রাজা” ছোটলাটের উদ্যান—সম্মিলনীতে কোন রাজপুরুষের নিকট হইতে প্রতি নমস্কার আদায়ের লোভে সেলাম ঠুকিবার জন্য আশেপাশে ঘুরিতেছিলেন। সাহেবটি একজন সেক্রেটারী, সঙ্গে মেম ছিলেন; কিন্তু রাজাটি যত অগ্রসর হইতেছেন সাহেবটি যেন তাঁহাকে দেখিতে পান নাই, এইভাবে ততই চলিয়া যাইতেছেন। রাজা নাছোড়বান্দা, আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না; সম্মুখে যাইয়া হাতখানি বাড়াইয়া দিলেন বটে; কিন্তু সাহেব “Good morning Raja, how do you do?’’ বলিয়া চলিয়া গেলেন। মেমটি রাজার বেশভূষা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “Who is this living Cushion?’’ সাহেবের উত্তর শুনিতে আর রুচি হইল না—আমি সরিয়া পড়িলাম। ভাবিতে লাগিলাম, এই সকল লোক কি গণ্ডার—চর্ম্মে নির্ম্মিত ! লোকটি ৫০/৫৫ বৎসর বয়স্ক, মাথায় শল্মার পাগড়ী, গলায় মতির মালা, বক্ষে একটি হীরকের নক্ষত্র, কানে তাহার দুলগুলি ঝুলিতেছিল। গায়ে বড় বড় পুষ্প পল্লবে চিত্রিত ফরাসী সাটিন বস্ত্রের চোগা। এমন কৌতুহলোদ্দীপক হাস্যরসাত্মক সজ্জা লইয়া রাজা নাম ফলাইবার দরকার কি?

এদিকে মহারাজা বাহাদুরগণকে আত্মসম্মান রক্ষা করিতে যে কতরকমে নাকাল হইতে হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। ‘‘মহারাজা ‘বা’ মহারাজা বাহাদুর দুই একটি বংশ ব্যাতীত বাঙ্গালার সর্বত্রই ব্যক্তিগত উপাধি। কিন্তু সম্মান আদায় করিবার বেলায় দেখা যায় ভারতীয় স্বাধীন নৃপতিবৃন্দের প্রাপ্য সম্মান ইঁহারা অকুণ্ঠিতভাবে প্রত্যাশা করিয়া থাকেন এবং তাহা না পাইলে ক্ষুন্ন হন; এমন কি, কাহারও নিকট হইতে সে সম্মান আদায় করিতে না পারিলে তাহার সহিত বিবাদ পর্য্যন্ত করিতে প্রস্তুত হন। দুই একটা দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। যথা—His Highness এই দুইটী (H.H) তাঁহাদের অনেকেই নিজের নামের উপর ব্যবহার করিতে লালায়িত। কিন্তু গবর্ণমেন্ট হইতে তাহা পাইবার কোন উপায় নাই। কারণ, এই সম্মান শুধু ১১ তোপপ্রাপ্ত স্বাধীন নৃপতিগণেরই লভ্য, ইহার ন্যূন তোপের স্বাধীন রাজাদেরও ইহা প্রাপ্য নহে। অথচ H.H. The Maharaja Bahadur স্বার্থান্বেষী খবরের কাগজের সংবাদদাতা ও সম্পাদক বিশেষের নিকট প্রাপ্ত হইয়া আমাদের জমিদার মহারাজাগণ ইহা সর্বত্র আদায় করিতে ব্যগ্র। অপ্রাপ্য বিষয়ে আকাঙ্খা বালকদের পক্ষে মার্জ্জনীয় হইতে পারে, কিন্তু প্রৌঢ় বা বৃদ্ধের পক্ষে এই লোভ অতি কুৎসিত দেখায়। তাঁহারা কি এই কথাটি মনে করিতে পারেন না। গবর্ণমেন্ট হইতে তাঁহারা যে উপাধি সংগ্রহ করিয়াছেন বা পাইয়াছেন, সেই গবর্ণমেন্ট যেভাবে তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ করিতে অনিচ্ছুক, দেশের লোক হইতে তাঁহারা তাহা কোন্মুখে প্রত্যাশা করেন? সেদিন একটি মার্কিণদেশীয় ফটোগ্রাফার আসিয়া আমার নিকট উপস্থিত। তিনি দেশীয় রাজাদের একখানি সচিত্র জীবনী প্রকাশ করিবেন। তালিকায় দেখিতে পাইলাম, উপাধিপ্রাপ্ত রাজা ও মহারাজাদের নামের সংখ্যা অতিরিক্ত। আমি তাঁহাকে এ কথা বলাতে লোকটি অনায়াসে বলিয়া ফেলিল, ‘‘মহাশয়, নামের পাশে কোন্ রাজা কতগুলি কেতাব লইতেছেন, তাহা দেখিয়া আমাকে উপদেশ দিবেন।” তখন দেখিলাম, যথার্থ রাজারা যেখানে ২/৫ খানার জন্য সহি দিয়াছেন, জমিদার

রাজারা সেই স্থলে ২০/৩০ এমন কি ৫০ খানার ও অধিক পুস্তক ক্রয় করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। মার্কিণ ছবিওয়ালা হাসিয়া বলিলেন "Good for trade, is not it"? আমি বিদায়কালে তাঁহাকে বলিলাম, ''এরূপ পুস্তক ক্রয় করিবার আমাদের দরকার নাই"। সেও ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া উত্তর দিল, '' কিন্তু তোমার প্রতিবাসীরা তাহাদের নিজেদের দরকার তোমা অপেক্ষা অধিক জানে" এই পুস্তক অবশ্য প্রকাশিত হইবে, আর কল্পিত H.H উপাধিভূষিত জমিদার রাজা মহারাজাগণের মোসাহেবেরা ছবিওয়ালার সুখ্যাতি করিয়া প্রভু মনোরঞ্জনে নিযুক্ত হইবেন।

এদিকে ইঁহাদের অনেকেই দেশের কার্য্যে সাহায্যদানের প্রয়োজন হইলে একেবারে বদ্ধমুষ্টি হইয়া পড়েন। রাজপুরুষদের অনুরোধে কোন গ্রন্থকারের অনাবশ্যক পুস্তক ক্রয় করিতে হয়ত তাঁহারা সহস্র সহস্র মুদ্রা দান করিতেছেন, কিন্তু যদি কোন সৎকার্য্যের জন্য অর্থ সাহায্য চাহিয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হওয়া যায়, তবে ইংরেজদের নাম সেই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট না দেখিলে সাহায্যদান করিতে তাঁহাদের ভয় হয়; এমনও দেখা গিয়াছে, গোপনে লোক নিযুক্ত করিয়া জানিতে চেষ্টা পান—কোন্ কার্য্যে অর্থ সাহায্য দিলে সাহেব রাজপুরুষেরা প্রীত হইবেন। উপাধি—বিজ্ঞান বহু বিচিত্র, ইহার কয়েক পৃষ্ঠা উদঘাটন করিতে চেষ্টা করা গেল মাত্র। আজকাল উপাধির একটা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। লর্ড কার্জ্জন ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া যখন এই সকল অসঙ্গত উপাধির অতিমাত্রায় ছড়াছড়ি দেখিতে পাইলেন; তিনি তখন সাম্‌লাইতে বসিলেন। তাঁহার কালে নূতন রাজা মহারাজার সৃষ্টি এখন একেবারে দুর্লভ দর্শন হইয়াছে। ইহার ফলে কোন ব্যক্তিবিশেষের বা বংশের মনঃকষ্টের কারণ উপস্থিত হইলেও মোটের উপর উপকার হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। দিল্লি দরবারের বহু অর্থ ব্যয়ের অন্ততঃ একটা সার্থকতা দেখা গিয়াছিল ; উপাধিভূষিত রাজা মহারাজা, মহারাজা বাহাদুর, মহারাজাধিরাজগণের সঙ্গে অতি সামান্য দেশীয় স্বাধীন নৃপতিগণেরও কতটা প্রভেদ, তাহা জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিয়াছিল। এই রাজসূয় যজ্ঞে তাহারা কে? মণিমাণিক্য সুশোভিত উপাধিপ্রাপ্ত রাজা এবং উপাধিশূন্য লোকদের মধ্যে কোনরূপ প্রভেদ ছিল না বলিলেই হয়। দেশীয় নৃপতিগণের জন্য যে সৈনিক সম্মান, যে অভ্যর্থনা যে আসন নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহার সঙ্গে স্বীয় অবস্থার তুলনা করিয়া আমাদের উপাধিগ্রস্ত রাজারা কি মনে করিয়াছিলেন, জানি না—কিন্তু দর্শক মাত্রকেই একথা স্বীকার করিতে হইয়াছিল—

''তথাপি কাকো ন চ রাজহংসঃ ।"

এ সকল দেখিয়া শুনিয়াও যদি আমাদের মোহ ভঙ্গ না হয়, পদমর্য্যাদা রক্ষা করিতে যাইয়া পদে পদে অপদস্থ হইতে হয়, শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তিকে বরণ করিয়া লইতে হয় তবে আর কি বলিবার আছে? চাণক্য বলিয়াছেন—''স্বদেশে পূজ্যতে রাজা"—স্বদেশের নিকট যিনি পূজা পাইবেন, তিনিই প্রকৃত রাজা। নতুবা রাজা উপাধি সরকার বাহাদুর দিলেও সেটা ব্যাধি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। কোন ইংরেজ রাজপুরুষ একজন দেশীয় স্বাধীন রাজাকে ''মহারাজা উপাধি দিবার প্রস্তাব করিলে, রাজা বলিয়াছিলেন —''দেখুন, আমি আমার রাজ্যের King, আমাকে ভারত সম্রাট্, বাবু ঠাকুর, রাজা যে নামেই অভিহিত করিয়া সম্মানিত করুন না, আমার প্রজাদের নিকট তাহাতে আমার প্রতিপত্তি একরূপই থাকিবে—আমি তাহাদের দন্ডমুন্ডের কর্ত্তা চিরকালই থাকিব। অতএব আমাকে এমন সম্মান দিবেন না, যাহা আমার বংশ হইতে আবার উঠাইয়া লওয়া যাইতে পারে। আমি ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার একজন ভক্ত, বিশ্বস্ত বন্ধু; তাঁহার সাম্রাজ্যশ্রী কুশলে থাকিলেই আমাদের সম্মানও অক্ষুণ্ণ থাকিবে।" ইংরেজ রাজপুরুষ আশা করিয়াছিলেন, রাজা না জানি কত উৎফুল্ল হইবেন। কিন্তু এরূপ অভিনব উত্তর শুনিয়া তিনি ক্ষণকালে বিস্মিত হইলেন এবং বলিয়া উঠিলেন—''সাচ্ বাত হ্যায় রাজা সাহেব্, সাচ্ বাত্"।—উপস্থিত ভদ্রমন্ডলীর সম্মুখে প্রকাশ্যভাবে রাজার এই উক্তিতে রাজপুরুষের বিরক্তি ঘটিবারই আশঙ্কা ছিল, কিন্তু পরে রাজার জনৈক ইংরেজ বন্ধুর মুখে শোনা গেল, রাজপুরুষটি রাজার এই উক্তিতে এতদূর পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন যে তিনি ইংরেজ মহলে একথা উত্থাপন করিয়া বলিয়াছিলেন রাজাটির মত যদি দেশীয় ভদ্র সাধারণের সুবুদ্ধি হইত, তবে উপাধিলোলুপতা এদেশে দেখা যাইত না। ইহার পর হইতে উক্ত রাজপুরুষের সহিত রাজার এমনই ভাব হইয়া গিয়াছিল এবং রাজার প্রতি তাঁহার এতই শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল যে, রাজ্যসংক্রান্ত কতকগুলি গুরুতর রাজনৈতিক বিষয়ে রাজপুরুষ কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করিয়া রাজার প্রতিই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়াছিলেন। তাহাতে সেই সকল জটিল বিষয়ের অতি সহজ সুমীমাংসা হইয়া গিয়াছিল। উপাধিলোলুপ ব্যক্তিগণকে রাজার উক্তিটি স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করিয়া এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করা যাইতেছে।

দেশীয় রাজ্যের বর্ত্তমান সমস্যা

দেশীয় রাজ্যের ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান যুগে এক বিরাট আন্দোলনের মধ্যে দুলিতেছে দেখিতেছি। Montford Reform এর ফলে ব্রিটীশ ভারতে স্বরাজ লাভের যে চাঞ্চল্য লক্ষিত হয় তাহার স্পন্দন ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির অন্তরেও সেইরূপ অনুভূতির সঞ্চার করিতেছে। বিদেশীয় রাষ্ট্রনৈতিকগণ কেহ কেহ মনে করেন, ইংরাজশক্তি সমস্ত ভারতবর্ষকে শক্তিমান দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে বন্টন করিয়া দিয়া ব্রিটীশ স্বার্থরক্ষার্থে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিয়া সরিয়া পড়িলেই তাহারা মুস্কিলের আসান পাইবেন। অপরদিকে দেশীয়রাজ্যের কতিপয় শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং তাহাদের প্রতি সহানুভূতিশীল স্বরাজী বঞ্চনা যাহাতে দেশীয় রাজ্যে প্রজাতন্ত্র শাসন প্রবর্ত্তিত হয় তজ্জন্য ব্রিটীশ গভর্ণমেন্টকে অনুরোধ উপরোধ এমন কি অনুযোগ করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা অত্যন্ত গরমপন্থী তাঁহারা একেবারেই এই সব দেশীয় রাজমুকুটগুলিকে melting pot এ ফেলিয়া গালাইয়া ভিতর বাহির সমান করিয়া সমগ্র ভারতকে এক শাসন প্রণালীর বন্ধনে বাঁধিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। ভিতর বাহির সমান করিবার চেষ্টায় দেশীয় রাষ্ট্রাবণ্ঠনের আড়ালে যে অতীত যুগের জাতীয় লক্ষ্মী কোনমতে মুখ ঢাকিয়া রহিয়াছেন, সেই আবরণ মোচন করিয়া লক্ষ্মীকে অলক্ষ্মী বলিয়া তাড়াইয়া ব্রিটীশ ভারতে নবলব্ধ স্বরাজ বনাম স্বায়ত্বশাসনের পাকা সড়ক সরাসর দেশীয় রাজ্যের বুকের উপর দিয়া চালানই যুক্তিসঙ্গত মনে করেন। দাক্ষিণাত্য গুজরাট প্রভৃতি স্থানে দেশীয়রাজ্যের প্রজাসম্মিলনগুলি বারংবার ব্রিটীশশক্তির নিকট এই আবেদন জানাইতেছেন যে তাঁহারা যেন দেশীয়রাজ্যে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ সুবিধা করিয়া দেন অথবা এই সব দেশীয় রাজ্যের সীমা রেখাগুলি মানচিত্র হইতে মুছিয়া দিয়া সমগ্র ভারতের মানচিত্রটিকে ব্রিটীশ লালে এক রঙ্গা করিয়া তোলেন। ব্যাপার মন্দ নয়! দেশীয় নৃপতির দোষ কি? কি হেতু বর্ত্তমান স্বদেশ স্বরাজ উন্মাদনার দিনে সেই নৃপতিরা ইংরেজ হইতেও অধিকতর political untouchable হইতে বসিয়াছেন? মহাত্মা গান্ধী ইংরেজ শক্তিকে দেশের প্রতিকূল ভাবিয়া ইহার সহিত যুঝিবার ব্যবস্থা করিলেন, Non-co-operation, বর্ত্তমানে দেখিতেছি ইংরেজও co-operation পাত্র নির্বাচিত হইতে পারিতেছেন এবং ইহাকে পক্ষ করিয়া নব ননকো-অপারেশনের অভিনয় চলিবে দেশীয় নৃপতির সহিত! ইহার কারণ আছে;—দেশীয় নৃপতির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আছে। তাহারা আদুরে দুলাল, আপনাদের আমোদ প্রমোদে আহ্লাদে আটখানা, প্রজার অর্থে আপনার রাজভোগ জোগান রিপুচরিতার্থতায় জীবনের আয়ু ক্ষয় করেন, বিলাতে, ইয়ুরোপে, দেশে, ইহাদের অনেকের জীবন, ইন্দ্রিয় শিকারে রং তামাসায় রঙীন তাসেরই মত। মানুষ খেলিতে পারে, যখন পেটে অন্ন থাকে, কিন্তু অন্নহীন বসনভূষণক্লিষ্ট প্রজারা এইসব রঙীন তাসের খেলা ভারতে আর কতকাল চলিতে দিতে পারে। এসব সত্য কথা; রাজাদের মধ্যে যে অনেকেই কর্ত্তব্যদায়িত্ববুদ্ধি বিবর্জিত এ সম্বন্ধে খুব নজিরের প্রয়োজন নাই। এ অবস্থার কারণ অনুসন্ধানে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ভারতীয় আদর্শ বিবর্জ্জিত শিক্ষা বা অশিক্ষার ফলেই রাজাদের এরূপ দুর্গতি। সাধারণতঃ বেকার অর্ধশিক্ষিত "British military officer এর হাতে গভর্ণমেন্ট নাবালক রাজাদের শিক্ষার ভার অর্পণ করিয়া থাকেন। ভাগ্যগুণে কেহ কেহ ভাল লোকের হাতে পড়িয়া থাকেন নচেৎ অধিকাংশ স্থলে ইংরাজ চরিত্রের মন্দের ভাগ নকল করাতেই তাহাদের শিক্ষার অবসান হয়। ফলে ইন্দ্রিয় চরিতার্থকর এবং ইংরাজ সেবায় রাজকোষের অর্থ ধ্বংশ করিয়া কেহ কেহ উচ্চ রাজসম্মানে ভূষিত হইতেও দেখিয়াছি।

অপর দিকে সাধারণতঃ ব্রিটিশ সার্ভিস হইতে পেন্‌সনপ্রাপ্ত বাহিরের লোকের উপর রাজকার্য্যভার অর্পণ করিয়া রাজারা স্বদেশে অথবা ইয়োরোপে বিলাসব্যসনের চর্চ্চা জীবনের মূল্যবান সময়গুলি কাটাইয়া দেন। এদিকে পেন্‌সনপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি পেনসনের উপর মোটা মাহিয়ানার থলিটি আঁকড়াইয়া রাজার বিলাসের ইন্ধন যোগাইতে থাকেন। ''রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল চুলায় যাক্, আমার চাকুরী বজায় থাকুক''। মন্ত্রীর কার্য্য রাজাকে সুমন্ত্রণা দেওয়া। তদপেক্ষা এসব শ্রেণীর কর্মচারীগণ জানেন, 'Your most obedient servant' হওয়াই স্বার্থ এবং অর্থ রক্ষার সুপ্রশস্ত পথ। এখন প্রশ্ন উঠিতেছে পূর্বোক্ত নব সম্প্রদায় দেশীয় রাজ্যের উচ্ছেদ সাধনার্থ যে পথ খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন এবং তদনুযায়ী যাঁহারা উদ্যোগী হইয়াছেন, এপথে তাঁহাদের পক্ষে কি পৌরুষের পরিচয় আছে? ইহাতে নৈপুণ্যের অতিমাত্রায় অভাব এবং পুরুষত্ব তিল পরিমাণও ব্যক্ত নহে। একদল বিজিত ব্যক্তি আপনাদের জাতীয় নৃপতিদের ক্ষমতা হ্রাসের জন্য সেই বিজেতার শিবিরে প্রার্থনা করিতে যাইতেছেন ইহাতে কি পুরুষকার আছে, না ইহা আত্মাবমাননার শোভন সংস্করণ। মহাত্মা গান্ধী ইংরেজের হাত হইতে স্বরাজ পাইতে মননশীল হয়েন নাই, তিনি জানেন আত্মাকে লঘু করিতে নাই ভাগ্যদোষে যদিবা পরাজিত হইয়াছি যদি আত্মোন্নতি চাই, ইংরেজের নিকট আবেদন করিয়া তাহা পাওয়া যাইবে না। পাইবার পথ রহিয়াছে নিজের আত্মার শক্তিতে। সে শক্তি বাড়াইতে হইবে; সেইজন্য প্রথম সূত্র করিলেন ''অসহযোগ'' অর্থাৎ ইংরেজ হইতে দশহাত দূরে থাকিবে। ভিখারীর মত তাঁহাদের পাঘেষা হইলে কিছুই মিলিবে না। বীরের মত শক্তি সঞ্চয় কর, স্বরাজ আপনি আসিবে কিন্তু নব সম্প্রদায়ের প্রস্তাবনায় বীরত্বের আভাস নাই, স্ফুলিঙ্গ নাই, তাঁহারা ইংরেজের কাঁধে এ দায়িত্ব চাপাইয়াই খালাস।

ইহা স্বীকার্য্য যে দেশীয় নৃপতিরা প্রাচীন ভারতের বিরাট আদর্শের অনুপাতে পর্ব্বতের নিকট বল্মীকস্তূপ বিশেষ। এই বলিয়া রাতারাতি তাহাদিগকে আবর্জ্জনার মত ঝাটাইয়া দিয়া ব্রিটীশ শাসনের লাল ফিতা দিয়া দেশীয় রাজ্যগুলিকে শক্ত করিয়া বাঁধিলেই যে সিদ্ধিলাভ ঘটিল এমন ত কখনও মনে হয় না। ইংরেজই যে আমাদের সিদ্ধিদাতা গণেশ এমন কথা অষ্টাদশ পুরাণে খুব সম্ভব মিলে না। সুতরাং ইংরেজী ছাঁচে দেশীয়রাজ্যগুলি ঢালাই হইলে অতীতের সভ্যতার যে ফটোগ্রাফটী অত্যন্ত বিবর্ণ হইয়াও এতদিন সজীব ছিল তাহার অস্তিত্বেরও বিলোপ ঘটিবে। বর্ত্তমান ব্রিটীশ ভারতে স্বরাজ—সূর্য্য মানসলোকে, স্বপ্নলোকে আর চাক্ষুষ, বক্তৃতামঞ্চে; এ সূর্য্য উদিত হইবে কিনা বিবেচ্য, হইলেই বা কিরূপে হইবে ইহাও সমস্যার বিষয়। কিন্তু ইহার জন্য কত না আন্দোলন হইল, কত না জীবন উৎসর্গীকৃত হইল। ফলে কোম্পানীর আমল হইতে এ পর্য্যন্ত ব্যক্তিগত পদপ্রাপ্তি ভিন্ন জাতীয় ক্ষমতার নাড়ীজ্ঞান তিল পরিমাণেও হইয়াছে বলিয়া মনে করি না। জাতির মৃত নাড়ীতে জীবিতের ঈষৎ স্পন্দন কেহ কখনও পাইয়াছে বলিয়া ত মনে হয় না। আর এদিকে এতগুলি দেশীয় রাজ্য বিপুল অর্থ-ভান্ডার লইয়া ব্রিটীশ রাজকোষের বাহিরে রহিয়াছে, এত এত জনসঙ্ঘ দেশীয়রাষ্ট্রে রহিয়াছে তাহাদিগকে শিক্ষিত করা তাহাদিগকে বর্ত্তমান কালোপযোগী আদর্শে গঠিত করা কোন নেতারই ত জীবনের লক্ষ্য বলিয়া পরিদৃষ্ট হইতেছে না। যে রাজ্যের প্রজামন্ডলীর চক্ষু, শিক্ষার প্রভাবে ফুটিবে, সে রাজ্যের রাজা কতকাল ব্যভিচারে রত থাকিবে? প্রাচীন ভারতের আদর্শ রামরাজত্বে শুধু রামকে লইয়াই যে হইয়াছিল এমত নহে প্রজামন্ডলী ধর্ম শিক্ষায় উচ্চতরে আরোহণ করিয়াছিল। দেশীয় রাজ্যে প্রজাসাধারণের যত শিক্ষায় অগ্রসর হইবে ততই রাজার শ্রীবৃদ্ধি ঘটিবে। বর্ত্তমানে সকলের ইচ্ছা রাজাটী হউক যেন রাজর্ষি জনক, তবেই সকল দুঃখের অবসান হয়। বৃটীশ ভারতে স্বরাজ পাইতে যত আয়োজন দরকার তাহার কিয়ৎ পরিমাণও যদি দেশীয় রাজ্যে প্রজার হিতার্থে নেতারা জীবন উৎসর্গ করেন তবে দেশীয় রাজ্যে খাঁটী স্বরাজ আশা করা যায় এবং ইহার দ্বারা ব্রিটীশ ভারতের স্বরাজও সুলভ হইতে পারে।

ভারতের স্বরাজ সমস্যার চাবি স্বরূপ এই দেশীয় রাজ্যগুলি রহিয়াছে ইহাদের প্রতি দেশের যে পরিমাণ দৃষ্টির প্রয়োজন তাহা নাই বলিয়াই আমরা সেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। দেশীয় রাজ্যগুলি, পূর্বেই বলিয়াছি, এখনও ভারতের গৌরবস্থল, —ভারতের নিজস্ব জিনিষ। সেইগুলিকে ইংরেজের রাজত্ব পরিবর্দ্ধনে ইংরেজ উদ্যোগী না হইলেও ভারতবাসীই সেই উদ্যোগ যোগাইবার জন্য নূতন চিন্তার পথ বাহির করিতে পারিয়াছেন। পূর্ব প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি যদিও বহুপূর্বে লিখিত হইয়াছে এই সব সমস্যা সম্পর্কে কতক আলোচনা করিয়াছি। আজীবন ত্রিপুরারাজ্য এবং রাজার সেবার ফলে কতিপয় দেশীয় রাজ্যের

আভ্যন্তরিক অবস্থা জানিবার সুযোগ জীবনে ঘটিয়াছে। ব্রিটীশ গবর্ণমেন্টরূপী বিরাট হৃদয়বিহীনযন্ত্রে এ পর্য্যন্ত আশানুরূপ সমাজ—দেশ—লোকহিতকর অনুষ্ঠান সৃষ্ট হইতে পারে নাই। কেবল রিফর্মের ভূয়া আশায় কতিপয় দেশীয় রাজ্যের প্রজাগণও সেইরূপ যন্ত্রের অঙ্গীভূত হইতে প্রয়াসী হইতেছেন, কিন্তু একথা নিরেট এবং খাটি সত্য যে ব্রিটিশ ভারতের Montford Reform লব্ধ স্বায়ত্ত্ব শাসনের ''সুফল'' অপেক্ষা বহুযুগব্যাপী সহৃদয় রক্ত মাংসের রাজাদের অধিকারে থাকা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। একই স্বার্থ রক্ষার্থে যাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়াছে তাহাদেরই বংশধর দেশীয় রাজ্যের প্রজাগণ মনে প্রাণে ইহাই জানে যে হৃদয়বিহীন যন্ত্রের নির্ম্মম চাপ হইতে সহৃদয় রক্ত মাংসের রাজার অধীনে থাকাতে সুখ হইতে স্বোয়াস্তি লাভের সম্ভাবনা বেশী। রাতারাতি Reform Scheme এর যাতায় ফেলিয়া দেশীয় রাজ্যগুলিকে তথাকথিত Democratic করা সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু যদি দেশীয় রাজগণ এবং তদীয় প্রজাগণ দেশে সুশাসন আনিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে পরের কাঁধে চড়িয়া বেড়ান অপেক্ষা নিজ শক্তি দ্বারা নিজের পায়ে চলিবার প্রয়াস সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ নয় কি? দেশীয় রাজগণ বর্ত্তমান যুগের উপযোগী-রাজ্য ব্যবস্থা যদি না করেন, প্রজা সাধারণের ন্যায়তঃ ও ধর্মতঃ দাবী যদি উপেক্ষা করেন, স্বেচ্ছাচার ও ইন্দ্রিয় চরিতার্থতায় এখনও সময় এবং রাজকোষ নিঃশেষ করিবার প্রয়াসী হন, তাহা হইলে তাহাদের দুর্দ্দিন উপস্থিত সেজন্যই Lord Chelmsford ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত পুর রাজ্যে বলিয়াছেন—

''Autocratic rule will in future be an exception and an anomaly and in the vast majority of the countries of the world, the realisation of the danger that attends autocratic rule without proper regard to the interest of the people has led to the substitution of Government by the people for the uncontrolled authority of an individual sovereign'' এবং ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট Lord Curzon বলিয়াছেন Indian princes should remember that they exist for the people and that the subjects do not exist for them. উপরোক্ত দুইটি মহোপদেশ দেশীয় রাজগণ চিরদিন স্মরণ রাখিলে এবং কার্য্যে পরিণত করিলে তাঁহারা ভারতে এবং স্বীয় রাষ্ট্রে পূজনীয় হইবেন। স্বদেশে পূজালাভ করাই রাজধর্ম্ম আমাদের শাস্ত্রে বলে সে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে হইলে স্বেচ্ছাচারিতা, বিলাস, ব্যসনের আতিশয্য বর্জ্জন করিয়া উত্তরোত্তর প্রজাদের স্বায়ত্তশাসনের দ্বার উন্মুক্ত করতঃ শিক্ষিত প্রজাদের রাজকার্য্যভার অর্পণ করিলে ব্রিটীশ ভারতের ভূয়া স্বায়ত্বশাসনের দ্বীয়ারকীয় (Dyarchy) হট্টগোল এবং জটিল সমস্যা হইতে দেশীয় রাজ্যগুলি রক্ষা পাইবে। যে পর্য্যন্ত ভারত সাম্রাজ্য ব্রিটীশ অধিকৃত থাকিবে সেই পর্য্যন্ত ব্রিটীশ গবর্ণমেন্ট দেশীয় রাজ্যগুলির উচ্ছেদ করিবে না। কারণ ভারতকে ব্রিটীশ অধিকারে রাখিতে হইলে দেশীয় রাজ্যগুলি তাহাদের প্রধান সহায় এবং অবলম্বন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে ভারত গবর্ণমেন্ট ইয়োরোপীয় যুদ্ধে দেশীয় রাজগণ হইতে প্রভূত অর্থ এবং লোকবল পাইয়া যে non intervention policy অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার ফলে এবং দেশীয় রাজগণও ব্রিটীশ protection চিরকালই পাইবেন বলিয়া অনেকেই রাজধর্ম্ম ভুলিয়া বিলাস তরঙ্গে গা ঢালিয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে গভর্ণমেন্টের রাশ আরো দৃঢ়ভাবে সঙ্কুচিত করা আবশ্যক হইয়াছে। এবং Lord Curzon এর ন্যায় ''School master''—policy অবলম্বনে—কড়া হাতে এ রাজ্যগুলিকে বর্ত্তমান যুগোপযোগী প্রণালীতে চালাইবার ব্যবস্থা করার সময় উপস্থিত।

আর জগতে সর্ব্বত্র মানুষ স্বাধিকারপ্রমত্ত। সে অধিকার হইতে মানুষকে বঞ্চিত রাখা যুগধর্ম্মের প্রতিকূল, এবং স্বভাববিরুদ্ধ হইবে। অতএব দেশীয় রাজ্যগুলিতে স্বায়ত্তশাসন প্রণালী ভারতীয় আদর্শ অনুপাতে প্রবর্ত্তিত হইলে সেখানেই প্রকৃত স্বরাজ লাভ হইবে এবং ভারতীয় শক্তি এবং মেধার পরিচয় পাওয়া যাইবে। এবং সে ফল দৃষ্টেই ব্রিটীশ ভারত স্বীয় স্বরাজ পন্থা আবিষ্কার করিতে পারিবে বলিয়া মনে করি।

এই নবযুগের সন্ধিস্থলে তজ্জন্যই ভারতীয় নেতাদের দেশীয় রাজ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করিতেছি। ভারতবাসী যে, স্বায়ত্বশাসনে উপযুক্ত তাহা প্রমাণ করিতে হইলে, দেশীয় রাজ্যই প্রশস্ত ক্ষেত্র। ভারতীয় প্রতিভা দেশীয় রাজ্যেই অবকাশের সুযোগ প্রাপ্ত হইবে।

স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্রদেববর্ম্মণ মাণিক্য বাহাদুর

ত্রিপুরায় বীরচন্দ্র।

ঝুলন-স্মৃতি।

স্বর্গীয় বীরচন্দ্র মাণিক্যের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব উৎসব উৎস আজও ত্রিপুর রাজ অন্তপুরেঃ চলিতেছে। আজ ঝুলন উপলক্ষে নিমন্ত্রণ পাইয়া ঘরের মেয়েরা মহা উৎসাহে আন্ডাবাচ্চা লইয়া রাজবাটী চলিয়া গিয়াছে, আর ছেলেরা, যুবক ও বালকবৃন্দ কেহবা ফুটবলে মাতিয়া পড়িয়াছে, কেহবা বড়্‌শি হাতে 'কমলাসাগরে' মাছ ধরিতে গিয়াছে। বাড়ী ফিরিবে কখন তাহার ঠিকানা নাই। বাড়ীখানা পরিত্যক্ত বাড়ীর ন্যায় হইয়াছে। মনে হইল শেষ রাত্রে হয় ত স্ত্রী পুরুষ উভয় দলই উৎসব সমাপনান্তে বাড়ী ফিরিবে। আমি এ দীর্ঘদিন সঙ্গীহীন একা অবস্থায় পড়িয়া আছি। কি করিয়া এই রজত– ধবল–চন্দ্রিমা তরঙ্গায়িত চিত্তদোদুল সময় কাটাই তাই ভাবিতেছি।

বীরচন্দ্র মাণিক্যের 'ঝুলন' নামক গীতিগ্রন্থখানা হাতে তুলিয়া লইলাম এবং পড়িতে পড়িতে মনে হইল আমি সেই বীরচন্দ্র মাণিক্যের দরবারে বসিয়া আছি। কাণফোঁড়া নথির ন্যায় ''ঝুলন—মঙ্গল গীতির'' Proof দেখিয়া যাইতেছি আর বীরচন্দ্রের বাৎসল্যভাবের উৎস আমার প্রতি ছড়াইয়া পড়িতেছে। এ হেন চাঁদনি্‌ রাত্রে আমি একজন রাজর্ষির সেবা করিয়াছিলাম তাহাই ওতঃপ্রোতভাবে আমার হৃদয়কে দোলাইতেছে। অদ্যকার ঝুলনকে মধুময় করিয়াছে। বীরচন্দ্র মাণিক্য আজ স্বর্গে। আজ স্বর্গ মর্ত্ত্য এক হইয়া গিয়াছে, তাঁহার মহত্ত্বগৌরব প্রাণে মনে অনুভব করিতেছি, স্বর্গের সুরে কে হৃদয় তার ঝঙ্কৃত করিয়া গাহিতেছে—''দে দোল—দে দোল''!

ঝুলন নামক ক্ষুদ্র গীতি-কাব্যখানি ব্রজেরভাবে ও ব্রজবুলিতে সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ বীরচন্দ্রের লিখিত। আর বীরচন্দ্রের মত সুকণ্ঠে গীত হইত। বীরচন্দ্র আত্মহারা হইতেন এবং ভাবে গদগদ হইয়া তিনি ভাবস্রোতে ভাসমান হইতেন। তাঁহার কবিতায় যাহা গীত হইতেছে তাহাতে তাঁহার মর্ত্ত্যলোকের জীবন—ইতিহাসভাবে ও ভাষায় ব্যক্ত হইতেছে তাহা পাঠকবর্গের প্রীতি উৎপাদন করুক, লিখকের এই মনোভিলাষ।

ভাদরের চাঁদের জ্যোৎস্নাপুলকিত রাত্রিতে যে দুটী ঘটনা একসঙ্গে ঘটিতে পারে একথা পূর্ব্বে মনেও করি নাই। ভাবে গদগদ ভাবুকের ভাব এবং রাজ্যের জন্য কঠোর কর্তব্য পালন এই দুইটী বীরচন্দ্রের জীবনে অতি আশ্চর্য্যভাবে এক হইয়া গিয়াছিল তাহাই বর্ণনা করিতেছি।

গৃহদেবতা এবং অর্চ্চামূর্ত্তি বৃন্দাবনচন্দ্র রাজমিছিলে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অদ্য ঝুলন যাত্রা। ঝুলন মঙ্গল গীত গাহিবার জন্য বীরচন্দ্র আজ রাজবেশ ছাড়িয়া ভক্তের বেশে সুসজ্জিত হইলেন। তখন রাত্রি ৯টা! রাজ-পার্শ্বসহচর A.D.C আমি, করজোড়ে দন্ডায়মান আছি—জানিবার জন্য এ অধমের প্রতি কি আজ্ঞা থাকিতে পারে? মুখে বাক্যস্ফুট করিতে পারি না। বীরচন্দ্র যে আমার শিক্ষাগুরু। কিন্তু বীরচন্দ্র সদানন্দ পুরুষ। তাঁহার পার্শ্বে শত শত শতদল পুষ্প এবং তৎসহ রহিয়াছে চন্দনচর্চিত তুলসীর গুচ্ছ। তিনি যাইবেন বৃন্দাবনচন্দ্রের অর্চ্চনার জন্য। সুন্দর কোঁচান শুভ্র গরদ ধূতি, অঙ্গে একখানা চাদর, পাখাটানার সঙ্গে সঙ্গে উড়িতেছে। বীরচন্দ্র মাণিক্য আপন মনে গুন্‌ গুন্‌ স্বরে স্বরালাপ করিতেছেন। সুহাসিতে আমাকে আদেশ

দিলেন ''টেবিলের উপর কাণফোঁড়া, আমার ঝুলন-মঙ্গল গীতির মুদ্রাযন্ত্রের Press Copy আছে, বিছানায় শুইয়া শুইয়া পড়িস্। চন্দ্রবিন্দুর যে স্থানে দরকার নাই এবং যে স্থানে দিতে হইবে কম্পোজিটার তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারে না। তাহা দেখিয়া আমার রাগ হয়, মনে করি অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া ইহাদিগকে দূর করিয়া দিই। কিন্তু বেচারিদের অন্ন যায়, সেজন্য পারি না। কাজেই তুই দেখিস এবং লাল কালীতে সংশোধন করিয়া নিস্।''

আমি রাজাদেশ পালন করিলাম। গুরুর আদেশ বলিয়া তাহাকে হৃদয়ে স্থান দিলাম। অদ্য রজনী আমাকে শুঁয়াইতে হইবে রাজনিকেতনে; কারণ রাজবাড়ীর কোন উৎসব ও বিপদ উপস্থিত হইলে আমাদিগকে রাজদ্বারে হাজির থাকিতে হয়! ইহাই আমাদের কর্ত্তব্য এবং এখন পর্য্যন্ত ঠাকুর লোকরা তাহা প্রতিপালন করিয়া থাকেন। হঠাৎ একটা আদেশ দিলেন,—''হোঁ কাল ১০টার সময় Political Agent (পলিটিক্যাল এজেন্ট) আসিবার কথা আছে। তিনি কুমিল্লা হইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন কিনা আমি জানি না। বাগানের ঘরে আমাদের দেখা হইবে। যথাযথারূপ সব ঠিক করিয়া রাখিস্ এবং অন্য কাহাকেও তথায় প্রবেশ করিতে দিস্না।'' এই আদেশ দিয়াই তিনি অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। আমিও কাণফোঁড়া নথিখানা লইয়া পার্শ্বস্থ ঘরে বিশ্রাম করিতে গেলাম। প্রদীপ উস্কাইয়া দিয়া ঝুলন—মঙ্গলগীতি পাঠে রত হইলাম। অদ্য সেদিনকার সে আনন্দ—রাত্রির কথা স্মরণে ও মরমে প্রবেশ করিয়া কাতরে পরাণ কাঁদাইতেছে। ঠিক আমারই বয়সে বীরচন্দ্র মাণিক্য তখন উপনীত হইয়াছিলেন। আমি তখন ২৪ বৎসরের যুবক। সেইদিন আর অদ্যকার দিন তুলনা করিয়া দেখিলে অদ্য রাত্রের সেই নির্জ্জন বাড়ীর নিস্তব্ধতায় বীরচন্দ্র মাণিক্যের জীবনকে স্মরণ করাইয়া দেয়, সেই মহানুভবকে অনুভব করিবার আজ প্রশস্ত অবসর।

অন্তঃপুরে সমবেত আত্মীয়া মহিলাগণের সঙ্গে বীরচন্দ্র গৌরচন্দ্রিকা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন ঃ—

''দেখ রে রঙ্গ, গৌরচন্দ্র ঝোলে অপরূপ ভাতিয়া,
অনুপম রূপ নাহিক স্বরূপ,
প্রভাত অরুণ জিনিয়া।
সুরঙ্গ হিন্দোল অতি ঝলমল,
ঝুলায় ভকত মিলিয়া,
সঘন আনন্দে কুরু জয়ধ্বনি,
যতেক নদিয়া বাসিয়া।
কুরু নব রসে গৌর কিশোর,
কুটিল কটাখ রঙ্গিয়া,
নদিয়া নাগরী হেরি ও মাধুরী
বিবশ বদনে মাতিয়া।
ঝুলতহি পহুঁ আনন্দ হিল্লোলে
কত কোটী কাম জিনিয়া,
পহুঁ গুণ গান্ আনন্দে গাওত,
দীন বীরচন্দ্র দাসিয়া।''

এখন বীরচন্দ্র স্বর্গীয়া ভানুমতী দেবীকে স্মরণ করিয়া যে গান গাহিয়াছিলেন সঙ্গীতের সঙ্গে পাঠ মিলাইয়া আনন্দে শুনিতে লাগিলাম।

''দেবি! তুমিত স্বরগ পুরে
জানি নাকো কত দূরে
কোন অন্তরাল দেশে,
করিতেছ বাস।
পশিতে কি পারে তথা
মানবের আশালতা
বিরহের অশ্রুজল
প্রাণভরা ভালবাসা।
হেথা আমি আছি পড়ে
হৃদয়ের ভাঙ্গাঘরে
গুণিতেছি সারাদিন
জীবনের বেলা।
যেন রে উপলদেশে
সাথী হীন একা বসে
জানি না ফুরাবে কবে
এ মরতের খেলা''।

প্রথমা পত্নী মানবলীলা সংবরণ করিবার পর তিনি তাঁহার বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। প্রিয়তমা পত্নীর উদ্দেশে অনেক কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাহার সবগুলি মুদ্রিত হয় নাই; কয়েকখানা হইয়াছিল। কিন্তু তাহা ২০ কি ৩০ খন্ডমাত্র। পরিজনের হাতে হাতেই তাহা রহিয়া গিয়াছিল এবং পরিজনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহারাও গত হইয়াছে। সেবক জানিয়া আদর করিয়া যে কয়েক খণ্ড আমাকে দিয়েছিলেন তাহাও বন্ধু বান্ধবগণ লুটিয়া লইয়াছেন। এখনও ফেরৎ পাই নাই। কেবলমাত্র এ ক্ষুদ্র গ্রন্থখানা আমার হাতে আছে তাহাই বক্ষে ধারণ করিয়া অদ্যকার নিশিতে বীরচন্দ্রকে স্মৃতিতে দেখিতে পাইতেছি। তাঁহারই মুষ্টি ভিক্ষার নিদর্শন পাইতেছি। গান বেশ জমিয়া উঠিল।

''বরষা সময়ে চাঁদনী রাতি,
ঘন আবরণে মলিনা ভাতি।
নবজলধর হরষে বরষে,
মত্ত দাদুর ডাকয়ে হরষে।
তমালের ডালে শিখিকুল নাচে,
রমণী হৃদয় রমণ যাচে।
গরজে বারিদ, চমকে চপলা,
থর থর কম্পে নবীনা বালা।
নাগরী সঙ্গে নাগর ঝুলে,

ঈষত ঈষত নূপুর বোলে।
এহেন সময়ে বীরচন্দ্র দাস,
যুগল মিলন নিরখিত আশ"।

এইরূপে বীরচন্দ্র ঝুলন উৎসবে মাতোয়ারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমি তখনও গানের সঙ্গে পদ মিলাইয়া প্রায় আত্মহারা হইয়াছিলাম। বীরচন্দ্রের দরবারে বৈষ্ণব কবিতা, বিশেষ মহাজন পদাবলী সর্ব্বদা মুখরিত হইত। কাজেই ক্ষুদ্র চড়ুই পাখীর মত আমি বৈষ্ণব পদাবলীর ছিটাফোটা রস সংগ্রহ করিয়া আনিতাম কিন্তু সেদিনকার সেই রজনীতে আমাকে বৈষ্ণব সুধারস পানে বাস্তবিক মাতাল করিয়া দিয়াছিল।

এমন সময় হঠাৎ একজন পেয়াদা আসিয়া সোরগোল বাধাইয়া দিয়াছিল। আমি বাহিরে গিয়া দেখি একখানা লেপাফা হস্তে, Mr. Greer Political Agent এর জরুরী পত্র লইয়া উপস্থিত এবং এ রাত্রেই জবাব চাই ইহাও জানাইয়াছিল। পত্রখানা হাতে করিয়া আমি অনধিকার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলাম। Greer সাহেবের সহিত আমার বন্ধুত্ব ছিল। Comilla Club এ তাঁহার সহিত প্রথমে আলাপ জন্মে। তৎপরে আমার শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে আলাপাদি হয়। তিনি শুনিতে পাইলেন আমি একজন ভাল Photographer (ফটোগ্রাফার) ফোটোগ্রাফি শিক্ষা করা Greer সাহেবের একটা বাতিক ছিল। কাজেই এক জাতীয় Hobby Horse এ চড়িয়াছিলাম। সুতরাং তাঁহার সঙ্গে বিশেষ সহৃদয়তা জন্মিয়াছিল এবং আমিও তাঁহার বাড়ীতে অতিথিরূপে ছিলাম।প্রত্যুত্তর স্বরূপ "Highness এক্ষণে অন্তঃপুরে Religious meditation এ গভীরভাবে নিযুক্ত আছেন। এক্ষণে তাঁহাকে disturb করা কাহারও উচিত নয়। বিশেষতঃ রাজঅন্তঃপুরে প্রবেশ নিষেধ। স্ত্রীলোক হইলেও তাহা করিতে পারেনা। কাজেই প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করিতে হইবে।" আপদ দূর করিয়া দিয়া আমি সম্পদের আশ্রয় লইলাম। আবার আমি পাঠে রত হইলাম প্রফুল্লিত মনে। ঘটিকা—যন্ত্র দৃষ্টে জানিতে পারিলাম ইতিমধ্যে ৩টা বাজিয়া গিয়াছে। ১১টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত এই ৪ ঘন্টাকাল আমি মাতোয়ারা হইয়াছিলাম। মনে করিলাম " Time is made for slaves". আমি কাহারও গোলাম নহি। চিন্তা কি? আবার ঢাল, আবার পান কর। তখন শুনিলাম ঝুলন মঙ্গলগীত সহ ঝুলন উৎসব প্রায় শেষ হইতেছে। তখন বীরচন্দ্র পরিজনসহ গাহিতেছিলেন।

"থামাইয়া দোলা রাধাশ্যাম দুহুঁ,
শ্রমজলে ভাসি যায়,
শ্রীরতিমঞ্জরী শ্রান্তি দূর করে
মৃদুল চামর বায়।
ললিতাদি সখী নিছি নামাইল
কুসুম আসনে রাই,
রাই বামে করি বসিল নাগর,
সুখের অবধি নাই।
শ্রীরূপ মঞ্জরী সেবায় মগন
যে যেমন ভাল জানে,
কেহুঁ আনে জল বাসিত শীতল,
উপহার কেহুঁ আনে।
কর্পূর বাসিত সুরস তাম্বুল
বিশাখা দিল যে মুখে,
সখীর ইঙ্গিতে দাস বীরচন্দ্র

পদ—সেবা করে সুখে।”

শেষ ঝুলন মঙ্গলগীত গাওয়া হইয়া গেল, শুনিলাম—

“সুবাসে বাসিত সুখের নিকুঞ্জ
গুঞ্জরে মধুপ তায়,
শ্যাম রাই পানে তৃষিত নয়নে
রাই শ্যাম পানে চায়।
বুঝিল চতুরা বিশাখা ললিতা
বলিল মুচকি হাসি,
শ্যাম সিন্ধু মাঝে রেখে এ রতন,
আসি বধুঁ তবে আসি।
রেখো বুকে বুকে যক্ষের যতনে
মোদের এ ধন রাই,
কা’ল এসে বঁধু দেখো দেখো যেন,
খুঁজে এ রতন পাই।
দারিদ মাণিক পাইল নাগর,
বসিল ঘেসিয়া কাছে,
হাসি সখীগণ ত্বরা পলাইল,
বীরচন্দ্র সব পাছে।”

এবার বীরচন্দ্রের পালা। চক্ষে দেখি নাই। মরমে শুনিয়াছি, মরমে লাগিয়াছে এবং সে দৃশ্য আমি যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি। তাঁহার তৃতীয় পত্নী (এক্ষণে স্বর্গীয়া মহারাণী মনমোহিনী দেবী বাম পার্শ্বে এবং পরিজন, মহিলা এবং কন্যাগণ একত্র হইয়া গান ধরিয়াছিলেন স্বয়ং বীরচন্দ্র মাণিক্য। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। রাজর্ষি তাঁহার এই শেষ প্রার্থনা, তাঁহার মর্ত্ত্যলোকের অবস্থা ও ব্যবস্থা সঙ্গীতে পরিপাটীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

অহে রাধাশ্যাম,
আজিকি সুখের দিন ঝুলন মঙ্গল হে,
ভাবমাখা সরস চাহনি
যুগল অধরে হাসি শ্রী অঙ্গে পুলক নাথ,
মন সহ ঝুলন দোলানি।
রাধাশ্যাম,
আগে এ সুখের দিনে অভাগিয়া কত হে,
পুজিয়াছি ওই রাঙা পায়,
দুনয়নে সুখ—ধারা বহিত হিল্লোলে নাথ,
প্রেম ঢেউ খেলিত হিয়ায়।
রাধাশ্যাম,

বিধাতা ব্যাধের মত আসি চুপি চুপি হে,
সাতনলা বাড়ায়ে বাড়ায়ে,
দারুণ সন্ধান তার শূন্য সব দিক নাথ,
এবে একা আঁধারে দাঁড়ায়ে।
রাধাশ্যাম,
বাসনা—বাঁশরী তানে বিধি নিরদয় হে,
পরাণ কুরঙ্গে ভুলাইল,
আনি বিষয়ের দেশে পুন বেড়াজালে নাথ,
ঘেরি বাণ মরমে হানিল।
রাধাশ্যাম,
পাঁজরে বিষের জ্বালা হিয়ায় অনল হে,
ঝলকে ঝলকে উঠে জ্বলে,
উঠিতে পড়িয়া যাই পায়ে মোর বাঁধা নাথ,
বিষের পাষাণ শিকলে।
রাধাশ্যাম,
কাটি এ করম ডোর বজরের বাঁধ হে,
বীরচন্দ্র দাসে রাখ পায়,
যে ক'দিন বাঁচি আর শ্রীবৃন্দাবিপিনে নাথ,
থাকি যেন যুগল সেবায়"।

বীরচন্দ্র কুঞ্জ ভাঙ্গা করিয়া নিকুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অর্থাৎ অন্তঃপুরে হইতে বাহির হইয়া আসিলেন ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে এবং সুধারসের শেষ পাত্র চুম্বন করিয়া। তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া মনে হইয়াছিল এ ব্যক্তিই বলিতে পারে;—

''মন মাতালে মেতেছে আজ,
মদ মাতালে মাতাল বলে?"

পাখার বাতাস চলিতে লাগিল। সুবাসিতে জলপূর্ণ ভৃঙ্গার আসিয়া উপস্থিত হইল। রজতনির্ম্মিত জলাধার লইয়া পরিচারক উপস্থিত। তাঁহার, বস্ত্রত্যাগের পর নববস্ত্র লইয়া ভৃত্যবর্গ উপস্থিত। নিজ হস্তে ভিজা গামছাখানা লইয়া শ্রীমুখের স্বেদবিন্দু মুছিয়া ফেলিতেছেন। এমন সময়ে আমি Greer সাহেবের পত্রখানা লইয়া উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহার শ্রীহস্তে উঠাইয়া দিলাম। নিজ হস্তে রচিত হস্তীদন্তের "Paper cutter লইয়া তিনি লেপাফাখানা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং পাঠ করিয়া সম্মুখস্থ দেরাজের মধ্যে পুরিয়া রাখিলেন। তখন আমার চিন্তা হইল আমি যে Greer সাহেবকে উত্তর লিখিয়া দিয়াছি এ অনধিকারচর্চ্চার জন্য আমি দায়ী। কাজেই কবুলা জবাব দেওয়াই এ ক্ষেত্রে একান্ত কর্ত্তব্য হইয়াছে। আমি আবার জোর হস্তে তাঁহাকে জানিতে দিলাম আমার উত্তরের কারণ ও বিষয়। তখন মহারাজা একটু হাসিয়া উত্তর দিলেন ''তুই তোর কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়াছিস। আমার উত্তর লিখিয়া আন্। তাহার পর এখনই লোক দিয়া পাঠাইয়া দিস্। আগামীকাল ১০টার পরিবর্তে ১২ ঘটিকার সময় আমার সহিত দেখা হইবে"। আমি মন্ত্রমুগ্ধবৎ আমার বিশ্রামাগারে যাইয়া যথাযথভাবে মহারাজার আদেশ মত

লিখিয়া লইলাম। দস্তখতের জন্য ''শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাৎ'' পেশ করিলাম। তিনি তাহাতে দস্তখত দিয়া দিলেন। আমি চলিয়া আসিলাম। তিনি তাঁহার সেই শুভ্রবস্ত্রমন্ডিত মছলন্দে শুইয়া পড়িলেনএবং আলো নিবাইয়া দিয়া "Punkha-puller কে জোরে পাখা টানিতে আদেশ দিলেন। আমি বাহির হইয়া পড়িলাম। বাসামুখে যাইতে যাইতে আমার চিন্তা হইল কি পত্র আসিয়াছে এবং প্রাতঃকালে কি কর্ম্মই হইবে তাহা আমি আদৌ জানি না। কিন্তু এ কথা জানি বীরচন্দ্র যেমন বৈষ্ণব উৎসব করেন সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেন। এই পাকা অভিনেতা কোন ঘটনাতেই নিজে ধরা দেন না। নির্ব্বাক নিষ্কম্পের ন্যায় সর্বদা দুঃখ এবং সুখের ফুল লইয়া আপন মনে মালা গাঁথিতে পারেন। আশ্চর্য্য মালাকার তাঁহার স্বভাব এবং আশ্চর্য্য রকমের তিনি বাজীকর। উৎসবান্তে রাজঅন্তঃপুর হইতে মহিলা দর্শকবৃন্দ বাড়ী ফিরিতেছে। রাস্তাময় যেন গোলাপ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। জনৈক রসিকা গান ধরিয়াছেন—

''রাই জাগ, রাই জাগ,
কত নিদ্রা যাও কালা মাণিকেরি কোলে''

আমার মনিব যে মাণিক। এদিকে দেবালয়ে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের বাড়িতে মঙ্গল—আরতির শঙ্খ ঘন্টা ঝাঁঝর ইত্যাদি বাজিতে লাগিল। আমি বাড়ী ফিরিলাম এবং পরিচারককে " Pick me up'' নামক মাতালের ঔষধ ও ১ বোতল Soda water আনিবার জন্য হুকুম করিলাম। আজ প্রকৃতই আমি মাতাল। আমার ঘাড়ের উপর মাথা রাখিতে পারিতেছি না। হৃদয় উৎফুল্লিত। কিন্তু চিন্তা আসিয়া লুকোচুরি খেলিতে লাগিল। ঘুমাইবার ভাণও চক্ষে নাই। এদিকে অরুণোদয় কাল উপস্থিত। পূর্ব্বাকাশ যেন সোনা ফলিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু পরক্ষণেই রক্তিম রঙ্গে আকাশময় লাল হইয়া উঠিতেছে। ভাবিলাম আজ আমার কর্ত্তব্য উপস্থিত।

তন্দ্রা অবস্থা, আরামকেদারায় গা ঢালিয়া দিয়া চক্ষু বুজিয়া ধুম্রপান করিতেছিলাম। হঠাৎ পরিচারক আসিয়া স্মরণ করাইয়া দিল ৮টা বাজিয়া গেল। প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে জলযোগ করিয়া A.D.C র পোষাকে সজ্জিত হইয়া রাজভবনে বাগানবাড়ীর কক্ষ যাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে বীরচন্দ্র মাণিক্যের সুখের আলয় ছিল তাহাতে উপস্থিত হইলাম, ইহাকে ঠিক বৈঠকখানা বলা যাইতে পারে না। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা বীরচন্দ্রের সর্ব্ববিদ্যার আগার অর্থাৎ এটা ছিল ইংরাজীতে যাহাকে বলে Studio চিত্রবিদ্যা, রাসায়নিক এবং শিল্পশিক্ষার ও আলোচনার একটি মন্দির। এ মন্দিরে যখন তিনি আসিতেন তখনই জানিতাম অদ্য মহারাজ কোন এক বিভাগের তত্ত্ববিশ্লেষণ অথবা নিজহস্তে গোপনীয় পত্রাদি লিখা এবং কখনও রাজ্যের অতি গুহ্য বিষয়ের আলোচনায় ব্যাপৃত হইবেন। কক্ষটা সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে গেলে পাঠকবর্গ হয়ত আমাকে অতি রঞ্জন দোষে দোষী করিতে পারেন; কারণ গুরুদেবকে কোন শিষ্যই কম দেখে না। আমিও বা একাদশী হইয়া পড়ি এজন্য বিশেষজ্ঞের মত উদ্ধৃত করিতেছি। ডাক্তার শম্ভুচরণ মুখোপাধ্যায় কলিকাতাবাসী বিজ্ঞ লোক ছিলেন। তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী মৃত দীনবন্ধু নাজির সাহেবের অধীনে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত এবং পররাষ্ট্রবিভাগের কর্ত্তা ছিলেন। বীরচন্দ্র তাঁহাকে স্বয়ং বাছনি করিয়া এপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইঁহার সহিত বীরচন্দ্র মাণিক্যের কর্ম্ম ব্যপদেশে যখন দেখা হইবার আবশ্যক হইত, তখন বীরচন্দ্র মাণিক্য এই "Studio'' ''বৈঠকখানায়" দেখা করিতেন। তিনি তাঁহার প্রণীত "Travels to Independent Tipperah''গ্রন্থে লিখিয়াছেন ঃ—

" I was then called up to the presence. Footing up a long broad flight of rather deep stairs, straight, after the first few steps, to upper storey, I passed through a room filled with goods in glass-ware, cabinet-ware, ivory work, gold and silver plates, with musical instruments, scientific instruments etc. I was next ushered into a large and airy verandahed room furnished, indeed only less crowded with furniture,............ towards the centre a charming ivory chair beside an indifferent mahogany table surmounted by a costly clock under an old fashioned chandelier, here a neglected piano, there a brand new first class microscope, rich carpets and hanging heaped up in

a corner a silver half drum (bayan) and a full drum (pakhawaj) mounted with ivory balls, in another, guns in boxes and guns without, swords naked and sheathed, shields and spears of sorts, paint boxes, stereo- scopes, opera-glasses, leather bags, and carpet bags, in profusion, telescopes leaning against walls or lying about on the floor, and what not besides, on a side whereof I found His Highness seated on the Indian bed of comfort and State called gadia roomy matress stuffed thick with cotton wool backed by an enormous round bolster and flanked by diminutive flat pillows. After the preliminaery mutual greetings, as soon as I had taken by permission my seat on the rich Persian carpet specially placed for me, His Highness first enquired of my health and then mentioned the illness in his house.''

এহেন কক্ষে যিনি বসতি করিতেন তাঁহাকে ''রাজর্ষি'' বলুন, মহর্ষি বলুন, ''ওস্তাদ'' বলুন, শিল্পী বলুন, এবং তাঁহাকে রাজনৈতিক-বিশারদ বলুন, শোভা পায়!

সেবাধারী আমাকে এ কক্ষে ফুট্ ফরমাইস, শিক্ষা, দীক্ষা এবং আমার Official capacity তে সর্ব্বক্ষণ আসিতে হইত এবং কক্ষকে যথাযথভাবে রাখা আমার কর্ত্তব্য মধ্যে ছিল। বীরচন্দ্রকে আমার উপর সময় সময় ইহা লইয়া ত্যক্ত হইতে দেখা যাইত। কিন্তু এই কক্ষের মর্য্যাদা রক্ষা করা, যথাযথভাবে সাজাইয়া রাখা এবং শম্ভুবাবুর লিখিত অমূল্য, এমন কি দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যগুলি হেফাজৎ করিয়া রাখা আমার কার্য্য ছিল। অতি সামান্য দ্রব্যের জন্য কঠোর ভাষায় বলিতেন—এমন কি বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। কোন এক সময়ে এ কক্ষে দ্বারবানের অনুপস্থিতিতে একটী রাজসন্তান (কুমার) প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং কক্ষে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া গিয়াছিলেন মাত্র। এই সংবাদ পাইবামাত্র তিনি আমার প্রতি বিরাগ হইয়াছিলেন এবং আমাকে কতকদিনের জন্য দরবারে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। আশুতোষ বীরচন্দ্র আমাকে ক্ষমা করিলেন এবং এমনিভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে আমার অপরাধ ক্ষুদ্র হইলেও তিনি ইহা যৎসামান্যভাবে লইতে পারেন না। সে কক্ষের সামান্য জিনিষপত্রও তাঁহার বুকের রক্তের ন্যায় ছিল। একটী ময়ুরপুচ্ছনির্ম্মিত পাখা লইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, তিনি ইহার দ্বারা একখানা Artistic ছায়াচিত্র লইয়াছিলেন, যাহা দেখিয়া Photographic Society of India অতিশয় প্রশংসা করিয়াছিলেন। কাজেই তিনি এ পাখাখানাকে মূল্যবান মনে করিতেন। ঘটনাধীন একজন পরিচারক জিনিষপত্র ঝাড়িবার সময় সেই পাখা হইতে দুই একখানা পালক ছিঁড়িয়াছিল, ইহার জন্য তিনি মাসাবধি আপশোস্ করিয়াছিলেন এবং বলিতেন, ''চাষার হাতে শালগ্রামের মৃত্যু হইয়া থাকে।''

বাস্তবিক এ কক্ষে তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত নিজ পরিজনেরও কাহার প্রবেশাধিকার ছিল না। এজন্য এ গৃহের সাধারণের মধ্যে নামকরণ হইয়াছিল ''মানা-ঘর''। ইংরেজরা যদি বনভোজন (Picnic) করিতে যায় তাহা হইলে চ াকরেরা বলে ''পাগলাখানায়'' সাহেব গিয়াছে। ইহা যদি প্রচলিত ভাষা হইতে পারে, ''মানাঘর'' বাস্তবিকই নামকরণ হইয়াছিল, বলিতে পারি।

যথাসময়ে Political Agent কে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য আমি তাঁহার বাসস্থান Guest House এ গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন সেখানে Assistant Political Agent রূপে উমাকান্ত দাস রায় বাহাদুর উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে যে Political Agent সঙ্গে আনিবেন ইহা আমি বুঝিতে পারি নাই; তাঁহার সহিত আমার বচসা হইবার উপক্রম হইয়াছিল এই ঝুলন মঙ্গলগীতিসম্বন্ধে অনধিকার চর্চ্চার দরুণ। Greer সাহেব সহাস্য বদনে বলিলেন ''A.D.C গণই মনিবদের সম্মান বা খামখেয়াল রক্ষার্থে Distortion পূর্ণ সংবাদ জারী করিতে বাধ্য। Deep meditation এ থাকাকালে ঢোল ডগর বাদ্য এবং নৃত্যাদি সহযোগে সঙ্গীতও চলে! আপনার পত্র পাইয়া বুঝিয়াছিলাম মহারাজ হয়ত গভীর '' যোগে'' বসিয়াছেন। কিন্তু মহারাজার পত্র পাইয়া সে ভ্রম দূর হইল এবং উমাকান্ত বাবুর কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম গতরাতে নাচরঙ্গ রাজঅন্তঃপুরে প্রচুর পরিমাণে হইয়াছে হয়ত বা মহারাজ অদ্য দেখা দিতে পারিবেন না, এমন কথাও আমাকে জানাইতে দেওয়া নিতান্ত

অসম্ভব হইত না।"

গতরাত্রে অনিদ্রার দরুণ আমার মস্তিষ্কে ভূতের বাসা বাঁধিয়াছিল। এক্ষণে যাহা শুনিলাম তাহা আমার মস্তিষ্ক সহ্য করিতে পারিল না।

বাহিরের কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত ত্রিপুরার রাজ অন্তঃপুরের ঘটনা Distortion অবস্থায় শুনে এবং বিশ্বাস করে। মধ্যে মধ্যে এ দরুণ নানা উৎপাত উপস্থিত করে এবং "সভ্যাসভ্য" বিচার করিতে চায়। যখন শক্তিশালী নৃপতি চাপিয়া ধরিতে বসেন তখন তাহার নাম হয় oppression! suppression! and mal administration! আমি কোন উত্তর না দিয়া শম্ভু বাবুর ভাষায় বলিতেছিলাম "Oh, he is a Political Babu" এই নব্য নামকরণ শুনিয়া Greer সাহেব স্তম্ভিত হইলেন এবং উমাকান্ত বাবু বেজার হইলেন। সময় নাই এক গাড়িতে রওনা হইলাম। এই পাঁচ মাইল পথ সুপ্রসঙ্গে ও রঙ্গ বিরঙ্গে বেশ কাটিয়া গেল। রাজ—অন্তঃপুরে রাস বা ঝুলন বঙ্গদেশের ন্যায় এবং অপরাপর প্রদেশের ন্যায় খেমটাওয়ালীর বা বাইজির নৃত্যগীতের স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় পায় না, বাড়ীর কর্ত্তা পরিজনকে Family Devotion এর উৎসে উৎসব করিয়া থাকেন, আমি দেখিতে পাইলাম উমাকান্ত বাবু হইতে Greer সাহেব বরং অনেকটা বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু উমাকান্তবাবু বুঝিতে নারাজ ছিলেন বরং অর্থান্তর করিয়া আত্মাভিমান প্রকাশ করিতে ছাড়িলেন না! আমরা আসিয়া রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলাম—মহারাজের নিকট খবর দিলাম এবং জানাইলাম উমাকান্ত বাবু সহগামী হইয়াছেন। মহারাজ মধুর হাস্য বদনে উত্তর দিলেন "ভাল হইয়াছে। তাঁহাকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া এস"। আমি ইহাদিগকে সঙ্গে করিয়া সেই নিভৃত কক্ষে উপস্থিত লইয়া Military fashion এ প্রণত হইয়া আমার কর্ত্তব্যকার্য্য সমাধা করিলাম। নিজ কক্ষে যাইয়া বসিলাম আর ভাবিতেছিলাম অদ্যকার ঘটনা কিসে পরিণত হইবে। L.G. Sir Rivers Thomson একখানা Confidential পত্রের দ্বারা মহারাজকে জানাইয়াছিলেন "রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থা জানিয়া শুনিয়া তিনি যে ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিতে চান তাহাই তাঁহার সুপরিচিত Greer সাহেবের যোগে গোচর করিতে অভিলাষ করেন। অতি গোপনভাবে মহারাজার শ্রুতি গোচরের জন্য "আম—দরবারে" উপস্থিত হইবেন, তাঁহাকে মহারাজ Private audience দানে কৃতার্থ করিবেন"। ইহাই আমি আমার ব্যক্তিগতভাবে এবং উপায়ে জানিতে পারিয়াছিলাম স্বয়ং মহারাজ হইতে। ইহাই বুঝি আজ আসিয়াছে এবং উপস্থিত তাহাই আলোচিত হইতেছে। সময় হয়ত লাগিতে পারে এজন্য একখানা খবরের কাগজ লইয়া আরাম কেদারায় আরাম করিতেছিলাম।

অর্দ্ধঘন্টা কাল মধ্যে কাজ ফতে হইয়া গিয়াছে মনে করিলাম। কারণ Punkha-puller দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে জানাইয়া গেল মহারাজার মসিপাত্র এবং পাখের কলম (Swan quill pen) লইয়া আমাকে শ্রী শ্রীযুক্ত সাক্ষাৎ উপস্থিত হইতে হইবে। তখন আমি গেলাম। মহারাজ কলমে মসি লইয়া দস্তখত দিতে চাহিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন উমাকান্ত বাবু সব ঠিক ত?" উমাকান্তবাবু বলিয়াছিলেন "আজ্ঞে হ্যাঁ।" মহারাজ তাহাতে সই করিয়া দিলেন এবং মোসাবিদা করা কাগজখানা পকেটে রাখিলেন। আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন (হিন্দিতে) "সাহেব এই আমার সাগ্রেত, আমি বৃদ্ধ ব্যক্তি এবং প্রায় জরাগ্রস্ত। খাটনীর কাজ মহিম করুক শেষ কাজ আমি সময় মত করিব।" পার্শ্বে Studio তে Photograph হইয়া থাকে। Photography বীরচন্দ্রের একটা বাতিক বা hobby horse। তখন আমি Greer সাহেবকে বলিয়াছিলাম " "Now you are at my disposal. Please follow me but you must keep quiet, when I command you, you must obey me." Greer সাহেব হাসিয়া all right বলিয়া কামরার অপর ধারে sitter স্থানে বসিয়া গেলেন। আমি তাঁহাকে Focus করিতে লাগিলাম এবং ইচ্ছা করিয়া তাঁহার মুন্ডুটাকে বিনা কারণে উৎপাত করিতে লাগিলাম। মহারাজ মৃদু মৃদু হাসিতেছেন এবং কান্ড দেখিয়া মনে করিতেছেন "এবার সাহেব মুস্কিল আসানের হাতে পড়িয়াছেন।" Asst. Photographer তখন Photographer এর হাতে sitter কে সমর্পণ করিল। Greer সাহেবের ছায়া ধরা হইয়া গেল—একবার নয় ছ ছ বার। বেলা তখন একটা। আবার আমাকে A.D.C রূপে তাঁহার বাসায় আনিয়া পৌঁছাইয়া দিয়া যখন মহারাজের সাক্ষাতে হাজির হইলাম, তখন মহারাজের স্নানের সময় উপস্থিত। তিনি আমাকে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে দেখিয়া বলিলেন (যেমন

তিনি মাঝে মাঝে আদর করিয়া বলেন)''বাসায় যা, ভদ্রবেশ নে, ঠান্ডা হইয়া স্নান করিস্ এবং শীতল দ্রব্য ব্যবহার করিস্''। নিদ্রা যাইবার জন্য চেষ্টা করিস্। জ্যৈষ্ঠ মাস—কাল রাত্রের খাটুনীর উপর আজ তোর ডবল খাটুনী হইল। যুবক—রক্তের জোর আছে বলিয়াই সহ্য করিতে পারিস্''। আমি বাসায় চলিয়া গেলাম এবং প্রায় নগ্ন অবস্থায় মেজের উপর চিৎ হইয়া পড়িলাম এবং ঠান্ডা হইবার জন্য চেষ্টা করিলাম আর ভাবিতে লাগিলাম বাজীকরের চরিত্র। তাঁহার ঈষৎ হাস্য বদনের কথার পিছনে অনেক গূঢ় মর্ম্মকথা থাকে যাহা মর্ম্মহীন লোকে বুঝিতেও পারে না।

প্রগাঢ় দিবানিদ্রা হইয়াছিল। প্রায় ৬টা পর্য্যন্ত। রাজবাড়ী যাইয়া দেখি ''পাত্রমিত্র সভাসদ্ বসে চারিদিকে'' এবং জল্পনা কল্পনা লইয়া কাণাকাণি করিতেছেও গম্ভীরভাবে (Like an owl dost to the moon complain) দালানের কড়িকাঠ গণিতেছে। মহারাজ তখনও অন্তঃপুরে। রাত্রি প্রায় ৮ টার সময় মানা করিয়া বসিলেন জনপ্রাণীর প্রবেশ নিষেধ। কিছুকাল পরে আমার তলপ হইল। উপস্থিত হইয়া হুকুম পাইলাম অদ্যকার তোলা Plate গুলি developing করিবার তাঁহার অভিপ্রায়। তাহারই জোগাড় করিয়া আমি অচিরে তাঁহাকে সংবাদ দিলাম। তিনি আলবোলা টানিতে টানিতে উপস্থিত। একখানা '' কেদারা টানিয়া বসিয়া গেলেন। আমি developing করিতে লাগিলাম একটু অবসর পাওয়ার মধ্যে তিনি দুই একটা সংবাদ দেন (বীজমন্ত্রের মত) যাহাতে এই বুঝিয়াছিলাম—''এবার তিনি অব্যাহতি পাইয়াছেন। Thomson সাহেবের উপদেশ (?) তিনি রক্ষা করিয়া দেখাইবেন ভুল চুক্ কাহার এবং কোথায়?'' আমি মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতে লাগিলাম। বাদপ্রতিবাদ করা এক্ষেত্রে ধর্মত ঃ নিষেধ। মনে করিলাম ''পাকা হাতে হাল পড়িয়াছে। আমাদের বানচাল হইবে না''। বীরচন্দ্রমাণিক্য কখনও গম্ভীরভাবে কখনও হাস্যবদনে উমাকান্ত বাবুর সহিত আমার প্রেমের ঝগড়া, ঝুলন ঝগড়ার খবরাখবর জিজ্ঞাসা করেন এবং কখনও গুণ গুণ স্বরে আপন মনে মহাজন পদ গাহিতেছেন, মনে করিলাম '' এ বৃদ্ধ ব্যক্তি কি রসিক পুরুষ! তিনি কি রসে না রসিক! প্রধান বাজীকরের ন্যায় উভয় হাতে সাফাই দেখাইতেন এবং যেন কখনও অর্দ্ধমণ লোহার গোলা লইয়া অনায়াসে বাজীকর হস্তক্ষেপ করিয়া থাকে সেইভাবে Political রঙ্গমঞ্চে তিনি রসিক বাজীকর।''

Developing শেষ করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিতে প্রায় দুইঘন্টা কাল লাগিয়াছিল। Dark-room হইতে হঠাৎ উজ্জ্বল আলোকে আসিয়া আমাদের নয়ন ঝলসাইয়া দিয়াছিল। তিনি মছলন্দে বসিলেন। তাহারই সম্মুখে আসনখানার উপর বসিয়া Photograph এরNegative গুলি দেখিয়া দোষ গুণের বিচার করিতে লাগিলেন। তাহার পর কাণফোঁড়া ঝুলনগীতির নথি তিনি উপস্থিত করিতে হুকুম করিলেন।

সর্বনাশ ! আমি তাঁহার সম্পূর্ণ আদেশ রক্ষা করিতে পারি নাই। গত রাত্রে মদিরা (?) পানে আমি আত্মহারা হইয়াছিলাম, মাত্র কয়েকটা গান ব্যতীত আর কোন গানেরই প্রুফ দেখি নাই। চন্দ্রবিন্দুর বিন্দুটীও দেখি নাই। আমি ত্রস্তব্যস্তে সে নথি হাজির করিলাম এবং যোড়হাতে প্রকাশ করিলাম গতরাত্রের সুঘটনায় কুঘটনায় আমি বিপর্য্যস্ত হইয়াছিলাম। মহারাজার আদেশ সম্পূর্ণ পালন করিতে পারি নাই। সহাস্যবদনে হাতে লইয়া তিনি লাল পেন্সিলে সংশোধন করিতে লাগিলেন এবং আমাকে পড়িয়া ও গাহিয়া শুনাইলেন। তখন রাত্র ১২টা বিদায় পাইলাম। রঙ্গমঞ্চের কোন খবরই স্মরণ রহিল না। কেবলমাত্র স্মরণ রহিল বীরচন্দ্রের কণ্ঠস্বর, মধুর মূরতি এবং ঝুলনমঙ্গলগীতের শেষ তাল।

ইতিমধ্যে পাত্রমিত্র সভাসদ কি কর্ম করিয়া ফেলিলেন আমি ইচ্ছা করিয়া তাহার খোঁজ খবর রাখি নাই। একদিন অমৃতবাজার (July, 1889) রাষ্ট্র করিয়া দিল কাশ্মীর রাজ্যে যে দুর্ঘটনা হইয়াছে বঙ্গের প্রাচ্য রাজ্য ত্রিপুরাতে তদনুযায়ী ঘটনা সংঘঠিত হইয়াছে। অমৃত বাজার লিখিতেছেন—

" Things came to such a pass that the Maharaja was actually held up to the public ridicule by Sir River Thomson who treated His Highness as Deputy Magistrates under him. Mr. Greer, Political Agent of Tripura had taken Highness the Maharaja to a flower garden for a serious conference. This information was followed by another namely that the Maharaja had been sepa-

rated from his advisers, and made to sit between two politicals, one being Mr. Greer himself and the another his Assistant Babu Umakanta Das for the purpose of persuading him to make over his state to the British Government! This was followed by the still more important news that between these pressurres the Maharaja had been made to sign his " Edict of Resignation for five years."

যখন আমি ইহা পাঠ করিলাম তখন মহারাজ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতেছিলেন। কাজেই আমি তখন দেখা করিতে পারি নাই। মনে করিলাম সুযোগ এবং সুবিধামত আমার বৃদ্ধ মনিবকে ''বাল্য ভোগ'' রূপে আমি তাঁহাকে অভিমানভরে দুকথা শুনাইয়া দিব—বিষয় কি? এবং কেন এই লুকোচুরি কারবার? দুইটী বিভিন্ন শ্রেণীর লোক লইয়া খেলিবার প্রয়োজন কি? কেন নিজ মুর্ত্তি ধারণ করিতেছেন না? পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ বলিয়াছিলেন " English Government is safe friend but dangerous enemy'' তিনি সাপ ও বানর লইয়া খেলা করিতেছেন কেন? এ কথাগুলি ওতঃপ্রোতভাবে আমার যুবক অন্তঃকরণে উঠিতেছে ও নামিতেছে এবং আমার মনিবের উপর অভিমানের মাত্রা বাড়াইতেছে। ইহা আমি জানিতাম প্রাদেশিক বঙ্গীয় গৰ্ব্বমেন্ট (Sir Rives Thomson) তাঁহার প্রতি অকারণে ও সকারণে রুষ্ট হইয়াছেন কিন্তু ইহাদিগকে তুষ্ট করা বীরচন্দ্রের মত লোকের পক্ষে অসাধ্য কেন না তিনি বৰ্ত্তমান British form of Government কিছুতেই নিজ রাজ্যে প্রবর্ত্তন করিবেন না একথা আমার '' বীরচন্দ্র মাণিক্যের জেইলপ্রথা'' নামক (পরিচারিকা ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩২৬) প্রবন্ধে বলিব। আবার Greer সাহেব আসিয়া যে কৰ্ম্ম করিয়া গিয়াছেন তাহার খবর যাহা আমি অপরোক্ষভাবে বীরচন্দ্র হইতে শুনিয়াছিলাম তাহাতে বোধ করিয়াছিলাম এ বৃদ্ধ ব্যক্তি ''দুৰ্জ্জয় মান'' করিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু মান কাহার সঙ্গে? ইংরেজ গভর্ণমেন্ট নিৰ্ম্মম Machine রাজ্য, নিৰ্ম্মমতাই তাহার ধৰ্ম্ম। এই দুৰ্জ্জয়মানে তিনি পাঁচ বৎসরের রাজ্যভার ত্যাগ করিয়া বসিয়া আছেন। আমার মনিবের সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধের অভিমান হচ্ছে সম্বন্ধের মানরজ্জু। অদ্য নিশ্চয় আমার মান-রজ্জুদ্বারা তাঁহার সততার ও প্রেমের পরীক্ষা করিব—নিশ্চয় করিব।

যথাসময়ে দরবারে বসিয়া গেলাম; দরবারের কাজ শেষ করিয়া তিনি ললিত কলাচৰ্চ্চা করিতেন। প্রতিদিন তাঁহার এ—কাৰ্য্য ছিল। এ কথা কেবল আমার নয় আমার বন্ধু স্বৰ্গীয় শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় (বীরচন্দ্র মাণিক্যের দরবারে চাকুরী করিতেন)। ''প্রদীপে (চতুর্থ ভাগ আশ্বিন ও কার্ত্তিক ১৩০৮) ''স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর'' নামক প্রবন্ধে ব্যক্ত করিয়াছেন (৪০৬ পৃষ্ঠায়)। তাহা উদ্ধৃত করা গেল। ''এই সময়ে পেস্কার জরুরী কাগজপত্রে মহারাজার নাম স্বাক্ষর করাইয়া বিদায় হইতেন। মহারাজ হয় তখন কোন নূতন ফটো তুলিবার জন্য ষ্টুডিও গৃহে প্রবেশ করিতেন বা কোন ''অয়েল পেইন্টিং'' লইয়া বসিতেন। কোন বিবসনা রমণীর চিত্র অঙ্কিত করিতে বসিলে দু চারিটী বিশিষ্ট লোক ভিন্ন অন্য লোকের গৃহে প্রবেশ নিষেধ হইত দরবারের ভাষায় বলা হইত ''সাক্ষাৎ মানার ছবিতে'' আছেন অর্থাৎ নিষিদ্ধছবি লইয়া আছেন''।

আজ সুযোগ ঘটিল ভাল। তিনি আজ পরিচারিকা মহিলাদের ফটো উঠাইবার জন্য হুকুম করিলেন। Asst. Photographer রূপে আমাকে সঙ্গে থাকিতে হইবে এবং দীর্ঘকাল থাকিতে হইবে, Photograph ও developing করিতে সময় যাইবে এবং তাঁহার সান্নিধ্যে থাকার সুবিধা প্রচুররূপে পাইব। পকেটে অমৃতবাজারখানা লইয়া গেলাম এবং যথাসময় কাৰ্য্য সমাধা করিয়া দিতে দেড়টা বাজিয়া গেল। তখন বলিবার সুবিধা নিলাম ইহার অর্থ কি? জানিবার সুবিধা হইল। পত্রিকা লিখিত সংবাদ পাঠ করিয়া শুনাইলাম এবং যোড় হাতে জিজ্ঞাসা করিতে চাহিলাম কিন্তু তিনি সহাস্যবদনে বলিয়া ফেলিলেন '' তুই যা বলিতে চাস্ আমি জানি।'' কিন্তু তুই মনে রাখিস্ তুই যুবক আমি বৃদ্ধ। ছেলেরা বলে বুড়োরা পাগল কিন্তু বুড়োরা জানে যে

সতীদাহ প্রথা বৃটীশ রাজ্য হইতে ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে লর্ড বেন্টিঙ্ক কর্তৃক আইন দ্বারা নিবারিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ হইতে সতীদাহ নিবারিত হওয়ার ৪৪বৎসর পরে ত্রিপুরা রাজ্য হইতে সতীদাহ প্রথা নিবারিত হইয়াছে।

ছেলেরা পাগল। তোকে বলিতেছি না কিন্তু বলিতেছি তাদের কথা যারা ''আপনমতলবী''। গভর্ণমেন্ট দীর্ঘকাল হইতে চায় আমার রাজ্যে একজন Defacto রাজা বা গভর্ণমেন্ট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মন্ত্রী আর আমাদের কর্মচারীরা চায় তাদের ''কুড়ি টাকা বজায় থাকিলে পৃথিবী ঘুরুক'' কিন্তু আমি যাহা চাই তাহা তাহারা দিতে প্রস্তুত নয়। গভর্ণমেন্ট ইচ্ছা করে না আমি স্বেচ্ছাচারভাবে রাজত্ব করি আর আমার সরকারী কর্ম্মচারীরা চায় না আমি Budget উল্লঙ্ঘন করিয়া চলি। আমি কাহারও কথা শুনিব না। বাহিরের দুই দল মাঠে মারামারী করুক, পত্রিকায় লিখুক এবং গভর্ণমেন্ট কখনও তুষ্ট হইবেন না বরং রুষ্ট হইবেন ইহা আমি জানি। কাজেই আমি দেখিলাম গভর্ণমেন্ট সন্তুষ্ট হউক পাঁচ বৎসর কাল এবং পুনঃ আমি যৌবরাজ্যের সুফল আস্বাদন করি এবং এই আমরা কলাবিদ্যার অঞ্চল ধরিয়া স্বচ্ছন্দে থাকি।''

শুনিয়া অবাক হইলাম এই কি বুড়ার অভিমান না যুবার পাগলামি ? বালকের খেলা না বৃদ্ধের খেয়াল ! একটী রাজত্ব লইয়া খেলা মেলা কতদূর রাজনীতি বিরুদ্ধ তাহা আমার মত যুবকেরও জানা ছিল। মহারাজ মশার দুঃখে মশারীতে আগুন লাগাইতেছেন। কিছুকাল সদ্য Developed plates গুলিকে স্বচ্ছ অবস্থায় দেখিয়া প্রত্যেক খানার গুণাগুণ বিচার করিতেছেন এবং সেই তাঁহার স্বভাবসুলভ হাস্যবদন এবং মধু হইতে মধুর বাক্যে নিজে তুষ্ট হইতেছেন সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও তুষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা পাইতেছেন; বীরচন্দ্র টের পাইয়াছেন। স্নানার্থে গাত্রোত্থান করিয়া আমার স্কন্ধদেশে হস্ত অর্পণ করিয়া আবার সহাস্যবদনে বলিলেন ''চিন্তা কি মহিম ? কলিকাতার বাজার করিতে যা শম্ভু বাবুর সহিত দেখা করিয়া আয়''। এইমাত্র বলিয়া তিনি দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। আমি বুঝিতে পারিলাম এ বৃদ্ধ বাজীকর একটা বাজী মারিতে ইচ্ছা করিতেছেন। অনর্থক কলিকাতা আমার যাওয়ার কথা কিন্তু যথার্থ অর্থ ছিল আমাদিগের বন্ধু সৎপরামর্শদাতা শম্ভুবাবুর নিকট উপস্থিত বিষয়ে আলোচনা করা এবং ব্যবস্থা করা। আমার অভিমান বরফের মত গলিয়া গেল এবং বুকের এবং মাথার বোঝা হাল্কা হইয়া গেল।

Amrita Bazar বলিতেছে—'' A rumour reaches us, how far true we cannot tell, that the letter of the Maharaja has given His Honour Offence because of its tone. But the Maharaja has nothing to do with the " tone" of the English letter he sent ; for he dose not know English. What the Maharaja probably did was to give his thoughts in Bengalee for his English Secretary to convert into English and that his English Secretary not used to deal in such matters and with an imperfect knowledge of English used expressions which should not have been done."

বিষয়টা যা হইয়াছে তাহা এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম। মহারাজার ছিল English Secretary শ্রদ্ধেয় মৃত রাধারমণ ঘোষ বি এ। তিনি বিজ্ঞ ব্যক্তি এবং তিনি যে একজন প্রথম শ্রেণীর দার্শনিক কবি এ কথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার নিকট বলিয়াছেন এবং প্রশংসা করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। বহুকাল তিনি রাজসংসারে ছিলেন এবং Political কার্য্যই তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল। তিনি যে মনিবের অনিষ্ট করিয়া নিজেকে ব্যক্ত করিয়া নিম্নগামী হইবেন, তাহা কখনও বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু এ কথা শ্রীনিবাস বাবু তাঁহার পূর্বোলিখিত প্রবন্ধে লিখিয়াছেন।

''ভারতের অনেক রাজা মহারাজা এইরূপ ক্ষণিক 'আয়েস্' সম্ভোগের লোভে প্রাইভেট সেক্রেটারীর মুখে অন্ন আস্বাদন করিতে যাইয়া আপনাদের জীবন বিস্বাদ ও পরিণাম তিক্ত করিয়া থাকেন। মহারাজের হৃদয় দয়ার নবনী দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল; তাঁহার অনন্যসুলভ তীক্ষ্ণ বিষয়বুদ্ধি ছিল; অসাধারণ লোকচরিত্র পরিজ্ঞানশক্তি ছিল; একটী অপরিচিত লোকের সহিত প্রথম সাক্ষাৎকার সময়েই এমনভাবে তাহার আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করিতেন যে বোধ হইত যেন রঞ্জেনের আলো অপেক্ষাও তাঁহার দৃষ্টি অধিকতর গূঢ়দর্শী ও মর্ম্মস্পর্শী; তাঁহার ক্রোধ উদ্বেলিত হইলে কর্ম্মচারীগণের হৃদয়ে খন্ড প্রলয়ের আতঙ্ক উপস্থিত হইত, পানাশক্তি বা দ্যূতক্রীড়া প্রভৃতি রাজ্যৈশ্বর্যসুলভ অনেক ব্যসন হইতে তিনি মুক্ত ছিলেন, সর্ব্বোপরি তিনি অনলস অধ্যবসায়ী ও চতুরস্রশিরষ্ক ছিলেন, এত গুণ সত্বেও তাঁহাকে রাজ্যশাসন ও মন্ত্রী পরিবর্ত্তনঘটিত অনেক অখ্যাতির ভাগী হইতে হইয়াছিল; তাহার প্রধান কারণ কর্ম্মচারীদের উপরে অতিরিক্ত বিশ্বাস স্থাপন ও লোকের ''মন্নির'' ভয়ে অতিরিক্ত চক্ষুলজ্জা পোষণ''।

ইহাতেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন এই Oriental Rulers গণের স্বভাব ও প্রকৃতি। বিখ্যাত Late Mr. B. M. Malabari (তাঁহার " Native State" নামক গ্রন্থে ১৬৮ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন—

" A ruling prince is generally an Eastern prince and nothing more. He has little education but great ideas of his own importance which he imbibes from his surroundings and a fearless adventurous spirit which he inherits from his fathers."

'সংসর্গজা দোষগুণাঃ ভবন্তি' ইহা শাস্ত্রবাক্য এবং 'যৎবীর্যঃ তৎপরাক্রমঃ' একথা কখনও অস্বীকার করা যায় না। এজন্য বীরচন্দ্র মাণিক্যের কণ্ঠহার হইতে বিচ্যুত করিতে পারি না এবং উভয় দিক দেখিলে বীরচন্দ্র সাপের সঙ্গে বানর নাচাইতেছেন ইহাই আমি উপলব্ধি করিতে পারিলাম।

একদিন চাঁদনি রাত্রে তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন এবং বাগানের চারিদিকে ঘুরিতে লাগিলেন। তাঁহার বাগান তাঁহারই মত। শুভ্র এবং সুগন্ধি পুষ্পে সজ্জিত, মাঝে মাঝে সৎগন্ধযুক্ত বিলাতী পুষ্পেরও কেয়ারী করা আছে। গ্রীষ্মাধিক্য রজনী এবং যুঁই, চামেলি, বেলা চারিদিক ছড়াইয়া পড়িয়াছে, আকাশের নক্ষত্রের ন্যায়। Overia Autovaria বিলাতী পুষ্পদ্বারা কেয়ারী করা আছে। ইহা দেখিয়াও বীরচন্দ্রের Policy কে মনে পড়ে। তিনি যুঁই জাতীয় পুষ্পের ভয়ানক পক্ষপাতী এবং মাঝে মাঝে বিলাতী ফুলেরও আদর করিয়া থাকেন। কেয়ারী যখন বাড়িতে থাকে তখন তাহাকে সংযত করেন এবং কাটিয়া ছাঁটিয়া দুরস্ত রাখেন। বীরচন্দ্র তাঁহার চির অভ্যস্ত আলবোলা সেবক সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। আনমনে তামাকু টানিতেছেন ইতিমধ্যে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুই কলিকাতা যাবি কবে?" আমি বলিলাম " মহারাজের আদেশ অপেক্ষায় আছি"। তিনি সহাস্যে উত্তর দিলেন (একটু মুচকি হাসিয়া) "যাবি ত পূজার বাজার কর্ত্তে। শ্রাবণ মাসে কেন?" আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তখন তিনি নিভৃতে বলিলেন "কলিকাতায় একটু আমোদ করা চাই ত? তোরা যুবক আর তোর Political বন্ধু অনেক আছে দেখা সাক্ষাৎ করা চাই। পরশু দিনই রওয়ানা হইয়া যা" ভাবে স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম আমাকে যাইতে হইবে পক্ষাপক্ষকে ফাকি দিতে। যাইতে হইবে Dr Sambhu Charan Mukherjee র নিকট। তিনি কলিকাতায় Political রঙ্গমঞ্চে Viceroy হইতে অধীনস্থ কর্ম্মচারীবর্গকে চিনেন এবং জানেন এবং তাদের সঙ্গে মেলামেশা করেন। মাঝে মাঝে ত্রিপুরার জন্য তিনি খাটেন, যদিচ তিনি ত্রিপুরার মন্ত্রিত্ব পদ স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। কেন এবং কি কারণে একথা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমাকে প্রাসঙ্গিক করিয়া লইতে হইতেছে। Mr Skrine Mukherjeeর জীবনী ও পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ১৩১ পৃষ্ঠায় M. Townsend লিখিত পত্রের যে জবাব দিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করা গেল।

You concluded with a suggestion "why do you not publish an account of your life as Minister of Tipperah?" The answer is because I might then compromise my master and the little State I served. And secondly because I might thereby close the only career open to me in the Native India. British Officials try their utmost to keep able and worthy natives out of the native States. And any indiscretion on my part would arm them with a deadly weapon against me and the small class of aspiring natives educated in western learning who can manage States.

However, I have done the next best thing published a small volume of "Travels through Bengal to Tipperah" giving glimpses of life in a native State, and it now awaits an adequate review from your pen.

এই পত্রের ভাব ও ভাষায় পাঠকবর্গ বেশ বুঝিবেন আসল সোনা ফেলিয়া গিল্টী জিনিষই তখনকার দিনে আদরণীয় হইত। শম্ভুবাবু রাজ্যের ইজ্জৎ রক্ষা করিতে যাইয়া যখন দেখিতে পাইলেন নিজের ইজ্জৎ পর্য্যন্ত at stake (বিপদগ্রস্ত) হইয়া

পড়ে, তখন তিনি প্রাচীন ত্রিপুরা রাজ্যের সীমা ছাড়িয়া গেলেন কিন্তু অন্তর-বন্ধন ছিন্ন করেন নাই বরং তাহা দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়াছিল। ''যো যস্যহৃদ্যং নহি তস্য দূরম্'' কলিকাতায় বসিয়া তিনি বীরচন্দ্র মাণিক্যের Political adviser এর কাজ করিতেন। মাঝে মাঝে কৃতকার্য্য হইতেন।

আমি যথাসময়ে কলিকাতা যাইতে প্রস্তুত হইলাম—যখন বিদায়ের সময় মহারাজকে বিদায় অভিবাদন করিয়াছিলাম, তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিবার কালীন তিনি আমার কর্ণকুহরে একটা খবর দিয়াছিলেন ''Asst Political Agent মহাশয় এ রাজ্যে বেকার অবস্থায় পড়িয়াছেন এবং তাহার দক্ষিণহস্ত পঙ্গু হইয়া গিয়াছে Cram রোগের দরুণ, Fool's cap অর্থাৎ 'গাধার টুপী' কাগজে মসি লেপিয়া Deputy গিরি করিতে পারিবেন না এমত অবস্থায় ত্রিপুরা—গাধার সোয়ারী হওয়াই তাহার পক্ষে শোভা পাইবে একথা Govt. মনে করেন। শম্ভুবাবু একথা বহু পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন।''

শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে সটান আমি Wellington street ১নং অক্রুর দত্তের গলিতে শম্ভুবাবুর অতিথি হইলাম; তিনি তখন অসুস্থ। Dr. Mohendra Lal Sarcar তাঁহার পাশে বসিয়াছিলেন। আমাকে দেখিয়াই শম্ভুবাবু উৎফুল্ল হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন ''কি হে Thakurling (এই আদরের নামে শম্ভুবাবু আমাকে সম্বোধন করিতেন) খবর কি? শ্রী শ্রীযুত কেমন আছেন? তোমার বাবা কেমন আছেন? তাঁহার সে প্রশান্ত মুর্ত্তি আমার স্মরণ হইতে চলিয়া যাইতে চায় না।'' আরও কত কি জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন যেন এক নিঃশ্বাসে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পাঠের মত। আমি তাঁহাকে সব বিষয়ে যতদূর পারি উত্তর দিলাম এবং আমার বক্তব্য তাঁহাকে বলিলাম। তখন শম্ভুবাবু একটু কষ্টের হাসি হাসিয়া গম্ভীর হইলেন এবং ডাক্তার সরকারকে জিজ্ঞাসা করিলেন ''আমি দুই এক দিনের মধ্যে বের হতে পারব?'' সরকার বলিলেন ''বিলক্ষণ তুমি যে ন্যাকামি করিতেছ? আর তোমার হিমলাগান বাতিক আছে।'' এই বলিয়া ডাক্তার সরকার বাহির হইয়া পড়িলেন। আমি স্নানাহার করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর শম্ভুবাবুর শরণাগত হইলাম। ''সুখবর মহিম, আমি এই মাত্র টেলিগ্রাম পাইলাম ''তানসেন'' (Thomson) চলিয়া যাইতেছেন। আমার পরিচিত বন্ধু Sir Stuart Bayley পুনরাগত হইতেছেন, তখন আমার সুবিধা হইবে মনে করি। তবে ছোট লাট লইয়া ইঁহারা পাখাবদল করে। কিন্তু Bayley র উপর আমি সে সন্দেহ করিতে পারি না। তোমরা এক কাজ কর। যে চিঠিখানা লিখা হইয়াছে তাহা বড় কদর্য্য ভাষায় এবং আত্মম্ভরিতাপূর্ণ। সেটা আমি দেখিয়াছি। ঐ চিঠিখানা প্রত্যাখান কর—।'' ইতিমধ্যে দুর্গামোহন (স্বর্গীয় স্বনামধন্য প্রসিদ্ধ দুর্গামোহন দাস) পূজার ছুটীতে আগরতলা যাইবেন এবং মহারাজকে আমার পক্ষ হইতে এক্ষেত্রে যাহা করিবার দরকার সে সম্বন্ধে উপদেশ দিবেন। মহারাজ ঠিক মনে করিয়াছেন। লোকচরিত্র—অভিজ্ঞ, কাজেই ঠিক মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিয়াছেন। দুর্গামোহন দাস ব্রাহ্ম এবং উমাকান্ত দাস আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম কাজেই উমাকান্তকে লওয়াই ঠিক মনে করি। তুমি একবার দুর্গামোহনের সঙ্গে দেখা কর।''

যখন দুর্গামোহন বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম তখন দেখি তিনি চটিয়া আগুন। আমাকে দেখা পাইবামাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন ''মহিম গাধার মত চিঠিখানা Draft করিয়াছে কে?'' এই সপ্তজিহ্বাযুক্ত অগ্নিদেবকে দেখিয়াই আমার চঞ্চল জিহ্বাকে সামলাইয়া লওয়াই সঙ্গত মনে করিলাম। বলিলাম ''আমি জানি না।'' তখন দুর্গামোহন বাবুর নিকট জানিতে পারিলাম তিনি বঙ্গের মঙ্গলঘট, ত্রিপুরাকে কাহাকেও পদাঘাত করিতে দিবেন না। ত্রিপুরা রাজ্যকে এবং রাজাকে অক্ষুণ্ণ রাখাই তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য এবং দ্রষ্টব্য। আগরতলা যাওয়াই স্থির করিয়াছেন এবং তথায় গেলে তিনি আমাদের বাড়ীতে অতিথি হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করেন। পিতৃদেব ইঁহার বাল্যবন্ধু এবং এখন তিনি অন্তরঙ্গ বন্ধু। বুঝিলাম বীরচন্দ্র এবার সৎপরামর্শ পাইবেন।

সমস্ত কথা মহারাজকে সুদীর্ঘ পত্রে লিখিয়া দিলাম। ''কলিকাতায় এক্ষণে আমার অবস্থান করার দরকার নাই। আমি কোন কোন বন্ধুর সহিত বন্ধুর দেশ জলপাইগুড়ি যাইতে চাই এবং হয় ত দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত যাইতে পারি।''

ঝুলন-স্মৃতি

আমাদের সাহিত্যসমাজ রাজনৈতিক সমাজকে কুটিলনৈতিক সমাজ মনে করিয়া সর্বদাই দূরে রাখিতে চেষ্টা করে। পাছে এ প্রবন্ধ রাজনীতি দোষে দুষ্ট হয় ইহা আশঙ্কা করিয়া সর্বাগ্রেই বলিতেছি, ইহা একটী অতি প্রাচীন বংশীয় রাজর্ষি-জীবনের ঘটনা। এ ঘটনার সহিত পাশ্চাত্য রাজনৈতিক নীতির কোন সম্বন্ধ নাই।

অদ্য পৃথিবীর সমস্ত দিকেই নবজীবনের সাড়া পাওয়া যাইতেছে। পশ্চিম গগনের রবি এক্ষণে নিশা যাপন করিয়া অরুণোদয়ের সহিত পূর্ব্ব গগনে দেখা যাইতেছে। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কুটিলনীতি তাহা অস্তগামী হইয়াছে। তখন ছিলেন Administrator গণ রক্ষণশীল নীতির পক্ষপাতী। বর্ত্তমান ব্রিটিশরীতি হইয়াছে উদারনীতি, সহানুভূতি তাহার মানদণ্ড এবং সহৃদয়তা তাহার হৃদযন্ত্রের 'তাপদণ্ড' (Thermometer)। পূর্বকালে স্বাধীন রাজাদের অবস্থা ছিল একপ্রকার এখন হইয়াছে অন্যপ্রকার। পূর্বে স্কুলের ছেলেদের মত ইঁহারা ব্যবহৃত হইতেন। সেলামি তোপের আওয়াজের তারতম্য অনুসারে রাজাগণ পলিটিক্যাল এজেন্ট সাহেবের অনুজ্ঞানুসারে চালিত হইতেন।

ত্রিপুরারাজকে প্রমাণ স্বরূপ ধরিয়া নিতে পারি। যে অবস্থায় বীরচন্দ্র পতিত হইয়াছিলেন ইহাকে দুরবস্থা বলা যাইত না, পারিলেও এ অবস্থাকে সুব্যবস্থা বলা সাধুভাষা হইবে না। খাঁটী হিন্দু রোগীকে রোগের দরুণ কুক্কুট—জাতীয় পাখীর জুস ব্যবস্থা করা যেমন সুব্যবস্থা নহে তেমন প্রাচ্য রাজণ্যকে পাশ্চাত্যভাবে ধর্ম্মকর্ম্ম করিবার জন্য যদি ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে কতদূর মর্ম্মান্তিক হয় পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে দেশীয় রাজ্যের রাজাদের অবস্থা ছিল ''না ঘরকা না ঘাট্‌কা''; কারণে অকারণে গভর্ণমেন্ট তাঁহাদের প্রতি রুষ্ট হইতেন এবং তুষ্টও হইতেন। দেশীয় রাজ্যে পররাষ্ট্র বিভাগের দরজা সর্ব্বদা বন্ধ থাকিত। যদি কোন কারণে উদঘাটিত করিবার সুযোগ ঘটিত তাহা হইলে যে চিত্র প্রকাশ পাইত তাহা পাঠকবর্গের রুচিকরও হইবে না মুখরোচকও হইবে না।

জলপাইগুড়িতে ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্ত হইয়া বাড়ী প্রত্যাগমন করিলাম এবং মাসাবধি কাল শয্যাগত ছিলাম। দরবারে কি হইতেছে এবং কি করিতেছে ইহা আমি জানিতাম না শুনিতাম না; একদিন সত্য সত্য অমৃতবাজারে দেখিলাম ঃ—

''Maharaja should engage the service of a Barrister to draft letters for him in a matter like this. Every one will tell his Honour that the Maharaja is incapable of giving offence, and he is one of the noblest of men in india.''

মহারাজার উচিত একজন ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিয়া যথাযথ যুক্তিসহকারে গভর্ণমেন্টকে পত্র লিখিয়া জানান যে, তাঁহার মত ব্যক্তি রাজশক্তির অসম্মান করিতে পারেন না। তাঁহার লিখিত পত্রের উদ্দেশ্য, কিছুতেই গভর্ণমেন্টকে অসম্মান করা নহে।

সেই মর্ম্মে একখানি পত্র গভর্ণমেন্টের উদ্দেশ্যে লিখিতও হইয়াছিল ও ব্যারিষ্টারপুঙ্গবকে পূর্ণমাত্রায় ''পূর্ণপাত্র'' দানে তুষ্ট করার ত্রুটী হয় নাই। ইতিমধ্যেই সপ্তজিহ্বাবিশিষ্ট দুর্গামোহন দাস মহাশয় আসিয়া বাক্যযন্ত্র দিয়া এসব বালির বাঁধগুলিকে

সরাইয়া দিলেন এবং আপাততঃ দুই কূল রক্ষা করিয়া দিলেন। পিতৃদেবকে বলিয়া গেলেন ''ঠাকুর—সাহেব একদম হাজার বছর''। তাঁহার উপদেশ মত শ্রী শ্রীযুত মহারাজ গভর্ণমেন্টকে পত্র লিখিয়া দিলেন।

ফল হইল, উমাকান্তবাবুর কার্য্যভার গ্রহণের দিন স্থির হইল। আম—দরবারে তিনি উপস্থিত হইয়া সনন্দগ্রহণ করিবেন। দরবার আহ্বান করিতে হইল আমাকে। প্রথম খট্‌কা বাজিল পাদুকা লইয়া, নগ্নপদে মহারাজকে নজর দিতে হইবে। এবং যোড়হাতে রাজকার্য্যারম্ভে অনুমতি চাহিতে হইবে। উমাকান্ত বাবু প্রায় বারো তের বৎসর ক্রমান্বয়ে Asst. Political Agent ছিলেন। তখন তিনি রাজদরবারে উপস্থিত হইতেন না খাস দরবারে ছাড়া। হিন্দুরাজার দরবার যে কি গাম্ভীর্য্যপূর্ণ এবং ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ইহা তিনি কদাচ দেখিতে পান নাই। কাজেই তিনি নজর দিবেন কিনা ইহা বিবেচ্য রহিল, কিন্তু পাদুকাত্যাগ করা তাঁহার ''পদের'' মর্য্যাদা সাপেক্ষ,—তিনি তাহা ত্যাগ করিবেন না। এভাবে তিনি Confidentially মহারাজকে জানাইয়া দিলেন। তখন আমি উপস্থিত ছিলাম এবং মহারাজ আরামে আয়াসে ছিলেন। পত্রখানা সহাস্যে আমার উপর ছুড়িয়া মারিয়া বলিলেন, ''তোর কাজ তুই করবি, আমাকে জ্বালায় কেন''। আমি পত্রখানা পাঠ করিয়া অবাক হইলাম এবং ভাবিলাম ইহার ব্যবস্থা করা দরকার; প্রথমেই যদি ''দাস্যভাবের'' অভাব হয় উমাকান্তবাবুর নামের পদবীর মাহাত্ম্য রক্ষা করা দায় হইবে। পরদিন প্রাতঃকালে আমি উমাকান্ত বাবুর বাসা Residency বাঙ্গালায় উপস্থিত হইলাম। অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হইল ''Be roman when you are in Rome।''চাকুরি যদি করিতে হয় চাকরের মত চলিতে হইবে। Political Agent এর সহকারীরূপে থাকুন আমরাও ''Political Babu'' বলিয়া সম্বোধন করিব। তখন পাদুকা ও ''নজর'' একই স্থানে থাকিবে।

দরবার হইল। মন্ত্রী উমাকান্তবাবু পাদুকাবিহীন হইলেন এবং''Political Babu''র স্থানে ''মন্ত্রী বাহাদুর'' পদবী পাইলেন। বীরচন্দ্র শ্রীহস্তে তাঁহাকে মন্ত্রীত্বের সনদ দান করিলেন। উমাকান্তবাবু জোর করে তাহা গ্রহণ করিলেন; চোবদার তাঁহার পূর্ণ নাম ফুকারিতে ছিল। মন্ত্রী বাহাদুর স্বকীয় কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। সেদিন সন্ধ্যার সময় মন্ত্রী বাহাদুর একপত্র লিখিলেন ''তিনি রেসিডেন্সিতে বসবাসের জন্য গভর্ণমেন্টের অনুমতি পাইয়াছেন।''পূর্ব্বে তিনি মহারাজকে ''প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় মহারাজ'' সম্বোধন করিয়া পত্র লিখিতেন। অদ্যকার পত্রেও সে ভাষাই ঠিক রাখিলেন। কেহ কেহ আপত্তি করিয়াছিল কিন্তু বীরচন্দ্র বীর্য্যবন্ত রসিকের ন্যায় বলিয়াছিলেন, ''প্রিয় ও শ্রদ্ধেয়'' এই দুই শব্দই ভুল। অনেক দিন চলিয়াছে, আরও কয়টা দিন চলুক। তোমরা আপত্তি কর কেন?'' আপত্তি বন্ধ হইয়া গেল কিন্তু তাহার পিছনে অকালে মেঘ সঞ্চার হইল।

উমাকান্তবাবু বহুকাল এ রাজ্যে ছিলেন এবং ইহার ছিদ্র অনেক তিনি জানিতেন। Confidential ভাবে কতশত কথা জানিতেন তাহা আমার জ্ঞাত নহি। সর্ব্বাগ্রে তিনি Budget প্রস্তুত করিতে বসিলেন। অতি সহজ কাজ বালিকাও পারে। কোন বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী '' কেমন করিয়া জল আনিবে'' পরিদর্শক জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাইল ''ঘড়া লইয়া ঘাটে যাইব, এবং ঘড়া জলে ফেলিয়া আসিব।''পরিদর্শক মহাশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন ''তাহা হইলে জল আনা হয় কিরূপে? ''শিক্ষিতা মেয়ে উত্তর দিল ''ঘড়া গেল জলে, আমি গেলাম ঘরে; ভগ্নাংশ মতে গেল কাটা গেল ঘড়া এবং জল রহিল।'' প্রায় এই ভাবেই রাজসংসারকে কাটাকাটি করিয়া Budget ও Heading রহিয়া থাকে। হিন্দু রাজার সংসার এবং প্রাচীন রাজ্যের সংসার,—কত আবর্জ্জনা? এই আবর্জ্জনার মধ্য হইতে ''আয় ব্যয় সামঞ্জস্য'' করিয়া বাজেট ঠিক প্রস্তুত করা অদ্য বীরচন্দ্র মাণিক্যের পৌত্রের আমল পর্য্যন্ত ঘটাইয়া উঠা দুরূপ হইয়া পড়িতেছে। সচরাচর বলিতে গেলে পৃথিবী বেষ্টিত ব্রিটীশ সাম্রাজ্যে British Budget স্থিরতা রক্ষা করায় কেমন মাথার কাজ তাহা সকলে জানেন। ত্রিপুরা রাজ্যে বাজেট হইল ''ছিন্নমস্তা' দেবীর তুল্য। কারণ এখানে ''পদমর্য্যাদা'' কর্ম্মচারীবর্গ চায়। দুই দিকে দুইটী ডাকিনী যোগিনী যেমন রুধির ধারা পান করে, তেমনি স্বহস্তে ছিন্নমুণ্ড রাজ্যের আয় 'সংসার' 'শাসন 'এবং 'নিজ-তহবীল' পান করিতেছে; এ দৃশ্য আমার ২৪ বৎসর -বয়স হইতে ৫৮ বয়স পর্যন্ত ৩৪ বৎসর যাবত দেখিয়া আসিতেছি। Budget বন্ধনে প্রায় সর্বদাই রক্ষিত হয় না কিন্তু দোষ দিবার বেলা অষ্টধাতুর দেবতা ''রাজা'' কেই দিয়া থাকি। Department - এর উপর Department যেমন গ্রহের উপর

উপগ্রহবৎ চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, একথা আমার বিশ্বাস। ''শাসন'' Administration ''সংসার'' Household expenditure এবং ''নিজ তহবিল'' 'Private purse' নামক তিনটি বিভাগ যখন হইল তখন তাহা যেন তিন সতীনের ঘর হইয়া উঠিল। Budget ব্যাপার লইয়াই পাকা খেলোয়ার বীরচন্দ্র বেশ খেলাই খেলিলেন। মন্ত্রী বাহাদুরের সমস্ত প্রস্তাব ''মঞ্জুর'' করিলেন। পূর্ব্বে ষ্ট্যাম্পের আয় ছিল ৮০০০/১০০০০ টাকা। ইহার আয় লইয়াই ''নিজ তহবিল'' নামক একটা তহবিল রক্ষিত হইত। তখন রাজ্যের আয় ৪/৫ লাখ। উমাকান্ত বাবু ষ্ট্যাম্পের আয় শাসন বিভাগে গ্রহণ করিয়া Average এর উপর ১২০০০ টাকা সাব্যস্ত করিয়া দিলেন। মনে করিলেন ৮০০০ স্থলে মহারাজ পাইলেন ১২০০০ টাকা; বীরচন্দ্র মুচকি হাসি হাসিলেন। তবুও তিনি বাজীকরের ন্যায় চলিতে লাগিলেন। Give him enough rope to hang himself ইহাই বীরচন্দ্রের চরম উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া এখন মনে হয়। এদিকে কর্ম্মচারী সংখ্যা বৃদ্ধি হইল বহুৎ। প্রায় দুই বৎসর এই ভাবে কাটিয়া গেল। Budget মিলিল না Heading এ গোলমাল বাধিয়াছে, এবং Treasury balance রক্ষিত হইতেছে না। তিন তহবিলেই ত্রিদোষ ঘটিয়া গেল। বীরচন্দ্র যখন দেখিতে পাইলেন তিনি অনেক খেলা খেলিয়াছেন, বৃদ্ধকালে অনেক ঝুলনে ঝুলিয়াছেন, রোগে জরাজীর্ণ তিনি স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া মনে করিলেন ঃ—

''ভগ্ন ঢাকে যথাসাধ্য
বাজিয়ে যাব জয় বাদ্য''।

তিনি দেখিতে পাইলেন এক তহবিলের টাকা তিন তহবিলে খরচ হইতেছে কিন্তু ঝোল যার যার পাতের দিকে টানিবার চেষ্টা করিতে গিয়া ঝোলের পরিমাণ অত্যন্ত কমিয়া গেল। বাস্তবিক Administration এর খরচ নানা উপায়ে অতিশয় বাড়িয়া গেল।

বিশেষ কারণ, বীরচন্দ্র কর্ম্মময় জীবনে একটি কর্ম্ম হইতে বিরত ছিলেন, তিনি কোন দিন কোন প্রধান কর্ম্মচারীর নিকাশ তলব করিতেন না। এবার বীরচন্দ্রের নিকাশ দিতে হইবে, যে নিকাশ না দিবার দরুণ Government সহিত তিনি লড়াই করিয়াছেন। Political Agent হয়রাণ হইয়াছেন ; রাজদ্বারের প্রস্তর খণ্ডের উপর মাথা ঠুকিয়াও কোন রিপোর্ট আদায় করিতে পারেন নাই; এজন্য তিনি তদানীন্তন লাটগণের সহিত মনোমালিন্য ঘটিবার ভয়ে ভীত হন নাই। Administration Report নামে একটা নিকাশ নবমন্ত্রী উমাকান্তবাবু (ভূতপূর্ব PoliticalBabu) দিতে চান যেমন অন্যান্য Model Advanced রাজ্যে দিয়া থাকে for general public, ইহাতে দোষ কি? বরং আমরাও Model state নামে অভিহিত হইব এবং মহীশূর বরদা প্রভৃতি রাজ্যের অনুকরণ বা অনুগমন করিতে পারিব, আর Government সন্তুষ্ট হইবেন হয়ত বা মহারাজ ''উপাধির বৃষ্টিতে'' স্নান অবগাহন করিতে পারিবেন। তখন মহারাজ ঈষৎ হাস্য বদনে উত্তর দিয়াছিলেন ''মহীশূর প্রভৃতি রাজ্য ব্রিটীশ শাসনাধীনে অনেক দিন থাকিয়া ''মার পরিবর্ত্তে মাসীর কোলে'' লালিত—পালিত হইয়াছিল'', তাহার সঙ্গে আমার তুলনা? আমার ঘরে এখনও এ, অবস্থা ঘটে নাই,—এখনও ত্রিপুরা ষ্টেট কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসে যাইবার কারণ ঘটে নাই। বিশেষত ঃ আমাদের প্রাচীন পরিবারে অনেক জঞ্জাল লুক্কায়িত আছে। সেগুলিকে পরিষ্কার করিবে কে আমি জানি না, যে পর্য্যন্ত এ রাজ্যে ঐ সব থাকিবে Administration Report Fool's cap কাগজে প্রকাশ করিয়া Fool বলিতে দিলে আমার মাথায় গাধার টুপি পরাইয়া দিতে হয় এবং মিথ্যা কথা বলার পাপ ঘটে। দুই একটা রাজ্যের Administration Report আমাকে দেখাইয়াছেন, সেগুলিকে লোকে Model state বলিয়া বলে, কিন্তু আমি জানি ঐসব রাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থা। কাজেই ইহা প্রকাশ হইবার পক্ষে মন মানিতেছে না।''

উমাকান্তবাবু নাছোরবান্দা, তিনি একদিন মহারাজকে Private audience এ নিয়া কি বুঝাইয়াছিলেন এবং নিজে বা কি বুঝিয়াছিলেন আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু পরদিন সকালবেলা Foolscap এ ছাপান Administration Report আসিয়া দরবারে উপস্থিত হইল। উমাকান্তবাবুর বিরুদ্ধবাদীরা হৈ চৈ এবং কান্নাকাটি আরম্ভ করিয়া দিল। ''স্নানঘর'' হইতে আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং হুকুম করিলেন ''তিনি নির্জ্জনে থাকিতে চান এবং বাগানবাড়ীতে যাইয়া Microscope

দ্বারা জীবাণুর বীজ পরীক্ষা করিতে চান"। এভাবে তিনি প্রায় সপ্তাহ কাল কাটাইয়া দিলেন। ইতিমধ্যে আমাকে একদিন জনান্তিকে বলিয়াছিলেন ''তোদের ইংরাজীতে (তামাসাচ্ছলে একথা অনেকবার বলিতেন) বলে King's Confidence যদি হ্রাস হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ মন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে হয়। এটা বড় ঠিক কথা। মন্ত্রণা যে দিতে পারে এবং মন্ত্রণা যে নিতে পারে তাহাদের সম্বন্ধ অতি পবিত্র। তবে ''বীজমন্ত্রের অধিকার থাকা দরকার। বীজই যদি নষ্ট হয় মন্ত্রের অধিকার তাহার চলিয়া যায়; এই Microscope যন্ত্রদ্বারা আমি তাহা স্পষ্ট টের পাইয়াছি"। তিনি আমাকে পৃষ্টে হাত দিয়া Microscope দেখাইতে লইয়া গেলেন এবং যন্ত্রের মধ্যে চক্ষু দিয়া দেখিতে বলিলেন। আমি প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তখন বীরচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, ''আমি বৃদ্ধ ব্যক্তি, তাই Lens যে focus এ আছে তাহা তোর যুবকচক্ষুর নিকট out of focus হইয়া পড়িবে বৈ কি ? " Reck &Pinion দ্বারায় আমার focus ঠিক হইল। তখন দেখিলাম একখানা slide এ কতকগুলি সতেজ জিনিষ গতিবিধি করিতেছে, তাহারা জীবিত আছে। আর একখানা slide এ দেখিতে পাইলাম কতকগুলি মৃত জীবাণু পড়িয়া আছে। বীরচন্দ্র তখন আমাকে বুঝাইয়া বলিলেন ''এগুলি জীবাণুর নমুনা। ৪/৫ দিন চেষ্টা করিয়া তাহাদিগকে পাওয়া গিয়াছে। এইটা মনে রাখিলেই হইবে বীজাণু যদি মৃত হয় তাহাতে উৎপাদন শক্ত কি করিয়া থাকিবে। তখন পুরুষ অপকর্ম করিতে বসে। আমাদের বর্ত্তমান Administration এর অবস্থা এই "। কটাক্ষপূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া তিনি যে কথা বলিয়াছেন তাহার অর্থ মর্ম্মান্তিক; কাজেই অর্থ করা অসম্ভব।

কিছুদিন পরে উমাকান্ত বাবুকে বরখাস্ত করার পরওয়ানা জারি হইল। তাহার অভিলষিত কাজ নিজ পুত্রগণের হস্তে মন্ত্রীর অফিসের বিভাগগুলি ভাগ করিয়া দিলেন এবং নিজে স্বাস্থ্যরক্ষার্থে যে কয়দিন বাঁচিয়াছিলেন কলিকাতা ও দার্জ্জিলিং —এর নিকটস্থ কারশিয়ং বাস করিতে লাগিলেন।

এখানে আমি একটা কথার অবতারণা করিতেছি। উমাকান্ত বাবু স্বজাতি বা বৈদ্যকুলের পক্ষপাতী ছিলেন। অনেক দেশীয় রাজ্যে অদ্য পর্য্যন্ত একটা দলাদলি বা intrigue ছিল ও আছে। কিন্তু ইহারই ভিন্ন রাজ্য বা ব্রিটীশ রাজ্য হইতে সমাগত এবং দলাদলির মুখ্যপাত্র। শাক্ত বৈষ্ণব দ্বন্দ্ব এবং জাতিবিশেষের প্রাধান্যতা লইয়া দেশীয় রাজ্যে ঝগড়া বাজায়। দুঃখের বিষয়Advertisement দ্বারা উমাকান্তবাবু যে শিক্ষিত লোক (?) পাইয়াছিলেন তন্মধ্যে বৈদ্য জাতিয়ের সংখ্যাই অত্যধিক ছিল এবং ইহার দৃষ্টান্ত Administration Report এর পাতার পাতায় ছিল। বীরচন্দ্র মাণিক্য সেজন্যই বলিতেন "Admiring Report'' Reformation তাঁহার মূলমন্ত্র কিন্তু দার্শনিক Bacon বলিয়াছেন 'Reforms therefore without bravery are scandal of former crimes and persons' অভিজ্ঞ লোকের এই কথায় কেহ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিল না এবং উমাকান্ত বাবুও পারিলেন না। ইহা বিধিবিড়ম্বনা বলিতে হইবে।

Bengal Government রুষ্ট হইয়াছিলেন; যে লোককে মন্ত্রীপদে ভার দিয়া উদ্দেশ্য হাসিল করিয়া অর্থাৎ Administration Report প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহাকে তাড়াইয়া দিলে আবার হয় ত মসীযুদ্ধের প্রয়োজন হইবে। কিন্তু বীরচন্দ্র মাণিক্য এই উর্ণনাভ তুল্য আবদার ভাঙ্গিয়া দিলেন। নিজ পুত্রদ্বয়কে মন্ত্রী হইতেও ক্ষমতা অনেক অল্প পরিমাণে দান করিয়া তিনি পিতার কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়াছিলেন; রাজার কর্ত্তব্য পালন করিয়া আশ্রিত—বৎসলগণের আশ্রয়স্থল হইয়াছেন। রাজপুত্রগণ রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন এবং কুটুম্ব শ্রেণীর রাজ কুটুম্ব ঠাকুরবর্গ তাঁহাদের অধীনস্থ সহকারী হইলেন। দলে দলে নব্য পাশ-করা টিয়া পাখী আমদানি বন্ধ হইল এবং Budget ও Heading স্বস্থানে পহুছিয়া গেল। মহারাজ হিমালয়বাসে আরামে ছিলেন। অনেক ঝুলন তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে তিনি ঝুলনমঙ্গল গীত গাহিবার জন্য সুপ্রশস্ত সময় পাইলেন। একথা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীযুক্ত আশুতোষ বাবু স্পষ্ট জানেন। কিন্তু তাঁহার শেষ ঝুলন তাঁহাকে স্বাস্থ্যহানি ঘটাইয়াছিল। ৩৪ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি রাজ্যভার পাইয়া শেষ বয়সে ভারাক্রান্ত হইয়া হয়রাণ হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের ঘটনা এবং রটনা এত স্তূপীকৃত হইয়াছিল যে তাহা বর্ণনা করিতে আমি অক্ষম। কারশিয়াং বাসকালে তিনি প্রায়ই বলিতেন ঃ—

''ইংরেজী শাস্ত্রমতে রাজার স্বাধীনতা অর্থ পরের চর্ব্বিত খাদ্য গলাধঃকরণ করা। দাঁত পড়িলে নকল দাঁতের আবশ্যক

হয়। তুই দেখিস আমার একটা দাঁতও পড়ে নাই। আমি কেন পরের চর্ব্বিত জিনিষ ভক্ষণ করিব? দাদা মহারাজ ইংরেজী ভাষা পাঠ করিলেই প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করিতেন। আমি কিন্তু ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করা উচিত মনে করিয়াই তোদের বিদেশে পাঠাইয়াছিলাম। পাশফাশের জন্য নহে, অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য। যদি তোদের দ্বারা রাজ্যের কোন সেবা না হয় তাহা হইলে তোরা মরিয়া যা, আমি অতি বৃদ্ধের মত নকল দাঁত বসাইয়া লইব।"

রাজপদ সেবা করিয়া অনেক সময় অনেক কথা শুনিয়াছি, অনেক আন্তরিক কথা অন্তরে আছে তাহা প্রকাশ করিয়া পাঠকবর্গের কর্ণশূল উৎপাদন করিতে চাই না। তবে বর্ত্তমান সময়ে আমাদের রাজনৈতিক আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে, শারদীয় আকাশে ছায়াপথ পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। কেবলমাত্র দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের প্রয়োজন। তাহা হইলে দিশেহারা হইতে হইবে না। বীরচন্দ্র একদিন বলিয়াছিলেন—কোন এক ঠাকুর লোক কর্ম্মচারী স্থলে একজন এম. এ, বি, এল ৭০্ টাকা মাসিক বেতনে সস্তায় পাইয়া উমাকান্ত বাবু পুলকিত হইয়াছিলেন। ''বিশ্ববিদ্যালয়ের মাত্রায় যদি আমাদের উপযুক্ত অনুপযুক্ত ভেদ করিতে হয় তাহা হইলে আমাকে সর্বাগ্রে বরখাস্ত হইতে হয়। এম,এ, বি, এল রাজা না হইয়া এম, এ, বি, এল যুবরাজ না হইয়া যদি নিজ নিজ কর্ত্তব্যপালন করিতে পারে তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিশূন্য আমার জ্ঞাতি কুটুম্বও পারিবে। আমার জীবনে ইহা ঠিক জানি—''সস্তায় পস্তাইতে হয়।"

এই নীতির মর্য্যাদা রক্ষার্থ বর্ত্তমান সময়ে বিকানীরের মহারাজা তাঁহার ১৮ বৎসর বয়স্ক বালক যুবরাজকে ''প্রধানমন্ত্রী" পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

২৫ বৎসর পূর্বে বীরচন্দ্র যে উদ্দেশ্যে এবং যে ভাবে নিজ পুত্রগণকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ইহা নিশ্চয়ই দূরদর্শীতার অকাট্য প্রমাণ। পাকা হাতে এবং ৩৪ বৎসর একাধিক্রমে একটি স্বাধীন রাজ্য তিনি যেরূপ সুশাসন করিয়া গিয়াছেন ইহাতে আমি বলিতে পারি তিনি সংসারের নাগরদোলায় দুলেন নাই কিন্তু ঝুলনমঙ্গল গীতের সঙ্গীত সমূহের বৈষ্ণব ভাবের ভাবুক ছিলেন। তাঁহার হৃদয়ের মর্মস্পর্শী ভাব ঝুলনে ঝুলিয়াছিল এবং তিনি বৈষ্ণব দার্শনিকের জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণব তন্ত্র এবং রাজনৈতিক তন্ত্র এক জিনিষ। একথা স্বয়ন ভাবুকতন্ত্রের জীবের জ্ঞাতব্য বিষয়।

এই বিষয়ে আমাদের কবি নবীনচন্দ্র সেন যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করা গেল—''বীরচন্দ্র মাণিক্য বড় চতুর লোক ছিলেন। তাঁহার বোধ হয় সন্দেহ হইয়াছিল এজেন্ট মহাশয় (উমাকান্তবাবু) কেবল তাঁহার মন্ত্রী হইবার জন্য তাঁহার উপর এ সকল উৎপীড়ন ঘটাইতেছেন"। তাঁহার প্রকাশিত ''আমার জীবন" পঞ্চম ভাগ ৩৭৫ পৃষ্ঠা পাঠ করিলে ইহার বিস্তারিত বিবরণ পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন।

ঝুলন-স্মৃতি উপলক্ষে বীরচন্দ্র মাণিক্য সম্বন্ধে যথাসম্ভব আমি তাঁহার চরিত্রের গভীরতম অংশে প্রবেশ করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি পাঠকবর্গ তাহা জানেন। ৩৪ বৎসর যাবত তিনি রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন। আমার জন্মের পূর্বের কথা। কাজেই শ্রুতি এবং স্মৃতি ছাড়া তাঁহার চরিত্রকে বিশ্লেষণ করার অন্য উপায় নাই। বিশেষতঃ তাঁহার সময়েই ত্রিপুরা রাজ্যের, ইংরেজ গভর্ণমেন্টের সহিত সর্ব্বপ্রথম সম্বন্ধ স্থাপিত হয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সন্ধিস্থলে দাঁড়াইতে হইয়াছিল বীরচন্দ্র মাণিক্যকে। ইতিপূর্বে যাঁহারা ত্রিপুরারাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন (Oriental) ভারতীয় রীতিতে-কিন্তু বীরচন্দ্র শাসন করিয়াছিলেন Oriental and occidental উপায়ে। ইহার চরিত্র বুঝিতে যাওয়া সহজসাধ্য নহে। কিন্তু তাঁহার মনোগত রাজতন্ত্র চালাইবার প্রধান অন্তরায় হইল The Political Agent, এ বিষয়ে আমি B.M. Malabari এর Native States গ্রন্থখানার শরণ লইতেছি ঃ—

"A masterful 'Political' loves to brush aside the ruler as of little account practically relieving him of all responsibility. Lord Mayo described him 'a dangerous official'. He himself rules through a Prime Minister or a Council who intrigue against their own Chief. It is to their advan-

tage to prevent all good understanding between the Rajah and his Political''.

তখন ছিল রক্ষণশীল নীতি। ইংরেজ (official) কর্ম্মচারীগণ অবাধ ক্ষমতাপ্রাপ্ত। পক্ষান্তরে বীরচন্দ্র ছিলেন Oriental Prince (পূর্ব্বদেশীয় রাজা) একাধিপতি। তাঁহার ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপ করিলে তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। বিশেষতঃ রাজা প্রজার মধ্যে নৈকট্য সম্বন্ধ ছিল। প্রজাগণ তাঁহাকে দেবতার মত দেখিত। এই প্রজাগণ-সম্মুখে ইনি একজন সামান্য 'ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট' রূপে ব্যবহৃত হন—কিছুতেই তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। অথচ ইংরেজ গভর্ণমেন্ট কর্ম্মচারীগণ চাহিতেন ব্রিটীশ অনুকরণে তাঁহার রাজ্য চলে। B.M. Malabari বলিতেছেন ঃ—

" Unfortunately, the better educated and more capable a chief is, the more he feels the anomaly of his position, the more he wishes to make a stand for his rights the more determined is the opposition he has to face. It is here that the system fails, as it makes no allowances for persons who are anxious to administer their state justly, and to do the best they can for their people and for the Supreme Government''

" But the intervention of the Political Agents does not produce a happy impression on the Princes. It is difficult to convince them that the acts of the ''Political'' are not someitmes due to prejudice, the spirit of contradiction and a pretty desire to parade his own importance.''

এই কারণেই বীরচন্দ্রের সহিত গভর্ণমেন্টের বনিবনাও হয় নাই এবং হইতে পারে না। শ্রুতিতে যাহা শুনিয়াছিলাম ইহাই উপলক্ষ করিয়া আমার জন্মের পূর্ব্বের ঘটনা ও রটনা পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবৃত্তির ইচ্ছায় সত্য কথা বলিতেছি।

বীরচন্দ্র এক্ষণে স্বর্গে এবং তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষও প্রায় সকলেই গতাসু। গবর্ণমেন্টের দপ্তর এবং আদালতের নজির খোঁজ করিবার দরকার নাই। অতএব সাহিত্যিক দরবারে সত্যকথা বলাই নিরাপদ মনে করি। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভাই ছিলেন পরম বৈষ্ণব এবং গুরুগত—প্রাণ মহারাজা ঈশানচন্দ্র মাণিক্য। রাজ্য গুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া তিনি নিষ্কন্টকে বৈষ্ণবধর্ম অবলম্বন করিয়া কাল কাটাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যৌবনেই (৩৪ বৎসর বয়সে) মহাপ্রস্থান করেন। তাঁহার পুত্র সন্তান ছিল কিন্তু পাছে ''নাবালক'' বলিয়া গভর্ণমেন্ট এই রাজ্যে হস্তক্ষেপ করে এই আশঙ্কায় প্রজাবৃন্দ এবং দেশের কূটনীতিজ্ঞ লোক মিলিয়া একরাত্রের মধ্যে সহোদর ভ্রাতা বীরচন্দ্রকে রাজ্যাধিকার দিয়া বসিল। কারণ ইনি তৎকালে রাজপুত্র রূপে চলিতেন, রাজাকে সহায়তা করিতেন এবং রাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থা জ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু আদালতে উপস্থিত হইলেন অধিকার প্রাপ্তির জন্য বৈমাত্র ভ্রাতা নীলকৃষ্ণ; তিনি চরিত্রে এবং বিদ্যায় বীরচন্দ্র হইতে অনেক লঘু ছিলেন। কেবলমাত্র ব্রিটিশ এলাকার বিস্তীর্ণ জমিদারীর জন্য তিনি এক মোকদ্দমা আনিয়াছিলেন। মোকদ্দমার যেমন দস্তুর, প্রায় আট বৎসর পরে প্রিভি কাউন্সিল (Privy council) হইতে হুকুম হইয়াছিল' বীরচন্দ্রই প্রকৃত রাজা হইবার উপযুক্ত পাত্র ও কুলপ্রথা বীরচন্দ্রের পক্ষে।' এই দীর্ঘকাল তিনি Defacto Ruler ছিলেন এবং কলাবিদ্যার অঞ্চল ধরিয়া সুখে সচ্ছন্দে ছিলেন। মোকদ্দমাঘটিত জল্পনা—কল্পনা, সত্য এবং মিথ্যাকথা খানদান এবং পানদারের ধার ধারেন নাই। প্রজাকুল সে কুলের কাণ্ডারী ছিল এবং নৌকা কর্ণধারের মতেই চলিয়াছিল। কাজেই বান্চাল্ হয় নাই। তাঁহার অভিষেকের পর সর্ব্বপ্রথম পলিটিক্যাল এজেন্ট নিযুক্ত হইয়া আসে। বীরচন্দ্র বুঝিলেন আমার উপর একটা Master (প্রভু) নিযুক্ত হইল। বাস্তবিক তাহাই হইয়াছিল। প্রথমে Lusai Expedition উপস্থিত হয়, পরে Eastern Boundary লইয়া তর্ক বাধে। School, Dispensary, Municipality, Jail প্রভৃতি প্রবর্ত্তনার জন্য অনুরোধ আসিয়া উপস্থিত হইল। তারপর Budget এর কথাও অন্তঃসলিলা ভাবে চলিতে লাগিল। কত কথা, কত বার্ত্তা, কত আপদ, কত জঞ্জাল, কেলেঙ্কারীর কম হয় নাই।

ভাল গোলাপেরই অতিরিক্ত কাঁটা থাকে। কিন্তু সুধীজন মনে করে ঃ—

''গোলাপ ফুল ফুটিয়া আছে,
মধুপ হেতায় যাস্‌নে।''

কিন্তু মধুপ তাহাতেই যাইয়া থাকে, কাঁটার ঘা খাইয়াও মধু পান ছাড়ে না। Oriental Prince গুলির অবস্থাও তাই। কর্ণতুল্য দানে, কৃষ্ণতুল্য জ্ঞানে এবং রামের মত রাজা যদি কেহ হইতে পারে এই ভারতীয় প্রাচীন নৃপতিগণই সে পদবাচ্য হইতে পারেন। আমি বলিয়াছি ''বীরচন্দ্র বজ্রের মত কঠিন এবং কুসুমের মত কোমল'' ছিলেন। তাঁহার এই চরিত্রকে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীগণ কিছুতেই বুঝিতে পারিত না। কাজেই তিনি উভয়কুল অর্থাৎ Government ও On Deputation এ প্রেরিত কর্ম্মচারীবর্গের এবং ভিন্ন দেশীয় কর্ম্মচারীবর্গের মনস্তুষ্টি করিতে পারিতেন না। আদালত হইতে রক্ষা পাইলেন কিন্তু Government of Bengal হইতে মুক্তি পাইলেন না। কাজেই তিনি নিজ ধর্ম্ম রক্ষা করিতে গিয়া পদে পদে বাগবিতণ্ডা এবং মাঝে মাঝে ঝগড়া তদুপরি দুর্জ্জয় মান করিয়া বসিতেন।

স্থায়ীভাবে একজন Political Agent তাঁহার দরবারে নিযুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু ভারতীয় নৃপতিবৃন্দের গ্রহবৈগুন্যে এই Political Agentগণ হইল Defacto Ruler। তাঁহার প্রায় সমস্ত রাজ্যগুলিতে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। কাজেই ত্রিপুরাতেও সেই রীতি ও নীতি যথাযথ প্রতিপালনের অদম্য চেষ্টা চলিতে লাগিল। হাঁসের পক্ষে যাহা ডিম্ব বলিয়া গণ্য হয় রাজহংসের পক্ষেও তাহাই গণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু বীরচন্দ্র জানিতেন পাতিহংস হইতে রাজহংস অনেক পৃথক পাখী।

প্রথমেই 'খটাখটি' বাধিল Indian Princes and Chief শব্দ লইয়া। ''তিনি কখনও Chief নহেন এবং সর্দ্দার ত কখনই নন''। তাঁহার পুত্রগণ (Prince) (প্রিন্স) নামে অভিহিত হইতে পারে কিন্তু ছেলের বাপ কখনও এ নামে অভিহিত হইতে পারে না। সর্ব্বপ্রথম ''Coronation'' শব্দটা লইয়া আপত্তির কারণ হইয়াছিল। আপত্তিকারী প্রমাণ করিতে চায় Crown হইতে Coronation নামের উৎপত্তি। কাজেই British Crown এর নিম্নতম ব্যক্তি এ শব্দ ব্যবহার করিতে পারে না। বীরচন্দ্র রসিক ছিলেন এবং জানিতেন ''রসিকতা ও রসের কথা''। তিনি বলিয়াছিলেন ''আমি Crown রূপী তাজ মাথাই দেই না কিন্তু মুকুট ধারণ করি প্রজার জন্য। ''Throne'' শব্দটা হিন্দুবাচক শব্দ নহে। আমি ছবি দেখিয়াছি এবং গল্প শুনিয়াছি পুরাকালে যখন Europe প্রায় অসভ্য ছিল তখন যে পাথরে Anglo-Saxon রাজগণ বসিয়া শাসন করিতেন তাহা অদ্য পর্য্যন্ত ''Throne'' নামে অভিহিত হইয়া আসিয়াছে। ''সিংহাসন'' দেখিলেই মনে হইবে সিংহ মূর্ত্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া যে আসন প্রস্তুত হয় তাহাই সিংহাসন। ইহা দেবতার আসন; দেবাসন ব্যতীত অদ্য কোন আসনে হিন্দু রাজা বসেন না। ''Court'' শব্দ শুনিয়া মনে হয় Cromwell এর আমলের কথা। Court তখন প্রায় সমূলে বিনশ্যতি হইবার মত হইয়াছিল। দরবার (Durbar) হিন্দু শব্দবাচক নহে, কিন্তু ''রাজ সভা'' উপযুক্ত শব্দ। কারণ, এই সভায় প্রবেশাধিকার সকলের নাই। ''রাজপণ্ডিত'' ''সভাপণ্ডিত'' এবং ''দ্বারপণ্ডিত'' প্রভৃতি শব্দ এবং ''রাজমন্ত্রী'' ''অমাত্য'' '' রাজদূত'' প্রভৃতি শব্দ দ্বারা বুঝা যায় হিন্দু রাজাকে দরবারে বসিবার জন্য অনুরোধ আমন্ত্রণ করা বৃথাড়ম্বর। এই ভাবে তিনি প্রথম সিংহাসনস্থ হইলেন তোপের আওয়াজে এবং British Political Officer তাঁহাকে ত্রিপুরার রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। Lord Willie Brown আসিয়া British প্রতিভূরূপে কার্য্য সমাধা করিয়া গেলেন।

বীরচন্দ্রের অভিষেকের সময় আমার বয়স ছিল ৭ বৎসর। আমার পিতৃদেব ছিলেন তাহার বিশ্বস্ত লোক। পদ ছিল ''আলা হাজারি'' মাসিক খোরাকি পাইতেন ৭টাকা। এবং অন্যান্য যাবতীয় খরচ পাইতেন রাজভাণ্ডার হইতে। এই ছিল তখনকার অবস্থা ও ব্যবস্থা। আমার আজও বেশ মনে আছে অভিষেক কার্য্য সমাধা করিয়া এবং রাজ-অন্তঃপুরের স্ত্রী-আচার সম্পন্ন করিয়া যখন বীরচন্দ্র আসিয়া নিজকক্ষে উপস্থিত হইলেন এবং মাথার মুকুটখানা নামাইয়া আমার পিতৃহস্তে দিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন ''ভারত নেও তোমার Crown এবং Sword, আমাকে বোধ হয় চিরকালই যৌবরাজ্যে জীবন কাটাইতে হইবে।'' পিতৃদেবের কর্ত্তব্য ছিল রাজবেশ ও রাজমুকুট রক্ষা করা। তিনি অবাক্ হইয়া গেলেন আর পার্শ্বস্থ এই শিশুপুত্রটী (লিখক) বুঝিয়াছিল যেন একটা মেঘের সঞ্চার হইবার উপক্রম হইয়াছে।

বীরচন্দ্র বৈষ্ণবভাবেই ঝুলন—গীতি গাহিয়া গিয়াছেন–রাজবেশের ভিতর দিয়া তাঁহার পূণ্যময় জীবনের স্বর্গীয় আলোকের যে আভাস পাইয়াছি তাহাই যথাসাধ্য বর্ণনা করিয়াছি। ভুল চুক যাহা আছে তাহা পাঠকবর্গ মার্জ্জনা করিয়া লইবেন।

হোরি।

রাজপুতনায় যেমন ফাগ উৎসব—ত্রিপুরায় তেমনি হোরি। রাজা হইতে প্রজাবৃন্দ এ উৎসবে সকলে মাতোয়ারা; সাধ্য কি কাহারও যে সে—দিন পরিধেয় বস্ত্রের শুভ্রতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারে! সেদিন যে লালে লাল, ফাগের দাগে ত্রিপুরার হৃদয় রক্ত—রাঙ্গা,—ভাবময়,—সে দিন কে কাহাকে মান্য করে! কে ছোট কে বড় —আনন্দ—আনন্দ,—হোরি—ফাগুয়া!—হরষ—পরশে সব একাকার!!—সেদিনের সেই মাতোয়ারা ভাব স্মরণে আসিলে আগে মনে পড়ে ত্রিপুরাধিপতি বীরচন্দ্রের কথাবার্ত্তা।—মনে পড়ে তাঁহার গান—

''লালে লাল আজি কাল তনু,
বৈর নারী শত, একলা কানু!
পড়েছে ছিঁড়িয়া নব গুঞ্জ—ছড়া
হেলিয়া পড়েছে মোহন চূড়া''। ইত্যাদি-

সে রঙ্গ কি একা সম্ভোগ করিবার! রাজপ্রাসাদে সে দিনের আহ্বান আনন্দের আহ্বান, কুটুম্ব-মেয়ে-মহলে সে দিনের নিমন্ত্রণ আহারের জন্য নহে, আবির অবগাহন হেতু রাজদরবারে তলব পড়িয়াছে দরবারের জন্য নহে, ফাগুয়া উৎসবে মাতিতে। এ সময় কর নহে রজত মুদ্রা—প্রজাবৃন্দের ভক্তিমিশ্রিত অঞ্জলীকৃত সুবাসিত আবির; আর প্রতিদিন তার ''প্রসাদী রাঙ্গাধুলীকণা।'' সকলেই উৎসবে উন্মুক্ত; রাস্তাময় বালকবৃন্দ মর্কট আকার ধারণ করিয়া বসিয়াছে, গোলাপী রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া আর ঐ রঙ্গের উৎস জলের পিচকারীর নল হাতে লইয়া। কাহারও সাধ্য নাই এই মর্কট শ্রেণীর অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করে। ইহাদিগকে কোন উৎকোচই প্রলোভিত করিতে পারে না। বরং তাহাতে আরও তাহাদের উৎসাহ, অত্যাচার বৃদ্ধি হইয়া পড়ে। পঞ্চ দিবারাত্র এই ভাবে উৎসব চলে, পঞ্চ দিবস উৎসব শেষ করিয়া পরে ''বহ্ন্যুৎসব'' উপভোগ সমাপণ অন্তে শান্তি লাভ করিয়া থাকে।

মনে পড়ে—সেদিন একটী তরুণ বয়স্ক ঠাকুর—লোক যে তান ধরিয়াছিলেন। বীরচন্দ্রের দরবারের ছিলেন দরবারী কবি (এখনও যিনি জীবিত আছেন; বোধ হয় অশীতি বৎসরে পদার্পণ করিয়া থাকিবেন) শ্রীযুক্ত মদনমোহন মিত্র,—তিনি ছিলেন রাজকবি—সুরসিক—স্বভাবকবি—তিনি বীরচন্দ্রের সাথী ছিলেন, প্রকৃত কথা বলিতে গেলে ছিলেন ইয়ার। তাঁহারই কৃত একটী সময়োপযোগী সঙ্গীত আজও যেন ঝঙ্কৃত হইতেছে—

'রাঙ্গাধূলি ব্রজের পথে
কিবা রাঙ্গাধূলি
আবিরে ....।
ব্রজ–গোপীকার চরণ পরশ রসিক
যমুনার পুলিন পথে, রাঙ্গাধূলি,

রাঙ্গা বেণু পরে ধেণুর পদচিহ্নবাজি রাজে
ব্রজগোপ শিশুগণের পদচিহ্ন মাঝে মাঝে
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ রেখা, আছে যেই পদে লেখা,
সে পদচিহ্ন যায় রে দেখা,
আবির মাখা গোঠের পথে।
কমলা যে ধূলা চাহে সে ধূলায় হব লীন
কবে হবে হেন ভাগ্য, কবে হবে হেন দিন
ভবের ধূলাখেলা ত্যজে ধূলার তরে যাব ব্রজে।
গায় মেখে সেই রাঙ্গা রজে,
বেড়াব পথে পথে, রাঙ্গাধুলি।

গানটী স্মরণে আসিয়া যুগপৎ একটী ভাবোদয় হইল। বলিতে গেলে বৈষ্ণব দার্শনিকের 'কিল কিঞ্চিৎ' ভাব উপস্থিত হইয়া শিশু কিশোর এবং যৌবন কালের কথা মনে হইল ! পূর্ব্বে ''ঝুলন লীলা'' নামক প্রবন্ধে বীরচন্দ্রের দরবার সম্বন্ধে ঘটনা বশতঃ আনুসাঙ্গিকরূপে সে কথা কিছু বলিয়াছি। আজ এই পরিণত বয়সে, সে সব ভাব সেবাধিকারীরূপে পাইয়া ছিলাম; ফাগুনের আবিররঞ্জিত ধূলীকণার সহিত ফাগের রাগে তাহা আমার মনে যে, হোরি খেলার ভাব উপস্থিত করিয়াছে; তাহা বলিতে কিম্বা লিখিতে আমি অসক্ত। 'গুণী গুণবান লোককে আকর্ষণ করে; যেমন চুম্বকলৌহ লৌহকেই আকর্ষণ করিয়া থাকে কিন্তু নির্গুণকে গুণবান লোক পরিত্যাগ করেন। বীরচন্দ্র যেমন নানা বিষয়ে রসিক ছিলেন তেমন সঙ্গীও জুটিয়াছিল, সবশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সে সময় প্রত্যেক বিভাগে ছিলেন। কিন্তু বীরচন্দ্র সকলের নিকট দাড়াইয়া তীক্ষ্ম নয়নে দেখিতেন, শুনিতেন এবং বিচার করিতেন। কোন দিনই তিনি কাহারও নিকট শিক্ষাও পান নাই এবং দীক্ষাও লন্ নাই। নিজ কামরায় বসিয়া আপন মনে সব বিদ্যার তত্বান্বেষণ করিতেন। এ বিষয় আমি পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। তাঁহার সেই বাগানবাটী সর্ব্ববিদ্যার সাধনাগার ছিল। সে বিষয় ডাক্তার মুখার্জ্জি কৃত Travels to Independent Tipperah—নামক গ্রন্থে যেভাবে বিবৃত আছে তাহাই আমি পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিবার জন্য সাহসী হইয়াছিলাম।

এ প্রবন্ধে তাঁহার সঙ্গীতবিদ্যার সমালোচনা উপলক্ষে তৃপ্ত্যর্থে আমি যাহা জানি ও প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাই প্রকাশ করিতেছি। সর্ব্বপ্রথম বলিতে হয় তিনি শাস্ত্রানুসারে সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু কখনও তাঁহাকে অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট বলিয়া কেহ বলিতে পারিত না। বর্ত্তমান সভ্যযুগে অদ্য পর্য্যন্ত বাই খেম্‌টা বা অভিনেত্রীবর্গের দ্বারায় সঙ্গীতরস পাইবার জন্য সকলে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন এবং তাহাতে 'বাহবা' পান। যৌবনকালে বীরচন্দ্র কোন দিনও সে রসে রসিক হন নাই। কেন না তিনি জানিতেন এবং দেখিতেন ঐ সব উৎপাত আনিয়া গৃহে উৎপাতের পথ প্রশস্ত করা ব্যতীত তাহাতে সঙ্গীতরস পাওয়ার আশা দুরাশা।একদিনের কথা মনে পড়ে,লক্ষ্মৌসহরের বাইজিগণ সঙ্গীতশাস্ত্রে সরস্বতীতুল্যা,ইহাদের তুলনা হয় না। লক্ষ্মৌ নিবাসী কোন ভদ্রলোকের নিকট ইহা তিনি অবগত হন। তিনি সন্ধিহান হইলেন বটে, কিন্তু কৌতূহলীও হইলেন। ঐ সহর হইতে প্রসিদ্ধা 'ইমামী বাইজি'' আনা হইল এবং বহুতর বসবাসের অসুবিধা এবং প্রত্যেক বিষয়ে অভাব ইত্যাদি জানাইয়া বাইজি আমার পিতৃদেবকে হয়রাণ করিয়া তুলিলেন। বীরচন্দ্র তখন বলিয়াছিলেন ''ইহা বারবনিতার আব্দার; ইহাতেই বুঝিতে পারি এ নটী সঙ্গীতশাস্ত্রের কিছু জানে না। তুমি সব আব্দার পূরণ করিয়া দেও''।

সে দিন ছিল দোলপূর্ণিমা। বাইজির চেহারাখানা ছিল 'পাউডার মাখা; দেখিয়াই বীরচন্দ্র যেন মনে মনে হাসিলেন। বাইজী সাহেবা বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন, মহারাজ তাহাকে হস্ত প্রসারণপূর্বক আগ্রহ সহকারে 'ইহাগচ্ছ', মন্ত্রে আদব কায়দার চূড়ান্ত অভিনয় করিবেন। কিন্তু বীরচন্দ্র তাঁহার স্বভাবসুলভ গম্ভীর মূর্ত্তিতে হস্তিদন্তের চেয়ারে বসিয়া গেলেন। বাইজীকে নাচ

আরম্ভ করিয়া দিবার জন্য পার্শ্ববর্ত্তী লক্ষ্মৌনিবাসী ভদ্রলোককে ইঙ্গিত করিলেন। নাচ আরম্ভ হইল এবং তিনি নাচিলেন ভাল। কিন্তু তিনি যখন পেশোয়াজের ঘেরাটের কোণ ধরিয়া দু'হাতে অঙ্গভঙ্গি করিয়া ''কাহারোয়া'' নামক প্যাঁচ দেখাইলেন, এবং পরে দু'হাতে আবির লইয়া চীৎকারের হাসিতে কুটীলকটাক্ষ নয়নে, বীরচন্দ্রের শুভ্র অঙ্গাবরণে ফেলিয়া দিলেন, তৎক্ষণাৎ মহারাজা উঠিয়া গেলেন এবং পিতৃদেবকে হুকুম করিলেন 'বাইটাকে নাটমন্দিরে লইয়া যাও। সেখানে প্রকৃতিপুঞ্জের মনস্তুষ্টি করিতে পারিবে; তাহার মুজ্রা শেষ হইলে নগদ টাকা গণিয়া দিয়া বিদায় করিয়া দাও।' কিন্তু উপস্থিত সকলে টের পাইল, বীরচন্দ্রের বাক্যবাণের মধ্যে এমন চোখা চোখা অস্ত্র ছিল যে সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। সে অবধি তিনি কখনও ঐ সব শ্রেণীর সঙ্গীত শুনিতেন না। বাৎসরিক পূজা, দোল প্রভৃতিতে এ সব নটীবর্গের আসা প্রায় নিত্য নৈমিত্যিক ছিল বটে। আবহমান কাল হইতে প্রকৃতি পুঞ্জের তৃপ্ত্যর্থে, তাহা তিনি বন্ধ করিলেন না। কিন্তু নিজে সে আসরে বসিতেন না।

সঙ্গীতশাস্ত্রে তাঁহার সহায় ছিল ''বীণ'' বাদ্যকর প্রসিদ্ধ তানসেনের বংশধর কাশীমালী খাঁ। তিনি লক্ষ্মৌ সহরবাসী ছিলেন। কাশ্মীর রাজ্য হইতে আসিয়া জুটিলেন ''কুলন্দর বক্স'' নাট্যাচার্য্য। ইনি সঙ্গীতের হাবভাব দেখাইয়া এমন সুন্দর নাচিতে পারিতেন; সে নাচ দেখিলে আমার বোধ হয় অনেক নটীর উপকার হইত। তাঁহার উপাধি ছিল 'কত্থক'। গোয়ালীয়র রাজ্য হইতে আসিলেন প্রসিদ্ধ হায়দর খাঁ; সুরশীঙ্গা এবং এস্রাজ বাদ্যকর। কলিকাতা নিবাসী পঞ্চানন্দ মিত্র সঙ্গীত শাস্ত্ররসে ডুবিয়া যখন সর্ব্বাহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন তিনি বীরচন্দ্রের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন; কারণ স্বাধীন রাজ্যে বাস করিলে ব্রিটিশরাজ্যের দেনার দরুণ জেইল ভোগ করিতে হয় না। প্রথমে তিনি ছিলেন, চন্দননগরে। তিনি মরফিয়া নামক অহিফেন নিত্যসেবী ছিলেন এবং পরিমাণ ছিল দৈনিক ছয় গ্রেন্, সাধারণ লোকে ইহার এক গ্রেণ খাইলেই অসুস্থ হইয়া পড়ে। সঙ্গে ছিল একজন সঙ্গিনী, যিনি নিজ বস্ত্রালঙ্কার বিক্রয় করিয়া পঞ্চানন্দ মিত্রের আহার সংস্থান করিতেন। যখন সে উপায়ও নিঃশেষিত হইয়াছিল এমন সময় তিনি লোকপরম্পরায় বীরচন্দ্রের গুণাবলীর,—বিশেষ তাঁহার সঙ্গীতবিদ্যাপারদর্শিতার সংবাদ পাইয়া রাজধানীতে আসিয়া জুটিলেন, সঙ্গিনী সহ। সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ বীরচন্দ্রের দরবারে তিনি পাখোয়াজ ঢোল উত্তম বাজাইতে পারিতেন এবং তাহার চেহারাখানা ছিল শিবতুল্য। বীরচন্দ্রের উঠানো তাঁহার ফটো আমার নিকট আছে। ইহার সম্বন্ধে আমার বিশেষজ্ঞতার কারণ ছিল; ইনি আমাদের প্রতিবেসী ছিলেন এবং পিতৃদেব তাঁহার নিকট পাখোয়াজ বাদ্য শিক্ষা করিয়াছিলেন। এজন্য পিতৃদেব তাহাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবৎ দেখিতেন ও তদ্রূপ ব্যবহার করিতেন। বিশেষ কারণ ছিল—ইনি পুত্রহীন; এজন্য তিনি আমাকে পুত্রবৎ দেখিতেন এবং তাঁহারই উদ্যোগে ও উৎসাহে আমাকে শিক্ষার্থে কলিকাতা যাইতে হইয়াছিল। তাঁহারই একজন ভায়রা ভাইয়ের বাড়ীতে আমি বাস করিতাম। এই সূত্রে আমি কলিকাতা সমাজে মিশিতে পারিয়াছিলাম। একথা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমার কর্তব্যজ্ঞানে কৃতজ্ঞতাসহকারে ইহার উল্লেখ করিতে হইল।

পঞ্চানন্দ মিত্রের দরুণ আমাদের রাজ্যের পলিটিক্যাল এজেন্টের সহিত বীরচন্দ্র মাণিক্যের কতক বচসার কারণ হইয়াছিল। তাঁহারই উত্তমর্ণগণ আগরতলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দরবারিদের দরবার করিতে লাগিলেন। সব দেশীয় রাজ্যের দরবারে যাহা ঘটিয়া থাকে ফল তাহাই হইল। মরফিয়াসেবী বলিয়া এবং চরিত্রহীন বলিয়া পঞ্চানন্দ মিত্রের বিপক্ষে একদল দাঁড়াইলেন; এবং অপর দল পঞ্চানন্দ মিত্র ধনহীন ভদ্রসন্তান এবং সঙ্গীতশাস্ত্রে পারদর্শী বলিয়া তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিলেন। যখন প্রথমোক্ত দল বিফল—মনোরথ হইয়া পড়িলেন তখন উত্তমর্ণগণকে রাজ—দরজা উল্লঙ্ঘন করিয়া পলিটিক্যাল এজেন্টের দরজা দেখাইয়া দিলেন। ফল যাহা হয় তাহাই হইল। Jurisdiction বিহীন রাজ্যে জোর করিয়া অধমর্ণের দেনা শোধ করিয়া দিতে বীরচন্দ্র অক্ষম বলিয়া, উত্তর দিয়াছিলেন। (Political Agent)পলিটীক্যাল সাহেব; রাজাকে 'আবগারীর—গোলা' বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন। পঞ্চানন্দ মিত্র ২২ বৎসর যাবত এ রাজ্যে ছিলেন এবং 'নিজ—তহবিলে' দেওয়ান পদে কর্ম্ম করিয়াছিলেন। পর জীবনে বীরচন্দ্রের নিকট মাসিক ৬০্ টাকা অবসরবৃত্তি–প্রাপ্ত হইয়া কাশীবাস করিয়াছিলেন এবং তথাতেই পঞ্চানন্দ মিত্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

পঞ্চানন্দ মিত্র আর একটি ভদ্রসন্তানকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বর্গীয় স্যার রমেশ মিত্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কেশব মিত্র। তিনি একজন Amateur পাখোয়াজ বাদ্যকর। কলিকাতার কোনও এক প্রসিদ্ধ পরিবারের সন্তান। তিনি শিক্ষিত এবং সঙ্গীত শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। বীরচন্দ্রের দরবারের কথাবার্ত্তা শুনিয়া তিনি পঞ্চানন্দ মিত্রের শরণাপন্ন হন এবং বীরচন্দ্র মাণিক্যের দরবারে দরবারি হন। তখন কলিকাতা আসা যাওয়ার পথ দুর্গম ছিল E.B. Ry লৌহবর্ত্মের শেষ সীমানা ছিল বর্ত্তমান কুষ্টিয়া ষ্টেশন পর্য্যন্ত। তথা হইতে নৌযানে আগরতলায় পঁছিতে ১০/১২ দিন লাগিত। মেঘনা প্রভৃতি পান্ডব বর্জ্জিত(?) নদী বা নদসমূহ পারাপার হওয়া কি দুঃসাধ্য ছিল। আমরা অদ্যকার দিনে তাহা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারি না। কলিকাতানিবাসী ভদ্রসন্তানগণের আহারেরও ঘটা ছিল। কিন্তু তাহা আগরতলায় পাওয়া দুঃসাধ্য ছিল। তখন তাহারা মিলিয়া একটি ফল, ফুল ও সবজী বাগান করিয়া লইলেন এবং সেই বাগানে অন্নপূর্ণা দেবীর পূজা করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষেই কলিকাতা হইতে পাচক এবং মোদকদিগকে আনান হইয়াছিল। 'ভীম নাগের' সন্দেশ তখন আমরা বালকবৃন্দ আগরতলায় বসিয়া উপভোগ করিয়াছিলাম। কলিকাতা যাইয়াও 'ভীম নাগের' দোকানে উপস্থিত হইয়া সেরূপ সন্দেশ না পাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসায় জানিলাম, বাঁশপাতা আহারের দরুণ আগরতলায় গাভীর দুগ্ধ যেমন ক্ষীরপূর্ণ তেমন দুগ্ধ কোথায়ও পাওয়া যায় না। কেশব মিত্র যেরূপ বাজাইতেন— পিতাঠাকুরের নিকট শুনিয়াছি তেমন বাদ্য তিনি কাহারও নিকট হইতে কখনও শুনেন নাই। ইনিও আমাদের Next door neighbour প্রতিবেশী ছিলেন তখন আগরতলায় চতুস্পার্শ্বে জঙ্গলাবৃত ছিল। প্রাতঃকৃত্য সমাপন কালে 'চিনা জোঁক' তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিত। কিন্তু তাঁহারা বলিতেন 'জোঁক' আর কত রক্ত খাইতে পারে। বাস্তবিক বীরচন্দ্রের দরবারে গুণী ও মানীলোকের একটি অপূর্ব মিশ্রণ ব্যাপার হইয়াছিল। সে সব কথা এ প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক।

বিষ্ণুপুরনিবাসী প্রসিদ্ধ স্বাভাবিক গায়ক যদুভট্ট (যিনি কলিকাতায় বড় বড় লোকের দরবারেও গতিবিধি করিতেন) আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—কাশ্মীরের মহারাজা হইতে তান—রাজ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া। তিনি নিজ মুখে বলিয়াছিলেন তদানীন্তন কাশ্মীরের মহারাজা হইতে তিনি জানিতে পারিয়াছেন 'একজন বাঙ্গালী রাজা সঙ্গীত শাস্ত্রে বড় গুণী আছেন। আপনি তাঁহাকে আপনার স্বরচিত সঙ্গীত শুনাইয়াছেন কি? তিনি তখন লজ্জিত হইয়া কলিকাতানিবাসী প্রসিদ্ধ রাজা দিগম্বর মিত্রের নিকট উপস্থিত হইলেন, তাঁহারই পরিচয়পত্র হাতে লইয়া ভট্ট মহাশয় ত্রিপুরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবার বিধাতা ত্রিপুরা-দরবারে মণি-কাঞ্চন যোগ করিয়া দিলেন। সে মণিকাঞ্চন যোগে তৎকালে বীরচন্দ্রের দরবারে যে সঙ্গীত-উৎসব দেখিতে পাইয়াছিলাম তাহা স্মরণে আসিলে মরমে আজিও ব্যথা পাই। এখন পর্য্যন্ত কলিকাতা, কাশী প্রভৃতি স্থানে ভট্ট মহাশয়ের স্বরচিত সঙ্গীত শুনিয়া এবং তাহাতে ত্রিপুরার বীরচন্দ্র নাম সংযুক্ত থাকার দরুণ এবং মাঝে মাঝে 'তানরাজ' শব্দ যোগ ছিল বলিয়া আমার স্বতঃই মনে হয়—

'রাঙ্গা রেণু পর ধেনুর পদচিহ্নরাজি রাজে
ব্রজগোপ শিশুগণের পদ চিহ্ন মাঝে মাঝে।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ—রেখা, আছে যেই পদে লেখা,
সেই পদচিহ্ন যায় রে দেখা,
আবিরমাখা গোঠের পথে'।

সেই পরিত্যক্ত দরবার স্বপ্ন–আলোকে এখনও যে সব পদচিহ্ন মানস–নয়নে দেখিতেছি তাহা এই সঙ্গীতের সহিত প্রায় মিল হইয়া যায়। ১৮৮৩ খৃঃ পত্নীবিয়োগে বীরচন্দ্র আকুলিত হইয়া পড়িয়া ছিলেন। তখন তাঁহার সব বিদ্যা রাজঅন্তঃকরণ হইতে একে একে লয় পাইতে লাগিল। তাহা স্মরণ হইলে মনে পড়িয়া যায় মাইকেল দত্তের কবিতা ঃ—

'একে একে শুকাইছে ফুল, নিবিছে দেউটী
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে'।

উপসংহারে বলিতে ইচ্ছা করি উপরোক্ত সঙ্গীতশাস্ত্রের রসিকগণ কেবল যে সঙ্গীত রস বর্ষণ করিয়াছেন, তাহা নয়, পলিটিক্যাল রঙ্গমঞ্চেও অনেক অভিনয় করিয়াছিলেন। সে বিষয়ে প্রবন্ধান্তরে নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি। পঞ্চানন্দ মিত্র ছিলেন একজন কৃতবিদ্য লোক। ইনি সর্বপ্রথম এ রাজ্যে Private Secretary পদে নিযুক্ত হন; তখন এ রাজ্যে Political Agent এর পদ মাত্র সৃষ্টি হইয়াছিল। তাঁহার ডায়েরী ছিল; আমি তাঁহার পঞ্চত্ব প্রাপ্তির পর কাশীধাম হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম। তাহা পাঠ করিলে তৎকালীন এ রাজ্যের অনেক খবর পাওয়া যায়। বাস্তবিক তিনি ছিলেন Political Agent ও মহারাজের মধ্যবর্ত্তী লোক। অনেক Political Agent তাঁহার বন্ধু ছিলেন (আন্তরিক ও রাজনৈতিকভাবে) এখনও পঞ্চানন্দ মিত্রের বাড়ীর অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া যাওয়া সত্বেও 'পাঁচু বাবুর বাড়ী' 'পাঁচু বাবুর সন্দেশ' 'পাঁচু বাবুর জামা' প্রভৃতি প্রবাদ বাক্য হইয়া আছে। বিলাতি শাকসব্জী ও আম্র প্রভৃতি ফলের আজকালও লোকে 'পাঁচু বাবুর বাগান' হইতে কলম করিয়া নিয়া গর্ব্ব করিতে থাকে। কেশব বাবুর দ্বারা অনেক রাজনৈতিক কাজ বীরচন্দ্র ঘটাইতে পারিয়াছিলেন। এমন কি তদানীন্তন বর্দ্ধমানাধিপতির সঙ্গে ত্রিপুরাধিপতির বন্ধুত্ব ঘটাইবার কারণও কেশব বাবু ও রাজকুমারগণের শিক্ষক ক্ষেত্রমোহন বসু মহাশয় ; তিনি পরজীবনে মহারাজা স্যার জ্যোতিন্দ্রমোহনের পারিষদ ছিলেন। ক্ষেত্রবাবুর উপাধি ছিল 'ধ্রুপদী' তাহাতে বীরচন্দ্র মাণিক্য সময় সময় রসিকতা করিয়া 'দ্রৌপদী' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। অমৃতলাল মিত্র ছিলেন একজন ভাল Chemist রসায়ন-শাস্ত্রে তাঁহার অধিকার ছিল। সেই জন্য বীরচন্দ্রের কার্য্যতঃ ছিলেন Laboratory assistant কিন্তু নামে ছিলেন তোষাখানার দেওয়ান। শ্রীযুত মদনমোহন মিত্র রাজকবি ছিলেন কিন্তু নামে ছিলেন বীরযন্ত্রের তত্ত্বাবধায়ক। স্বনামপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শম্ভূচরণ মুখার্জ্জি যদিচ সঙ্গীতশাস্ত্রের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু তিনি Associate Minister রূপে এ রাজ্যের অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন এবং অনেক বিষয়ে তিনি ব্রিটিশ নীতিকে নিন্দা করিয়া ইংরেজ রাজপুরুষগণের চক্ষুশূল হইয়াছিলেন। কেবল মাত্র ত্রিপুরা রাজ্যের Prestige (ইজ্জৎ) রক্ষা করিয়া তিনি বাদপ্রতিবাদ করিয়া চলিয়াছিলেন। অদ্যকার দিনে তাঁহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া অল্প দিন হইল 'Hill Tripura' পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া 'Tripura State' নামে এই প্রাচীন রাজ্যকে অভিহিত করিতে হইয়াছে। বীরচন্দ্রের দরবারে এইভাবে বহুবিধ গুণীর সমাবেশ হইয়াছিল—সে যেন নবরত্নের সম্মিলন ; সে নবরত্ন মহাসভার অধিপতি স্বয়ং সুরসিক সুকবি সুকণ্ঠ বীরচন্দ্র। আজও এদিনে মনে হয় ভাবে বিভোর ভক্তিতে গত গত প্রেমাশ্রুতে গণ্ড প্লাবিত করিয়া যেন বীরচন্দ্র হোরির তান তুলিয়া গাহিতেছেন ঃ–

১ম গীত

খেলত রঙ্গলাল গোলালা
ডারত রঙ্গলাল গোলালা,
দোহে দুহুঁ ভাব বিভোলা।
চৌদিকে সখীগণ নাচত
গায়ত বায়ত দফ বীণা মৃদঙ্গ।
কৃতি দ্রিমি দ্রিমি থৈতা দৃমি দৃমি কৃতি ঝং
সব সখীগণ মেলী মণ্ডলী করে কোই
কুম্ কুম্ কোই রঙ্গ গোলালা।
দুহুঁ গলে দুহুঁ ভুজে লিপটি ঝপটি
দুহুঁ দুহুঁ হৃদে মদন-হিলোলা।
দুহুঁ জন দুহুঁ রসে পুলকিত দেহ,

দুহুঁ ভাসত সুখে পাই না থেহ।
রসে ভাসল যত গোপ কোঙরী,
বীরচন্দ্র দাস যাও বলিহারি।

২য় গীত

ঐছে খেলত আজু সুরঙ্গ হোরি,
ঈথ মোহন উথ কোঁঙরী গৌরী
শ্যাম ছোড়ত যব রঙ্গ গোলারী;
ভৈ গোলালকি ঘটা আঁধেরী।
কেশব রঙ্গ ভরি লিয়ে পিচকারী,
মারতকি সখী সব ঔর গৌরী।
করলে দফ নাচতহুঁ কানাই,
মধুমঙ্গল কহুঁ জিতে হো ভাই।
সখী খেলত রসরঙ্গ অতি ভোরি,
লিয়ে সখীয়ান নাচত প্যারী।
সব সখীয়ানা দেই করতালি।
হরষ পরশ সব নিরখত দৌ,
বীরচন্দ্র দাস মগন মন রৌ।

বীরচন্দ্রের শাসনে জেল।

৫২ বৎসরের বৃদ্ধ মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য, আর তখন ছিল আমার বয়স ২২ বৎসর। বয়সে তারতম্য অনেক। সবে মাত্র পাঠ্যজীবন শেষ করিয়া আমি কলিকাতা হইতে তাঁহারই আদেশে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি। এই নূতন জীবনে নূতন রাজসেবার অধিকার পাইয়া তাঁহার A D C রূপে নিযুক্ত হইলাম। কিন্তু কাজ পাইলাম যাহা জীবনে প্রত্যাশা করি নাই, অভিজ্ঞতা একেবারেই ছিল না। বৃদ্ধের সেবা যুবকের (বিশেষতঃ কলিকাতার বৈচিত্র্যময় জীবনের মধ্যে পড়িয়া ধরা সরা জ্ঞান করিয়াছিলাম) পক্ষে কতদূর কষ্টকর ছিল তাহা ভুক্তভোগী মাত্র জানিতে পারে। এ নূতন জীবনে কষ্টও যেমন ছিল তাহার তুলনায় রস ছিল পূর্ণ মাত্রায়। বীরচন্দ্র মাণিক্যের দরবারে সে রসের রসিক হইয়া পড়িতে বিশেষ সুযোগ পাইয়াছিলাম। বীরচন্দ্র মাণিক্য মানুষ ছিলেন এবং আমার পক্ষে দেবতা ছিলেন। তিনি বজ্রের ন্যায় কঠোর ছিলেন এবং কুসুমের ন্যায় কোমল ছিলেন। ৮ বৎসর এইভাবে কাটাইতে পারিয়াছিলাম এইক্ষণে ঐ সব ঘটনা মনে পড়িলে সেই ৮০ বৎসরের বৃদ্ধের ন্যায় হইতে ইচ্ছা করে। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় তাহা হইতে পারে নাই। তিনি স্বর্গে চলিয়া গেলেন। আমার জীবন পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিল। যাক সেই সব ও বিচিত্র কাহিনী। এই বিচিত্র জীবনের একদিনের ঘটনা বলিতেছি। বীরচন্দ্র মাণিক্যের সহিত তদানীন্তন পলিটীক্যাল এজেন্টগণের দ্বন্দ্ব সমাস ছিল; টের পাইতাম বীরচন্দ্র মনুষ্যত্ব লোপ করিয়া হৃদয়বিহীন Administrative machine প্রাচীন রাজ্যে ঢুকাইতে রাজি নহে। মেশিনের 'রাজত্বিতে' যে রাজত্ব চলে সে রাজত্বির সহিত তাঁহার দ্বন্দ্ব সমাস ঘটিবেই তাহাতে বিচিত্র কি? এই দ্বন্দ্ব সমাস তাঁহার জীবন ভরা ছিল; জেইল প্রথা লইয়া তিনি সদা সর্ব্বদা দ্বন্দ্ব করিতেন। নবপ্রবর্ত্তিত মেশিন রাজ্যের জেইল তিনি পছন্দ করিতেন না। মেশিন রাজ্যের ইঞ্জিনীয়ার পলিটীক্যাল এজেন্ট সর্ব্বদা তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন,— সভ্য জগতের জেলের নিয়ম কেন তিনি গ্রহণ করিবেন না? তখন তিনি মানুষের মত জবাব দিতেন। কিন্তু মেশিন বুঝিত না, পলিটিক্যাল এজেন্ট ভদ্রভাবে ভদ্র ভাষায় তাঁহাকে নিন্দা করিত এবং মাঝে মাঝে রুষ্ট পর্য্যন্ত হইত। এজন্য ইতিমধ্যে মেশিন রাজ্যের দেশীয় ইঞ্জিনিয়ার—এসিস্ট্যান্ট আসিয়া তাঁহাকে দেশীয় ভাষায় বুঝাইত কিন্তু বীরচন্দ্র এই দেশীয় ভাষায় ছেলে ভুলানী ছড়ায় কিছুতেই ভুলিতেন না। বরঞ্চ সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে এভাবে চলিতেন। উমাকান্ত বাবু তখন দেশীয় ইঞ্জিনীয়াররূপে Assistant Political Agent পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছায় আমাদের রাজ্যের জেলে 'ঘানিগাছ' বসে। একদিন ম্যাজিষ্ট্রেট (স্বর্গীয় রাধামোহন ঠাকুর) ঘানিগাছের প্রথম তৈল যাহা পাওয়া গিয়াছিল ঐ তৈল তিন বোতল (Quart) ''শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাৎ দাখিলের জন্য'' একখানা পত্রসহ আমার নিকট পাঠাইয়া দেন। আমি যথা সময়ে এই তিন বোতল সহ পত্রখানা দাখিল করিলাম। মনে করিলাম বীরচন্দ্র মাণিক্য খাঁটি সরিষার তৈল অত্যন্ত পছন্দ করিতেন এবং ঘৃত ফেলিয়া খাঁটি তৈলে তাঁহার আহারীয় জিনিষ সর্ব্বদা প্রস্তুত হইত। তৈল পেষার জন্য Pressing machine ছিল; —আমি মনে করিলাম মহারাজের স্বভাবসুলভ—হাস্য বদন বকসিশ পাইব। কিন্তু বিপরীত কাণ্ড ঘটিয়া গেল। পত্রখানা পড়িয়া তিনি চটিয়া গেলেন এবং আমাকে হুকুম করিলেন ''রাধামোহন মানুষ দ্বারা বলদের কাজ লইল আর তুই উহা আনিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত করিলি? এখনই এই তৈল তিন বোতল চতুর্দ্দশ দেবতার পুষ্করিণীতে ফেলিয়া দে আর রাধামোহনকে এখনই তলব দিয়া হাজির কর।'' আমি অবাক কিন্তু নাচার। তিন বোতল তৈল চতুর্দ্দশ দেবতার পুষ্করণীতে চতুর্দ্দশ দেবতার উদ্দেশ্যে ফেলিয়া দিলাম

এবং চতুর্দ্দশ দেবতার বাড়ীতে যাইয়া রাজপ্রকোপ শান্তির জন্য প্রার্থনা করিলাম। যখন ফিরিয়া ''সাক্ষাৎ'' উপস্থিত হইলাম তখন বীরচন্দ্রের প্রকোপ কতটা শান্ত হইয়াছে বুঝিতে পরিলাম। বীরচন্দ্র মাণিক্য আমাকে বাৎসল্যভাবে দেখিতেন এবং আদর করিতেন। তখন তিনি চিত্রকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ঘন্টাখানেক পরে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ''এই পাপ তৈল ফেলিয়া দিয়া স্নান করিয়া আসছিস ত?'' বুঝিলাম ইহা বাৎসল্য রসের রস, কষ নাই। আমাকে তখন তিনি সম্মুখে বসাইয়া এই জেলের ঘটনা উল্লেখ করিয়া যাহা আমাকে বুঝাইবার জন্য বলিয়াছিলেন তখন আমি মন্ত্র—মুগ্ধবৎ শুনিয়া গেলাম, যাহা বুঝিয়াছিলাম তাহা এই পরিণত বয়সে অন্তরে অন্তরে আছে।

অন্যকে বুঝান আমার শক্তির বাহির। সম্প্রতি রাজকর্ম্ম হইতে অবসরপ্রাপ্ত জীবনে যখন যাহা পাই তাহা লইয়া নাড়া চাড়া করিয়া থাকি এবং মাঝে মাঝে সুখ পাইয়া থাকি। Indian Review নামক পত্রিকায় June এর সংখ্যায় Prison Reform নামে একটা প্রবন্ধ পাঠ করিতেছিলাম। মনে হইল আমি যেন বীরচন্দ্রের দরবারে আছি এবং তাঁহারই মুখ হইতে যাহা শুনিয়াছিলাম ইহা যেন তাহারই পুনরাবৃত্তি বা প্রতিধ্বনি। এই প্রবন্ধে একজন আমেরিকার সুসভ্য রাজ্যের Jail System নতুন এবং পুরাতন বিচার করিয়া লিখিয়াছেন ঃ—

In punishment the man is the object of revenge, often vindictiveness---and he is also contemplated with a large amount of fear. The old theory that the punishment must fit the crime, regardless of the individual, belongs to past ages and should be put with other useless lumber. Solitary confinement, strait jacket the dungeon and the lash intensify evil and make men bitter and revengeful. A writer inthe May number of the Theosophist deplores all these and exhorts us to improve the prison system both from a moral and economic point of view.

বীরচন্দ্র মাণিক্য আমাকে বলিয়াছিলেন ''জেইলে কয়েদী রাখা, এখনকার নির্ম্মম জেইল নিয়মানুসারে না চলিয়া দেশকালপাত্র ভেদে চলা উচিত। বৈষ্ণব নরোত্তম ঠাকুর আপশোষ করিতেন ''বহিলাম মানুষ জন্ম, করিলাম পশুর কর্ম্ম'' আর মানুষ পশুর কর্ম করিতে যাইয়া পদে পদে অপরাধী হইয়া পড়ে। সেও কর্ম্মদোষে। জেইলে পড়িয়া তাহাকে পশু জীবন পাইতে হয়। আমরা কেন তাহাকে পশু হইতে অধম তৈয়ারী করি। ইহাতে আমাদেরই পাশবিকতা প্রকাশ পাইবে মাত্র। দোষের প্রতি একটু অন্ধ হওয়া এবং গুণের প্রতি সহানুভূতি করাই মানুষের কর্ম্ম। আমরা কেন রাজা হইয়া কর্ম্মদোষের ভাগী হই। একথা কখনও ইংরেজ Political Agent কে বুঝাইতে পারা গেল না।'' কিন্তু আজ সভ্যতাভিমানী এমেরিকান সাগর পার হইতে আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া সেই বৃদ্ধ বীরচন্দ্রের কথাই বলিতেছে। The old prison system was based on the theory that punishment must fit the crime, without regard to the individual who commits the crime, the so-called criminal, Solitary confinement in iron cells, inferior and insufficient food, the lock-step, the shaven head, the strait jacket, the lash and the dungeon, have been devised to repress the evil in the man. The revers has been effected. The good in the man has been crushed, the evil intensified by the resentment at the injustice of society. Prisoners, guards, warders, society, none have escaped the degrading influence.''

বীরচন্দ্রের Sentiment পাকা ছিল। এই পাকা ব্যক্তির নিকটে গিল্টি করা জিনিষ বিকাইত না। কাজেই তাঁহার সব কাজের মধ্যেই আধুনিক শিক্ষাভিমানী আমরা দোষ ধরিতাম এবং প্রত্যেক বিষয়ই সন্দেহ নয়নে দেখিতাম। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রচণ্ড রৌদ্রের দিনে রাধামোহন ঠাকুর "By Command এ'' হাজির হইলেন, ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে এবং বিরক্তি ভরে। নতুনহাবেলী হইতে আগরতলা পাঁচ মাইল ব্যবধান কিন্তু আতপতাপে বিনা যানবাহনে পদব্রজে হাজির হওয়া কি সহজ কথা! অপরাহ্ন দুই ঘটিকার সময় রাধামোহন ঠাকুর 'সাক্ষাৎ' হাজির হইলেন বটে কিন্তু সাক্ষাৎ পাইলেন না কাজেই A.D.C র শরণাপন্ন হইতে হইল। আমি তাঁহার আত্মীয়, আগরতলায় আসিয়া তিনি সর্ব্বদা আমার বাড়ীতে বাস করেন। তখন তিনি আহার প্রস্তুতের

অপেক্ষায় ছিলাম। অতিথি পাইয়া আহারের একটু খাদ্যসামগ্রী বাড়াইবার ইচ্ছা হইল। রাধামোহন ঠাকুর চড়া সুরে আমাকে কড়া কথা বলিতে লাগিলেন। তখন প্রাতে কাছারী বসিত। রাজার হুকুম তাই অভুক্ত অবস্থায় বিনা যানবাহনে চলিয়া আসিতে হইল। ঠাকুর লোক বিশেষ আধুনিক ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার মেজাজ যে কড়া হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি তাঁহার স্নেহেরপাত্র কাজেই কড়া কথা বলা নিরাপদ মনে করেন। দাদা ভাই আহারে বসিলাম! তখন আমার নাকিসুরে কথা বলিবার অধিকার জন্মিল। অদ্যকার প্রাতে ''তৈল লইয়া যে কাণ্ড হইয়াছে কেবল আমাকে A.D.C রূপে ঘানিগাছে জুড়িয়া দিয়া মহারাজ যে কাণ্ড করিয়াছেন আমি 'কলুর চোখঢাকা বলদের মত' হইয়াছি।' ঘটনা বর্ণনা যত চড়া হইতে লাগিল বেচারি রাধামোহন ঠাকুরের অবস্থা ততদূর ম্রিয়মান হইতে লাগিল। তাঁহার প্রায় মূর্চ্ছা হয়। তিনি মুখের গ্রাস ফেলিয়া আচমন করিয়া বিছানায় পড়িলেন এবং অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা চাহিলেন, আমি নতুন দরবারী; ঘরের নতুন বউয়ের মত অস্ফুট ভাষায় আলাপ করি। A.D.C রূপে কিছু বলিতে অক্ষম, তবে শিশুকাল হইতে রাজপরিবারে বর্দ্ধিত হইয়াছি,শিক্ষাদীক্ষা পাইয়াছি। দাদামহাশয়কে বলিলাম ''আপনি চিন্তিত হইবেন না। ঘরে বসিয়া দুই একটা কবিতা লিখুন। নিজে কবি বীরচন্দ্র সুন্দর বিষয়ে কবিতা পাইলে রাজ্য ভুলিতে পারেন। আমাদের নগণ্য অপরাধ ভুলিবেন না? কিন্তু দাদা আপনি মানুষ ঘানিতে জুড়িয়া আর তৈল পিষিবেন না।" রাধামোহন ঠাকুর বলিলেন ''ভাই আর আমি এ জন্মে তৈলের ব্যবসা করিব না। এ তৈল বিষ্ণুতৈলের কাজ করাইয়াছে।" রাধামোহন ঠাকুর সতের দিন অপেক্ষা করিলেন, সাক্ষাৎ পান না। আমি মাঝে মাঝে এতলা দিতাম। বীরচন্দ্র মাণিক্য তখন সকালে বিকালে করিয়া কাটাইয়া দিতেন। উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলে আমি রাধামোহন ঠাকুরকে বলিতাম—

''এখন তখন করি দিবস গোয়াইনু,
দিবস দিবস করি মাস;
মাস মাস করি বরিখ গোয়াইনু,
না মিটিল জীবনক আশ;"

কিন্তু আপনার আশা অবশ্য মিটিবে। ''রাধামোহন ঠাকুর রাজদর্শন পান না। আর রোজ সেরেস্তাদার কাগজ পাঠায় নথিও পাঠায়। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে পাঠায় ভয়ানক তাগিদ—মামলার পক্ষাপক্ষ হইতে নয় এবং গোপনে গৃহিনী হইতে। রাধামোহন ঠাকুর বিপদের মাঝ গঙ্গায় পড়িয়া, তাঁহার কবিতাও গিয়াছে কবিত্বও গিয়াছে। আমি বৈষ্ণব কবিতার নন্দনকাননের নবপ্রবেশী তোতাপাখী। হয় কথায়, না হয় কথায় এবং কথায় কথায় কবিতা কপ্তাইতে থাকি। কিন্তু রাধামোহন ঠাকুর তাহাতে বিরক্ত হন; তীর্থের কাকের মত আমার বৈঠকখানায় অপেক্ষা করেন। কিন্তু আমি কোনদিনও খালাসের সুখবর আনিতে পারিলাম না। একদিন বীরচন্দ্র মাণিক্য বলিলেন ''রাধামোহন ঠাকুরকে ছাড়িয়া দে। তাঁহার শাস্তি হইয়াছে। আর সতের দিনের খোরাকী নিজ–তহবিল হইতে দিয়াদে। তোরা ত আলঙ্গের সরদার ছিলি; এশ্রেণীর কয়েদী রাখা তোদের অভ্যাস। First class misdemeanour তোদের ইংরেজীতে বলে। কিন্তু ভারতবর্ষ-জেইল-বিধানে ইহা নাই, বিলাতে আছে। আমার রাজ্য এ প্রথায় কয়েদী অনেক হইয়াছে ও হয়ত আরও হইবে।" রাধামোহন ঠাকুরকে আমি খালাসের হুকুম শুনাইলাম। তিনি পুলকিত হইয়া বলিলেন ''ভাই রক্ষা পাইয়াছি। জেইল হইতে খালাস পাইলাম। নাক কান মলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি এমন কার্য্য আর করিব না। আমি বলিয়াছিলাম ''আমার" আলঙ্গ সেলামি দিতে হইবে।" তিনি কর তুলিয়া আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমি এ আশীর্ব্বাদ তাঁহার জীবনময় পাইয়াছিলাম। এখনও পাইতেছি।

পূর্ব্বে ''আলঙ্গ" নামে একপ্রকার জৈইল ছিল। সে আলঙ্গের আমরা চার পুরুষ সর্দ্দার ছিলাম। তাহাতে নানা শ্রেণীর লোক পড়িত কিন্তু দেশকালপাত্র ভেদে তাহাদের বসবাসের বন্দোবস্ত ছিল, পৃথক পৃথক রকমে। রাজ সম্পর্কান্বিত ব্যক্তিবর্গ, ঠাকুর পরিবার ও অপর ভদ্রলোকের প্রচুর ও নানা উপাদেয় আহার বিহারের বন্দোবস্ত ছিল। আমরা শিশুকালে মিষ্টান্ন-প্রয়াসী বালকবৃন্দ বলিতাম—

''জামাই এলে খাই ভাল" কারণ এইরূপ কারাবাসকে লোকে ''শ্বশুর বাড়ী আখ্যা দিয়াছিল। সেই দিনের কথা (১৮৯৫ খৃঃ) Late Mr.Mc Minn আমাদের জেইল পরিদর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন—''The prisoners seem to enjoy family comforts''.

ত্রিপুর দরবারে রবীন্দ্রনাথ *

স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র ছিলেন বাংলার বিক্রমাদিত্য। তিনি একাধারে বৈষ্ণব কাব্য—রসিক, কবি এবং সঙ্গীত ও ললিতকলাবিদ ছিলেন। এহেন রসিক চূড়ামণি, সাহিত্যের পাকা জহরী মহারাজ বীরচন্দ্রের দরবার—বহু গুণীব্যক্তির সমাবেশে ভরপুর ছিল; সুবিখ্যাত তানসেন—বংশজাত বীণ-কার কাশেমালী খাঁর রবাব বীণাঝঙ্কারে ধ্বনিত—কবি মদন মিত্রের কবিতা ধারায় প্লাবিত—যদুভট্টের কণ্ঠনিঃসৃত অপূর্ব্ব সঙ্গীত, পঞ্চানন মিত্রের পাখোয়াজ সহযোগে মুখরিত ছিল। সর্ব্বোপরি বৈষ্ণব সাহিত্য—রসিক রাধারমণ ঘোষের বৈষ্ণব পদাবলীর সুললিত আলোচনায় মণি—কাঞ্চন যোগ সঙঘটন করিয়াছিল। বীরচন্দ্রের দরবার তদানীন্তন ভারতের দৃষ্টান্তস্থল ছিল। বীরচন্দ্র স্বয়ং বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী আশ্রয় করিয়া অজস্র কবিতা এবং গান লিখিতেছিলেন এবং মনোহরসাই রাগিণীর মনোমোহিনী শক্তির সাধনায় তন্ময় থাকিতেন।

প্রিয়তমা প্রধানা মহিষীর অকালমৃত্যুতে প্রৌঢ় বীরচন্দ্রের হৃদয় অসহনীয় প্রিয়—বিরহ শোকাকুল হইয়া পড়ে। তখন তিনি বিরহীর মর্ম্মবেদনা কবিতার লহরে লহরে গাঁথিতেছিলেন। এমনি সময়ে কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথ বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া "ভগ্ন হৃদয়" নামে এক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। কবি বীরচন্দ্রের তখনকার মানসিকভাবের "ভগ্ন হৃদয়ের" কবিতা গুলি সায় দিয়াছিল। গুণগ্রাহী বীরচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের তখনকার এই কাঁচা লেখার মধ্যেও তাঁহার অদ্যকার বিশ্বমোহন কাব্যপ্রতিভার প্রথম সূচনা দেখিতে পাইয়া, তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী স্বর্গীয় রাধারমণ ঘোষকে কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট প্রেরণ করেন, "ভগ্ন হৃদয়" কাব্য গ্রন্থ মহারাজকে প্রীত করিয়াছে, তজ্জন্য তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতে। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের বা তাঁহার পরিবারের কাহারো সহিত মহারাজ বীরচন্দ্রের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। এ সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবন স্মৃতিতে লিখিয়াছেন ঃ—

"মনে আছে' এই লেখা বাহির হইবার কিছুকাল পরে কলিকাতায় ত্রিপুরার স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের মন্ত্রী আমার সহিত দেখা করিতে আসেন। কাব্যটি মহারাজের ভাল লাগিয়াছে এবং কবির সাহিত্য-সাধনার সফলতা সম্বন্ধে তিনি উচ্চ আশা পোষণ করেন, কেবল এইটি জানাইবার জন্যই তিনি তাঁহার অমাত্যকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।"

বাস্তবিক এ ঘটনা রবিবাবুর পক্ষে অপ্রত্যাশিত এবং বিস্ময় উৎপাদক হইয়াছিল। বাংলার রাজা বাংলার এই কবিকে কিশোর বয়সেই এরূপ অযাচিত সম্মান দান করিলেন, ইহা এক অপূর্ব্ব ঘটনা বলিতে হইবে। শাস্ত্র বলে ঃ—

"গুণী গুণং বেত্তি ন বেত্তি নির্গুণঃ।"

গুণগ্রাহী বীরচন্দ্রের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক বলিতে হইবে। পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছিলাম, বীরচন্দ্রের পিতা মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য কোন গুরুতর রাজনৈতিক সমস্যা লইয়া কলিকাতায় প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সাহায্যার্থী হন। প্রিন্স দ্বারকানাথ (রবীন্দ্রনাথের পিতামহ) তখনকার কলিকাতা সমাজের এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রের নেতা। তাঁহারি সহায়তায় মহারাজ

* এই প্রবন্ধ ১৩৩০ ত্রিপুরাব্দের ১০ ই মাঘ তারিখে লিখিত।

কৃষ্ণকিশোর সে যাত্রায় সফলকাম হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।সেই সময়েই ত্রিপুর রাজপরিবারের সহিত যোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের প্রথম পরিচয় হয়। কলিকাতায় পঠদ্দশায় লাট দরবারে ও কলিকাতার সমাজে মিশিবার আমার একটা বাতিক ছিল। তখনকার দিনে সহপাঠী কবি বঁলেন্দ্র নাথের সহযোগে ঠাকুর পরিবারে মিলিবার অধিকার লাভ করি। বাংলায় প্রকাশিত নতুন নতুন গ্রন্থ মহারাজ বীরচন্দ্রের নিকট পেশ করিবার ভার আমার মত কিশোর সেবকের উপর অর্পিত ছিল, সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সহিত আমার ঘনিষ্ট পরিচয় ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হয়। বীরচন্দ্র মাণিক্য কলিকাতায় যখনই যাইতেন, তখনি রবিবাবুকে ডাকাইয়া আনিতেন। বয়সে এই দুই কবির বিশেষ পার্থক্য থাকিলেও বীরচন্দ্র বাৎসল্যভাবে কিশোর সৌম্যদর্শন কবি রবীন্দ্রনাথের মুখে কবিতা পাঠ এবং সঙ্গীত শুনিতে বড়ই ভালবাসিতেন। তখন আমিও বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া বীরচন্দ্রের সেবায় দরবারে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। রবীন্দ্র পিতৃতুল্য বীরচন্দ্রের নিকট কবিতা পাঠ বিশেষতঃ গান করিতে নিতান্ত সঙ্কোচ বোধ করিতেন। কিন্তু বীরচন্দ্রের স্বভাবসুলভ উৎসাহে রবীন্দ্রনাথের সঙ্কোচের বাধা অতিক্রম করা সহজসাধ্য হইত। আমরা যখন কলিকাতা হইতে ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারকল্পে রুগ্ন মহারাজ বীরচন্দ্রকে লইয়া কার্সিয়াং–এ গমন করি, তখন মহারাজ, কবি রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে করিয়া লইলেন। তখনকার কথা আমার বেশ স্মরণ আছে। রাত্রি প্রায় দশটা বাজিয়া যাইত, অবিশ্রামভাবে মহারাজ রবীন্দ্রনাথকে লইয়া সঙ্গীত এবং কাব্য আলোচনায় মগ্ন থাকিতেন; বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতেন। আলোচনান্তে প্রতি রাত্রে মহারাজ উঠিয়া রবিবাবুকে সিঁড়ি পর্য্যন্ত আসিয়া বিদায় সম্ভাষণ করিয়া যাইতেন। মহারাজ বীরচন্দ্র অসুস্থ; অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া হাস্য মুখেই তিনি আলোচনায় যোগ দিতেন, একথা রবিবাবু জানিতেন। তিনি একদিন, মহারাজ অনর্থক কেন কষ্ট করিয়া সিঁড়ি পর্য্যন্ত তাঁহাকে আগুয়াইয়া দেন এরূপ অনুযোগ করিলেন। তখন বীরচন্দ্র বলিয়াছিলেন—''রবিবাবু, পাছে অলসতা আসিয়া কর্ত্তব্যে ত্রুটি ঘটায়, আমি সে ভয় করি, আপনি আমাকে বাধা দিবেন না।'' পিতৃতুল্য বীরচন্দ্রের এরূপ ব্যবহার দর্শন এবং উত্তর শ্রবণ করিয়া রবিবাবু বলিতেন—''আমি অভিজাত্য তা বংশের মহিমার পরিচয় পাইয়া ধন্য হইলাম।''

বীরচন্দ্র মাণিক্যের সভায় একটি রত্নের পরিচয় পাইয়া পরম আনন্দ পাইয়াছেন বলিয়া রবিবাবুকে বলিতে শুনিয়াছি; তিনি ছিলেন রাধারমণ ঘোষ। কার্সিয়াং–এ রবিবাবুর পরিচর্য্যার ভার আমার উপর ন্যস্ত ছিল। একত্রে আহার বিহার করিয়া পরম আনন্দে দিন কাটিত।প্রায়ই সকালে আটটার সময় আমি মহারাজের মনস্তুষ্টির জন্য নানা স্থানের ছায়াচিত্র সংগ্রহে বাহির হইয়া পড়িতাম। আর রবিবাবু রাধারমণ বাবুকে লইয়া বৈষ্ণব দর্শন এবং পদাবলী আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন। একদিন Photo তুলিয়া প্রায় একটার সময় বাসায় আসিয়া দেখিলাম, রাধারমণ বাবু ও রবিবাবু আলাপে তন্ময় হইয়া আছেন। তখন বৈষ্ণবদর্শনের সহিত এমার্সনের (Emerson) লেখার তুলনামূলক আলোচনা চলিতেছিল। আমি আসিয়া রসভঙ্গ করিয়াদিলাম; কারণ, আমার উদরে ক্ষুধানল প্রজ্জ্বলিত। তখন অনিচ্ছাসত্বেও রবিবাবুকে সে আলোচনা স্থগিত রাখিতে হইল। ভাবে বুঝিলাম, এই শীর্ণকায় রাধারমণ ঘোষ তাঁহাকে বেশ পাইয়া বসিয়াছেন। রবিবাবু, রাধারমণের গভীর পাণ্ডিত্যে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে বৈষ্ণবদর্শন পাঠ করিতে হইবে এ কথা তিনি স্বীকার করিলেন। অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকায় বেড়াইতে বাহির হইলে রবিবাবু মহারাজ বীরচন্দ্র এবং তাঁহার সহচর রাধারমণের প্রসঙ্গ অনর্গল আলোচনা করিতেন। ইহাতে বুঝা যায় রবিবাবুর গুণগ্রহণ করিবার শক্তির প্রখরতা।

বীরচন্দ্র মাণিক্য কলিকাতায় দেহত্যাগ করিলেন। রাধারমণ বাবু আশ্রয়শূন্য হইয়া পড়িলে, রবিবাবু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে বলিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের সরকারে উচ্চ কর্ম্মচারী পদে বরণ করিয়াছিলেন। রাধারমণবাবু সে কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সারাজীবন বীরচন্দ্রের সেবা যিনি করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে অন্যত্র কার্য্য করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। তিনি সংসার হইতে অবসর লইয়া ছিলেন, কিন্তু সংসার তাঁহাকে অবসর মোটেই দেয় নাই। বৈষ্ণব দার্শনিক, বৈষ্ণব ভাবের নির্য্যাস লইয়া জীবন শেষ করিয়া গিয়াছেন। রবিবাবু ইদানীংও দেখা হইলে তাঁহার খবর লইতেন।

বীরচন্দ্রের মৃত্যুর পর রাধাকিশোর মাণিক্য ত্রিপুরার সিংহাসন লাভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমারো জীবনের পার্শ্ব পরিবর্ত্তন হইল। বৃদ্ধ মহারাজের বাৎসল্যরসের চালে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইয়াছিল। হঠাৎ আমাকে শুয়া পোকা

ত্রিপুরাধিপতি স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোর দেববর্ম্মা মাণিক্য বাহাদুর এবং বিশ্বকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (আগরতলায় লেখক কর্ত্তৃক গৃহীত ফটো হইতে)

হইতে পূর্ণ প্রজাপতির রূপ ধারণ করিতে হইল। নতুন নতুন জটিল সমস্যা এবং কার্য্যভার আমার স্কন্ধদেশ চাপিয়া বসিল।

রবিবাবুর সঙ্গে রাধাকিশোর মাণিক্যের যুবরাজ—জীবনে কলিকাতায় পিতার দরবারে একবার মাত্র ক্ষণকালের জন্য দেখা হইয়াছিল। বিশিষ্ট ইংরাজ কর্ম্মচারীর হঠাৎ আবির্ভাবে, আলাপ বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। সেই মুহূর্ত্তকাল দর্শনেই একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পরেন। চুম্বক যেমন লোহাকে টানে, গুণী ব্যক্তি, গুণীকে আকর্ষণ করিয়া লইলেন।

রাধাকিশোর যখন ত্রিপুরার ''মাণিক'' হইলেন, তখন বহুদিনের সঞ্চিত অভিলাষ কার্য্যে পরিণত করিতে শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। যুবরাজী আমলে নানা কারণ বশতঃ নিজ রাজধানীর বাহিরের কাহাকেও ঘনিষ্ঠভাবে চিনিবার সুযোগ পান নাই। বন্ধু—বল বলিতে তাঁহার কিছুই ছিল না। তিনি বলিতেন, অর্থ-বল কিম্বা যে কোন প্রকারের বলই বল না, বন্ধু-বল সকলের অপেক্ষা মূল্যবান। তিনি প্রথমে রবিবাবুকে কাছে টানিয়া লইলেন। রবিবাবু সেইবার প্রথম আগরতলা রাজধানীতে আসিলেন; তখন বসন্তকাল-রাজধানীর উত্তরভাগে পাহাড়ের উপর কুঞ্জবনের বসন্তোৎসবে কবি–সম্মিলনের ঘটা, রাজা-প্রজার সমব্যবহার, কবি রবীন্দ্রনাথের যুগপৎ আনন্দ এবং বিস্ময় উৎপাদন করিল। মহারাজ রাধাকিশোরের মহৎ চরিত্রের মহানুভবতা দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন।

ক্রমে ক্রমে রবিবাবুর যোগে স্যার আশুতোষ চৌধুরী, স্যার জগদীশ বসু, মহারাজ স্যার যতীন্দ্রনাথ, নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ প্রভৃতি বঙ্গের খ্যাতনামা মহাপুরুষেরা রাধাকিশোরের বন্ধুতার জালে আসিয়া ধরা দিলেন। একে অন্যের সহযোগে দেখিতে দেখিতে, স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন (Lord Sinha)) স্যার রাজেন্দ্রলাল, স্যার টি, পালিত, স্যার রাসবিহারী ঘোষ, দ্বারকানাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি মহারাজের গুণাকৃষ্ট হইয়া বন্ধুবল বৃদ্ধি করিলেন। এ বন্ধুবলের দ্বারা যেমন রাজনৈতিক অনেক সমস্যার সমাধান করিলেন, অপরদিকে ত্রিপুরার রাজা বঙ্গ—হৃদয় জয়লাভ করিলেন। সে সময়ে কলিকাতা সঙ্গীত—সমাজে মহারাজের অভ্যর্থনার যে আয়োজন হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। তাঁহাকে দেখাইবার নিমিত্ত স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁহারই রচিত ''বিসর্জ্জন'' নাটকের ''রঘুপতি''র ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর নাটোরের বর্ত্তমান মহারাজ—

''গুণী রসিক সেবিত উদার তব দ্বারে।
মঙ্গল বিরাজিত বিচিত্র উপচারে।।''

গাহিয়া মাল্য–চন্দনে মহারাজ রাধাকিশোরকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের রাজর্ষি এবং বিসর্জ্জনে ত্রিপুরার নাম অমর এবং জগদ্বিখ্যাত হইল, এ কি ত্রিপুরার কম গৌরবের কথা!

যুবরাজ বীরেন্দ্রকিশোরের ''শিক্ষা'' সম্বন্ধে মহারাজ রাধাকিশোর বিশেষ ভাবিত হইয়া পড়িলে, রবীন্দ্রনাথ আসিয়া কথঞ্চিৎ সে সমস্যার সমাধান করিলেন। তাঁহারি চেষ্টায়, প্রফেসার নগেন্দ্রনাথ এবং মোক্ষদাকুমার বসু বি এ, মহাশয়ের মত শিক্ষক পাওয়া সহজ হইয়াছিল। তৎপর যুবরাজের শিক্ষা লইয়া যখন গভর্ণমেন্ট পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদেশের অন্যতম সমকক্ষ কোচবিহারের মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের পরামর্শ গ্রহণ করিতে বলেন এবং এই বঙ্গগৌরব মহারাজদ্বয়ের পরস্পর পরিচয়ের সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সে সময়ে মহারাজ রাধাকিশোরকে রবিবাবুর লিখিত এক পত্র হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি। তখন ত্রিপুরার অদৃষ্ট আকাশে অনেক রাজনৈতিক মেঘ সঞ্চিত ছিল; সেই অবস্থায় এই দুই মহারাজের মিলন, অনেক সুফলপ্রদ হইয়াছিল।

''কোচবিহারের মহারাজের সহিত মহারাজের কিরূপ সম্মিলন ও পরামর্শ হইল তাহা জানিবার জন্য আমি নিরতিশয় উৎসুক আছি। দুই মহারাজের মধ্যে বন্ধুত্ব হইলে মন্ত্রণাদি দ্বারা উভয়ে বললাভ করিবেন। ইহা মনে করিয়া আমি পরিশেষে উদ্যোগী হইয়াছিলাম এবং করুণা ও নির্ম্মলের সহায়তায় এই অভিলষিত মিলন সংঘঠনের উপায় উদ্ভাবন করিতে ছিলাম। এই মিলনে আমি উপস্থিত থাকিতে পারিলে বড়ই আনন্দ লাভ করিতে পারিতাম। আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য,ঠিক সময়টিতে আমাকে চলিয়া আসিতে হইল। রাজকার্য্য সম্বন্ধে গভর্ণমেন্টের সহিত কোন গুরুতর আন্দোলন উপস্থিত হইলে নিঃস্বার্থ, নিরপেক্ষ ও মহারাজের সমশ্রেণীর ব্যক্তিদের সহিত পরামর্শযোগে মহারাজের সেই অভাব মোচন হইবে কল্পনা করিয়া আমি আশ্বস্ত হইতেছি।''

রাধাকিশোর মাণিক্যের বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ ছিল বলিয়াই তিনি সাহিত্যিক দিগের সঙ্গ পাইতে অভিলাষ করিতেন এবং প্রয়োজনবোধে তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করিতে মুক্তহস্ত ছিলেন। কিন্তু এসব কথা যাহাতে গোপন থাকে সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকিতেন। ''সঞ্জীবনী'' পাঠে মহারাজ কবির হেমচন্দ্র যখন অন্ধ এবং অর্থাভাবে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন জানিতে পারিলেন, তখন নিজতহবিল হইতে মাসিক ৩০্ টাকা বৃত্তি তাঁহার সাহিত্য সাধনার প্রতিদান স্বরূপ দিবার প্রস্তাব, রবিবাবুর মারফত কবিবরের নিকট উপস্থিত করিলেন এবং এ সংবাদ গোপন রাখিবার ভার গ্রহণ করিতে রবিবাবুকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। এরূপ উপযুক্ত সময়ে সৎপাত্রে স্বতঃ-প্রবৃত্ত দান সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় না। এ সম্বন্ধে রবিবাবু আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি।

''হেমবাবুর সাহায্যার্থে মহারাজ যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহাতে এখানে চতুর্দ্দিকে ধন্য ধন্য পড়িয়াছে। একথা গোপন রাখা আমার সাধ্যাতীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে হেমবাবুও অত্যন্ত কৃতজ্ঞতাবোধ করিতেছেন। মাঝে হইতে মহারাজের কল্যাণে যশের কিয়দংশ আমার কপালেও পড়িয়াছে। আমার পিতাঠাকুর, হেমবাবুর জন্য মাসিক ২০্ এবং গগন ১০্ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন।

তারপর হেমবাবুর সম্বন্ধে যেরূপ বন্দোবস্ত হইবার দরুণ তিনি সচ্ছন্দে গ্রাসাচ্ছাদন পাইয়াছিলেন এবং কতকটা আরামে শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সে দৃশ্য আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। বন্ধুবর দীনেশচন্দ্র সেন সহ স্বর্গগত কবির মুখে সে পুণ্যকাহিনী শ্রবণ করিয়া যখন আমি সে সংবাদ মহারাজের নিকট পেশ করি, তখন মহারাজ কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিয়াছিলেন, —

''আমি বাংলার ক্ষুদ্র রাজা হইলেও আমি বর্ত্তমানে তাঁহাকে যদি কবি মাইকেল মধুসূদনের মত দাতব্য চিকিৎসালয়ে পড়িয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হয়, তবে দেশের পরম দুর্ভাগ্য। তোমরা আমার পারিষদেরা নিশ্চয় নিরয়গামী হইবে, আর আমাকে যে কতদূর যাইতে হইবে তাহা জানি না। তোমাদের চক্ষু কর্ণ এইরূপ ব্যাপারে বন্ধ না থাকে এবং মুখ যেন সদাসর্ব্বদা খোলা থাকে।''

বন্ধুবর দীনেশচন্দ্রও স্বর্গীয় বীরচন্দ্রের আনুকূল্যে তাঁহার অমূল্য গ্রন্থ ''বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'' প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনিও মহারাজ রাধাকিশোর হইতে তাঁহার বঙ্গবাণী সেবায় পুরস্কার মাসিক ২৫্ টাকা হিসাবে বৃত্তি পাইয়াছিলেন; আজিও সে বৃত্তি লোপ পায় নাই।

একবার কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞানচার্য্য জগদীশচন্দ্র, রবিবাবু প্রভৃতি বন্ধুদিগকে স্বীয় গবেষণার ফলাফল দেখাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তখনো রাধাকিশোরের সহিত জগদীশবাবুর সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। মহারাজ এ খবর পাইয়া বিনা নিমন্ত্রণে উক্ত কলেজের বিজ্ঞানাগারে যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিলেন। জগদীশবাবু ইংরাজিতে স্বীয় গবেষণার ফলাফল ইত্যাদির ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। মহারাজ ইংরাজিতে সুশিক্ষিত ছিলেন না বলিয়া সম্পূর্ণভাবে তাঁহার বক্তব্য বুঝিয়াছেন কি না অতি সঙ্কোচের সহিত জিজ্ঞাসা করায়, মহারাজ স্বয়ং দু একটি Experiment নিজেই সম্পন্ন করিয়া দেখাইলেন এবং বলিলেন, '' বাংলাতে আপনার আবিষ্কার সম্বন্ধে যে সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহা আমি পড়িয়াছি এবং বিজ্ঞান আলোচনায় আমি বিশেষ আনন্দ পাই, আমিও একজন আপনার ছাত্র। ''জগদীশবাবু বলেন, ''M.A., M.Sc., ক্লাসের ছাত্রদের এ তথ্যগুলি বুঝাইতে গলদঘর্ম্ম হইতে হয়, মহারাজ কেমন সুন্দরভাবে এবং সহজে এসব বুঝিতে পারিয়াছেন।'' তারপর একদিন রবিবাবুর তলবে জগদীশবাবুর গৃহে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলাম, প্রাইভেট কার্য্যে কলেজের বিজ্ঞানাগার ব্যবহার করা কর্ত্তৃপক্ষের অভিপ্রেত নহে। রবিবাবু ইহাতে মর্ম্মান্তিক বেদনা অনুভব করিলেন; বিশেষতঃ বুঝিলেন, জগদীশবাবুর নিজের বিজ্ঞানাগার না হইলে তাঁহার বিজ্ঞানের নতুন তথ্য আবিষ্কারের পথ চিরতরে বন্ধ হইয়া যাইবে। পরামর্শ হইল ২০, ০০০্ হাজার টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে, ১০,০০০্ হাজার টাকা রবিবাবু নিজে আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিবেন, বাকি টাকার জন্য ত্রিপুর রাজ দরবারে ভিক্ষা করিতে উপস্থিত হইবেন। মহারাজ রাধাকিশোর তখন কলিকাতায়

উপস্থিত ছিলেন। কবিকে ভিক্ষুকবেশে আসিতে দেখিয়া বলেন, '' এ বেশ আপনাকে সাজে না, আপনার বাঁশী বাজানই কাজ, আমরা ভক্তবৃন্দ ভিক্ষার ঝুলি বহন করিব। প্রজাবৃন্দের প্রদত্ত অর্থই আমার রাজভোগ যোগায়। আমাদের অপেক্ষা জগতে কে আর বড় ভিক্ষুক আছে? এ ভিক্ষার ঝুলি আমাকেই শোভা পায়, আমাকেই ইহা পূর্ণ করিতে হইবে। '' তখন যুবরাজ বীরেন্দ্রকিশোরের বিবাহ উপস্থিত। মহারাজ বলিলেন—''বর্ত্তমানে আমার ভাবী বধুমাতার দু এক পদ অলঙ্কার নাই বা হইল, তৎপরিবর্ত্তে জগদীশ বাবু সাগরপার হইতে যে অলঙ্কারে ভারতমাতাকে ভূষিত করিবেন, তাহার তুলনা কোথায়!''

জগদীশ বাবুর বিজ্ঞানাগারের ব্যবস্থা হইল। তৎপর জগদীশ বাবু বিলাতে বৈজ্ঞানিক সমাজে স্বীয় গবেষণা প্রচারের বাসনায় বিলাত যাত্রা করেন। তথায় নানা কারণে তাঁহার আবিষ্কারের প্রতিষ্ঠা স্থাপনে বিলম্ব হইতে লাগিল। অথচ ছুটী ফুরাইয়া আসায় ভগ্ন-মনোরথ হইয়া তাঁহাকে ফিরিতে হইত, এমনি অবস্থায় রাধাকিশোরের ঐকান্তিক উৎসাহ বাণী এবং ২০,০০০ হাজার টাকা অর্থ সাহায্যলাভে, বিলাতের বৈজ্ঞানিক সমাজের জয়মাল্য লইয়া দেশে ফিরিলেন। সে কাহিনী স্বয়ং আচার্য্য জগদীশ বাবু বিজ্ঞান মন্দিরের অভিভাষণে সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। নীরব—দাতা রাধাকিশোরের বিশেষ অনুরোধে একথা আমরা ছাড়া কেহই জানিত না-অদ্য তিনি অমরলোকে-হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইবার এ সুযোগ জগদীশবাবু ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তাঁহার বক্তৃতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

''When his first experiments brought vividly before him the universal sensitiveness of matter and the outcome of this generalisation in different realms of thought, he had a visit from late maharaja of Tipperah RadhaKishore Manikya. The Maharaja was a great scholar in the Vernacular, through he was totally unacquainted with English language. According to the prevailing standard, the cultural value of his acquirements would be questioned. But the Maharaja's ignorance of English did not stand in the way of his instantly realising the significance of the lecturer's experiments. Indeed his own mind was put to its fullest--activity in answering the Maharaja's most intelligent questionings as regards the trend of his work in clearing up many difficult problems. The reference to this subject may be opportune in view of the controversy whether the Great Akbar was literate or illiterate and whether the University Commission should recommend the Vernacular language as suitable vehicle for scientific instruction.The Government of India sent him on his second scientific deputation to the west to announce his discovery and he experimentally demonstrated before the meeting of Royal Society the sensitiveness of ordinary plants. The discovery was refused publication to reach the scientific world.The period of his deputation was then nearing its end he had to make his choice of returning to India discredited or overstay in England risking his appointment or the chance of convincing some unbiassed scientific men. While in this dilemma he received a communication from the Maharaja assuring him of his firm belief and also a large remittance towards the possibility of continuation of his researches. He was thus enabled to prolong his stay and thus secure many true friends among scientific men in England who stood for fair play, resulting finally in the acceptance of his work. It was the special request of the late Maharaja that he wished to remain unknown in this connection. He has now passed away and it is permissible to speak now of one who stood by him at a time when such friendship was most needed''.

(The Englishman-12th March, 1918.)

মৰ্ম্ম—''আচাৰ্য্য বসু তখন জড়জগতে অনুভূতির স্পন্দন বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশ্লেষণ করিতেছিলেন এবং তাঁহার এই চিন্তাধারা যখন নানাভাবে তাঁহার নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল, তখন একদিন ত্রিপুরার রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর বিজ্ঞানাচার্য্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহারাজ মাতৃভাষায় যেমন কৃতবিদ্য ছিলেন, তেমন ইংরেজী ভাষায় সম্পূর্ণ জ্ঞাতসার ছিলেন না। বর্ত্তমান যুগের তথাকথিত শিক্ষার মাপকাঠিতে তাঁহার বিদ্যাবত্তার সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিতে পারে। কিন্তু ইহা খাটি সত্য যে তাঁহার ইংরেজী ভাষার অনভিজ্ঞতা সত্বেও বসু মহাশয়ের ইংরেজী ভাষায় বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মৰ্ম্মকোষে প্রবেশ করিতে তাঁহার তিলমাত্র বিলম্ব হয় নাই; কেন না, বসু মহাশয়কে তাঁহার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ধারা সম্পর্কে মহারাজ এরূপ সব সূক্ষ্ম বুদ্ধিবত্তা পরিচায়ক প্রশ্ন করিতে লাগিলেন যে, সেই সকল জটিল প্রশ্নের উত্তর যোগাইতে আচার্য্যের মত মনিষীকেও যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল।

''উপরোক্ত ঘটনার উল্লেখ দ্বারা সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে যে, আকবর বাদশাহ শিক্ষিত কি নিরেট মূর্খ ছিলেন এবং বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈঠক মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চ্চার ব্যবস্থা করিবেন কি না। ভারত-গভর্ণমেন্ট অধ্যাপক বসুকে দ্বিতীয় বারের জন্য পাশ্চাত্য জগতে তাঁহার নতুন আবিষ্কার বাণী প্রচারকল্পে প্রেরণ করেন এবং তিনি রয়েল সোসাইটিতে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা তাঁহার আবিষ্কার সপ্রমাণ করেন। কিন্তু নানাকারণে তাঁহার গবেষণা জগতের বিজ্ঞান–সমাজে প্রকাশিত করিবার সুযোগ হইতে তিনি বঞ্চিত ছিলেন। তখন তাঁহার উভয় সঙ্কট। একদিকে তাঁহার কলেজের ছুটী শেষ হইয়া আসিতেছিল, অন্য দিকে যদি বিফল মনোরথ হইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তবে অপমানের একশেষ। অথবা বিলাতে থাকিয়া যদি নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিকের মনে ইহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ খুঁজেন, তবে চাকুরীর দায় ঘটার সম্ভাবনা ছিল। জীবনব্যাপী সাধনার এই সন্ধিস্থলে তিনি মহারাজ রাধাকিশোর হইতে উৎসাহসূচক গভীর আশ্বাস এবং বিলাতে থাকিয়া গবেষণা প্রচারের জন্য বিপুল অর্থ সাহায্য পাইলেন। এরূপ অপ্রত্যাশিত সহৃদয়তা এবং সাহায্যে আচাৰ্য্য বসু পাশ্চাত্য দেশে আর কিছুকাল বাস করিয়া বৈজ্ঞানিক সমাজে অনেক সহৃদয় বন্ধু লাভ করিলেন এবং তাঁহাদের সত্যপ্রিয়তার বলে অবশেষে তাঁহার আবিষ্কার গৃহীত ও অনুমোদিত হইল। মহারাজের ঐকান্তিক অনুরোধ ছিল, এ সম্পর্কে তাঁহার নাম যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশিত না হয়। কিন্তু মহারাজ এখন পরলোকে এবং সেই সন্ধিক্ষণে যাঁহার বন্ধুতা তাঁহার পার্শ্বে শক্তি স্তম্ভরূপে দাঁড়াইয়াছিল এক্ষণে তাঁহার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইবার এ সুযোগ গ্রহণ করার কোন বাধা নাই।''

রবিবাবুর প্রতি রাধাকিশোরের বন্ধুতা এবং আত্মীয়তার সীমা ছিল না। সাহিত্যের প্রচার বা রাজকার্য্যে সুশৃঙ্খলতা এবং উন্নতি সম্পর্কে রবিবাবুর মত এবং সাহায্য গ্রহণ করিতেন। রবিবাবুর কাব্য প্রতিভায় যেমন আকৃষ্ট ছিলেন, তেমনি তাঁহার কৰ্ম্মভূমি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রতিও তাঁহার সহানুভূতি ছিল। স্বয়ং মহারাজ বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে যাইয়া, বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাগারের যন্ত্রাদি দান করিয়া আসেন। বৃত্তি দান করিয়া ছাত্র প্রেরণ করার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে বাৎসরিক ১০০০্ এক হাজার টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছিলেন। এখনো সে বৃত্তি বোলপুর বিদ্যালয় ভোগ করিতেছে। এমন কি, স্বীয় পুত্র ব্রজেন্দ্র কিশোরকে বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্ররূপে প্রেরণ করার অভিপ্রায় ছিল–কিন্তু কোন কারণে তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। ত্রিপুর রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি রবিবাবুর আন্তরিক দৃষ্টি ছিল—মন্ত্রী নির্ব্বাচনেও মহারাজ তাঁহার মতামত গ্রহণ করিতেন। এ সব ব্যাপারে লিপ্ত থাকায় এ রাজ্যের কৰ্ম্মচারী মহলে তাঁহার সঙ্গে এ রাজ্যের সম্বন্ধ লইয়া নানা কথা উঠিয়া আগরতলার মত ক্ষুদ্র স্থানকেও তোলপাড় করিত। সেজন্য কবির মনে সময় সময় চাঞ্চল্য এবং এ রাজ্য সম্বন্ধে বীতস্পৃহা উপস্থিত হইত, কিন্তু রাধাকিশোরের অকৃত্রিম বন্ধুতা এবং স্নেহ তাঁহাকে ত্রিপুরার সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত হইতে দেয় নাই। সেই জন্যই এই দুই মহানুভবের বন্ধুত্বের গভীরতা ক্ষুদ্র দলাদলির ফাঁকা সোরগোলে কিছুমাত্র বিচলিত হইত না। বাংলাদেশের রাজা, বাঙ্গালী কৰ্ম্মচারী চালিত রাজ্যের ক্রটি বিচ্যুতি, বাঙ্গালীরই কলঙ্কের পরিচায়ক বলিয়া রবিবাবুর মনকে আঘাত দিত। সেজন্যই ত্রিপুরার মঙ্গল এবং উন্নতির জন্য তিনি সর্ব্বদা উৎসুক এবং চেষ্টিত আছেন। এ রাজ্যেই বাঙ্গালী মস্তিষ্কের সু–ব্যবহার হইবে, বাঙ্গালী প্রতিভা পূর্ণ বিকশিত হইয়া অন্যান্য রাজ্যের দৃষ্টান্তস্থল হইবে, এ আশা এখনো তিনি

হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন।

ত্রৈপুরী ১৩১৫ সালে ১৭ ই আষাঢ় তারিখে আগরতলার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রশস্ত গৃহে, সাহিত্য সভা স্থাপনোপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করিতে এক সভার অনুষ্ঠান হয়। সে বিরাট সভার মঞ্চোপরি একটি আসন মহারাজ রাধাকিশোরের জন্য, অপরটি সভার সভাপতি রবীন্দ্রনাথের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। সভারম্ভে রবিবাবুকে সভাপতি পদে বরণ করিয়া, মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য সর্ব্বসাধারণের সমসূত্রে আসন গ্রহণ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ সসঙ্কোচে মহারাজকে নির্দিষ্ট আসনে বসিতে অনুরোধ করিলে, মহারাজ বলেন—''সাহিত্যক্ষেত্রে আপনার স্থান সর্বোপরি, আপনি সাহিত্যের রাজা, আমি আপনার ভক্ত বন্ধু মাত্র, এ উচ্চমঞ্চ আমার স্থান নহে।" দর্শক এবং উপস্থিত প্রজাবৃন্দ মহারাজের বিনয়নম্র ব্যবহারে মুগ্ধ এবং গৌরবান্বিত বোধ করিল, কবি রবীন্দ্রনাথ এ দৃশ্য দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। ত্রিপুর রাজ্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের গভীর আকর্ষণের কারণ তিনি সেদিনকার অভিভাষণে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাহারই কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

''এই ত্রিপুর রাজ্যের রাজচিহ্নের মধ্যে সংস্কৃত বাক্য অঙ্কিত দেখিয়াছি—''কিলবিদুর্বীরতাং সারমেকং"—বীর্য্যকেই সার বলিয়া জানিবে। এই কথাটি সম্পূর্ণ সত্য। পার্লামেন্ট সার নহে, বাণিজ্যতরী সার নহে, বীর্য্যই সার। এই বীর্য্য দেশ কাল পাত্র ভেদে নানা আকারে প্রকাশিত হয়—কেহ বা শস্ত্রে বীর, কেহ বা শস্ত্রে বীর, কেহ বা ত্যাগে বীর, কেহ বা ভোগে বীর, কেহ বা ধর্ম্মে বীর, কেহ বা কর্ম্মে বীর।

****

''অল্পদিন হইল, একজন বাঙ্গালী ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট দেশীয় রাজ্য শাসনের প্রতি নিতান্ত অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছিলেন—তখন স্পষ্টতই দেখিতে পাইলাম, তিনি মনে করিতেছেন, ব্রিটিশ রাজ্যের সুব্যবস্থা সমস্তই যেন তাঁহাদেরই সুব্যবস্থা; — তিনি যে ভারবাহীমাত্র, তিনি যে যন্ত্রী নহেন, যন্ত্রের একটা সামান্য অঙ্গ মাত্র, এ কথা যদি তাঁহার মনে থাকিত, তবে দেশীয় রাজ্যব্যবস্থার প্রতি এমন স্পর্দ্ধার সহিত অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে পারিতেন না। ব্রিটিশ রাজ্যে আমরা যাহা পাইতেছি, তাহা যে আমাদের নহে, এই সত্যটি ঠিকমত বুঝিয়া উঠা আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়াছে। এই কারণেই আমরা রাজার নিকট হইতে ক্রমাগতই নতুন নতুন অধিকার প্রার্থনা করিতেছি এবং ভুলিয়া যাইতেছি—অধিকার পাওয়া এবং অধিকারী হওয়া একই কথা নহে।

''দেশীয় রাজ্যের ভুল ত্রুটি মন্দগতির মধ্যেও আমাদের সান্ত্বনার বিষয় এই যে, তাহাতে যেটুকু লাভ আছে, তাহা বস্তুতই আমাদের নিজের লাভ। তাহা পরের স্কন্ধে চড়িবার লাভ নহে, তাহা নিজের পায়ে চলিবার লাভ। এই কারণেই আমাদের বাংলাদেশের এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরারাজ্যের প্রতি উৎসুক দৃষ্টি না মেলিয়া আমি থাকিতে পারি না।"

আশা করি তাঁহার বাণী ত্রিপুরায় ব্যর্থ হইবে না, ভবিষ্যৎ মাণিকগণ কবির বাণী সফল করিয়া তুলিবেন।

চন্দনবনে এরণ্ড গাছও যেমন সংসর্গ বলে চন্দন গন্ধের ভাগী হয়, সেরূপ রাধাকিশোর মাণিক্যের সেবাধিকার পাইয়া আমারো ভাগ্যে রবিবাবুর বন্ধুত্বের কিয়দংশ লাভ হইয়াছিল। বাংলা লেখা, তাঁহারি বিশেষ উৎসাহে মোক্স করিতে আরম্ভ করি। সে সাহিত্য—সভায় কোন প্রবন্ধ পাঠের গৌরব আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। রাজকীয় কার্য্যে উন্নত আদর্শ স্থাপন করিতে তাঁর অমূল্য উপদেশাবলী কর্ত্তব্যের পথে চলিতে অনেক সময় সাহায্য এবং বলদান করিয়াছে। রাজকার্য্য হইতে অবসর লইয়া বিশ্রাম সুখ লাভ করিতেছি—এখন গত জীবনের স্মৃতি আঁকড়িয়া জীবন শেষ করিতে পারিলে ধন্য হইব। রবিবাবুও ত্রিপুরার দরবার হইতে দূরেই আছেন। কিন্তু ত্রিপুরার প্রতি তাঁর আন্তরিক শুভ ইচ্ছা সর্বদা জাগ্রত আছে, তাহা তাঁহার বর্ত্তমান পত্রাদিতে স্পষ্ট দেখিতে পাই। রবিবাবুকে লইয়া টানাটানি করা আজ কালকার ফ্যাশন হইয়া দাঁড়াইয়াছে—কিন্তু ত্রিপুররাজ্যের সহিত তাঁহার শুভ সম্বন্ধের ইতিহাস বিবৃত করিতে যাইয়া যদি ভুলচুক কিছু ঘটিয়া থাকে তবে তিনি মাপ করিবেন—কারণ তিনি জানেন, আমি তাঁহার একান্ত অনুগত।

ত্রিপুরা—প্রসঙ্গ*

ত্রিপুরায় বঙ্গভাষা

ত্রিপুরা* সাহিত্য—সম্মিলনীতে আমার তলব হইয়াছে, এ দরবারে আমাকে উপস্থিত হইতে হইবে। সম্পাদক মহাশয় ইহাও জানাইয়াছেন যে, আমাকে একটা প্রবন্ধ পাঠ করিতে হইবে। আমি 'যে আজ্ঞে' বলিয়া আদেশ পালন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলাম, কিন্তু এই আদেশ প্রতিপালন করা যে আমার পক্ষে সহজসাধ্য নহে, সে কথা তখন ভাবি নাই। ''ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন''। পরে যখন আমি চিন্তিত হইলাম-কি নজর লইয়া আমি এ দরবারে উপস্থিত হইব, তখন কোন বন্ধু আমাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—''ত্রিপুরা সাহিত্য—দরবারে তুমি যাইতেছ। তথায় ত্রিপুরার প্রসূন লইয়া তুমি যাও। কোন চিন্তার কারণ নাই। ত্রিপুরার রাজদরবারে এত প্রসূনের ছড়াছড়ি, তাহাতে তুমি ফুলের অভাব পাইবে না।'' তখন আমি মনে করিলাম, এ সভায় আমি ত্রিপুরারাজ্যের প্রসঙ্গ হইতে গুটিকতক কাহিনী বলিলে শ্রোতৃবর্গের শ্রুতিকটু হইবে না।

বঙ্গদেশ মধ্যে ত্রিপুরারাজ্য। বঙ্গভাষা ত্রিপুরার রাজভাষা, স্মরণাতীত কাল হইতে ইহা শুনা যাইতেছে। ১৪০৭ খৃষ্টাব্দের ত্রিপুর রাজ্যের ইতিহাস 'রাজমালা' লিখিত হইয়াছিল বঙ্গভাষায় পয়ার ছন্দে। স্বনামধন্য শ্রী ধর্ম্মমাণিক্য এই 'রাজমালা' প্রণয়ন করাইয়া ছিলেন। তাহার পর ক্রমান্বয়ে রাজাদিগের ইতিহাস। ইহাতে মালাকারগণ মালা প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। 'চৈতন্য—চরিতামৃত' গ্রন্থ হইতে প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ লিখিত। অন্ততঃ ধরিয়া লইতে গেলে এই ৫২০ বৎসর বঙ্গভাষা ত্রিপুরার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। বঙ্গভাষার পক্ষে ইহা নিশ্চয় গৌরবের বিষয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় আমার সোনার চেনের সহিত একখানা সোনার মোহর দোদুল্যমান দেখিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, '' তোর চেইনের ঝলমলানির সঙ্গে যে মোহর চকচক করিতেছে' ইহা কোন মোহর?'' আমি বিনম্র বচনে তাঁহাকে বলিয়াছিলাম (১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের কথা) ইহা আমাদের রাজ্যের মোহর। তিনি হাতে করিয়া পাঠ করিলেন ''শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণপদে শ্রীযুত মহারাজা গোবিন্দমাণিক্য, শ্রীশ্রী মহারাণী গুণবতী দেব্যা।''ইহা পাঠ করিয়াই তিনি পুলকিত হইয়া উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিদিগকে বলিয়াছিলেন, ''ইহাতে যে বাঙ্গালা ভাষার ছাপা। তবে আমার বাঙ্গালা রাজভাষা?'' এই বলিয়া তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া এসিয়াটিক সোসাইটীতে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নিকট লইয়া যান। তার পর ত্রিপুরার তদানীন্তন মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের নিকট তাঁহারা উভয়ে পত্র লিখিয়া উক্ত মহারাজকে '' বঙ্গভাষা সংবর্দ্ধন সভার'' পৃষ্ঠপোষকরূপে পাইয়াছিলেন। তখন আমার পঠদ্দশা কাল। ত্রিপুরার রাজগণ বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন এবং নিজেরা ধন্য হইয়াছেন, একথা উল্লেখ করা বাহুল্য। ত্রিপুরার মহিলাকুলও বঙ্গভাষা চর্চা করিতেন ইহার অনেক প্রমাণ দেওয়া যায়। এই কুমিল্লা নগরে ধর্ম্মসাগর, নানুয়ার দীঘি এবং রাণীর দীঘি এখনও শহরে পানীয় জল সরবরাহ করিয়া থাকে। নানুয়া ছিলেন মহারাজ দ্বিতীয় ধর্ম্মমাণিক্যের পত্নী। নানুয়া তাঁহার ডাক নাম ছিল। পিতামহ মহারাজ মহেন্দ্র মাণিক্য আদর করিয়া নাতি বৌকে 'নানুয়া' নামে ডাকিতেন। পিতামহের মৃত্যুর পর পুত্র অভাবে পৌত্রকে সিংহাসনস্থ হইতে হইয়াছিল। তখন দ্বিতীয় ধর্ম্মমাণিক্য কুমিল্লা নগরীতে রাজধানী করিয়াছিলেন। স্বামী স্ত্রীতে মিলিয়া এই দুইটি দীর্ঘিকা খনন করাইয়া একই দিবস ধর্ম্মসাগর ও নানুয়ার দীঘি মহেন্দ্র মাণিক্য মহারাজের স্বর্গার্থে

*বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কুমিল্লা—শাখার বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

এবং প্রজাবর্গের কল্যাণার্থে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ২৮০ বৎসর পূর্ব্বের কথা। 'রাজমালা' ব্যতীত আমাদের আরও দুইখানা প্রাচীন গ্রন্থ আছে,–'শ্রেণীমালা ' ও 'কৃষ্ণমালা'।প্রথমখানা ত্রিপুরার মহারাজগণ যে সব শ্রেণীতে বিবাহ আদানপ্রদান করিয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস এবং দ্বিতীয় খানা ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজা কৃষ্ণমাণিক্য প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে ত্রিপুরার আচার ব্যবহার, রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয় বিশদভাবে লিখা আছে, যাহা পাঠ করিলে তদানীন্তন মহারাজগণের ইতিহাস সম্যকরূপে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। 'শ্রেণীমালায়' লিখা আছে–

''কুমিল্লাতে ধর্ম্মসাগর করিয়া খনন,
ধর্ম্মসাগর নাম রাখিল তখন।
ধর্ম্মশীলা রাণী নামে দীর্ঘিকা খনিল,
কুমিল্লাতে নানুয়ার দীঘি নাম হইল।।''

অপ্রাসঙ্গিকরূপে একটি কথা নিবেদন করিতেছি। স্যার ব্যাম্ফিল্ড ফুলার (Sir B.Fuller) যখন পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ছোটলাট ছিলেন, তখন ধর্ম্মসাগর 'বাঙ্গালা' সহিত দীঘির উত্তর পাড় গভর্ণমেন্ট হইতে acquire করিবার প্রস্তাব হয়। তখন ফুলার সাহেবের সহিত আমার আলাপ হয়। ধর্ম্মসাগর খনন কর্ত্তা (১৪০৭ খৃঃ অব্দে) ছিলেন শ্রীধর্ম্মমাণিক্য। আমি ইহা কৈলাশবাবুর 'রাজমালা' পাঠ করিয়া জানি এবং ইহা আমাদের এ অঞ্চলেরও ধারণা। ফুলার সাহেব হাসিয়াছিলেন এবং Government Record সত্য কথা Record করে" একথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট সেই Record পাইতে প্রার্থনা করি। সেই Record পাইয়া অবগত হইলাম ''শ্রেণীমালার" কথা এবং Buller সাহেব নামক একজন ত্রিপুরার Resident বর্ত্তমান ধর্ম্মসাগরের 'বাঙ্গালা' প্রস্তুত করেন।

এই ধর্ম্মশীলা বা নানুয়া দেবী বঙ্গভাষায় পণ্ডিত্য ছিলেন এবং পার্শী ভাষাতেও তাঁহার বিশেষ দখল ছিল। অনেক অনুসন্ধান করিয়া পার্শী ভাষায় গজল নামক সঙ্গীতের কয়েক টুকরা সংগ্রহ করিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এতদঞ্চলের উচ্চারণ দোষে ইহার পাঠ ঠিক করিতে পারিতেছি না। বাঙ্গালা ভাষায় একখানা গ্রন্থ ছিল, তাহার নাম এখন লুপ্ত। কেবলমাত্র একটা গানের পালা পর্ব্বত অঞ্চলবাসী লোকেরা গাহিয়া থাকে। তাহাও সম্পূর্ণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই এবং সংগ্রহ করা শ্রমসাধ্য বটে।

কৃষ্ণমাণিক্যের পত্নী ছিলেন জাহ্নবা দেবী। ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে যখন কৃষ্ণমাণিক্য মানবলীলা সংবরণ করেন, তখন জাহ্নবা দেবী স্বামী সহ পুড়িয়া সতী হইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বিধাতা বাম হইলেন। ত্রিপুরা রাজ্যের তখন রেসিডেন্ট (Resident) ছিলেন Mr.R.Leak তিনি আসিয়া উত্তরাধিকারী ঠিক না হওয়া পর্য্যন্ত রাণী স্বামীর সহগমন করিতে পারিবেন না, এই আদেশ গভর্ণমেন্ট হইতে আসিয়াছে বলিয়া জানাইলেন। জাহ্নবা দেবী পুত্রবতী ছিলেন না; কাজেই গভর্ণমেন্ট জাহ্নবা দেবীকেই রাজ্যভার নিবার জন্য মহারাণী পদে নিযুক্ত করিলেন। বিষয়টা ভাবিলে একটা কথা স্বতঃই মনে হয়। অসূর্য্যম্পশ্যা একটি ত্রিপুরা রমণী জীবনে কোন দিন যিনি রাজকার্য্য কাহাকে বলে জানেন না, এমন একটি মহিলার উপর যখন রাজ্যভার পড়িয়াছিল অথচ সতী হইবার পথ বন্ধ হইয়া গেল, তখন তাঁহার হৃদয়ের ভাব কি হইয়াছিল, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। আর একটা ভাবিবার কথা, সামান্য একটা ত্রিপুরা জাতির মধ্যে বিধবাবিবাহ পত্যন্তর গ্রহণ এবং Court ship প্রথা থাকা সত্ত্বেও সতী হইবার আকাঙ্ক্ষা কেন এত প্রবল ছিল, একথা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। শ্রদ্ধেয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ লিখিয়াছেন, ''চরণ সেনাপতি" নামক এক ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী নিসন্দবতীর সহমরণ উপলক্ষে গভর্ণমেন্ট উদ্বেলিত হইয়া পড়েন। এবিষয়ে ১৮৮৮ সালের Bengal Administration Report এ লিখিত আছেঃ—

" The Maharaja has in accordance with advice given to him prohibited by a duly promulgated order the practive of suttee which formerly was permitted.''

ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট সতীদাহ প্রথা উঠাইয়া দিবার বহু বৎসর পরে ত্রিপুরা রাজ্য হইতে এই প্রথা রহিত হইয়াছিল। আমি

ভারতের অনেক প্রদেশ ও বহু স্বাধীন রাজ্যে গতিবিধি করিয়াছি। সে সব স্থানে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,'' একমাত্র হিন্দু ছাড়া অন্য জাতির মধ্যে সহমরণ প্রথা নাই। সতী হিন্দুগণ বৈধব্যযন্ত্রণা হইতে চিরবিদায় নিবার জন্যই এই প্রথা অবলম্বন করিতেন; কিন্তু পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে সেই বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিবার কোন কারণ ছিল না। তবু কেন ইঁহারা সতী হইয়া মরিতে এত সাধ করিয়াছিলেন ?" শত শত দৃষ্টান্ত এবং সতীর চিহ্ন পাহাড় অঞ্চলে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে এবং এখন পর্য্যন্ত ঐ বংশের সতীগণের পূজা হইয়া থাকে। ইহারা কোন্ জাতি, উপস্থিত শ্রোতৃবর্গ তাহার বিচার করুন। জাতি–তত্ত্ববীদদিগের নিকট ইহাই আমার সানুনয় প্রার্থনা।

মহারাণী জাহ্নবা দেবী যখন পুড়িয়া মরিবার সাধ মিটাইতে না পারিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন, তখন তিনি রাজকার্য্যে ব্রতী হইলেন। তিনি কিরূপে রাজত্ব করিতেন, তাহার বিবরণ তদানীন্তন রেসিডেন্ট (Resident) Mr. Leak ১৭৮৩ সালে যে রিপোর্ট করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া আমাদের ভূতপূর্ব পলিটিক্যাল এজেন্ট (Political Agent) Mr.F.H. Skrine (এক্ষণে অবসরপ্রাপ্ত হইয়া বিলাতে আছেন) লিখিয়াছেন ঃ—

"The most conservative must admit that when an Indian female has been vested with power, she has generally used it to greater advantage than the majority of rulers belonging to the stronger sex as it is called.''

প্রাচীন হইতে প্রাচীনতম এই ত্রিপুরা রাজ্য মধ্যে আবহমান কাল যে শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল, সে শক্তির প্রভাবে যে বীর্য্যবান পুরুষ ও রমণী উৎপাদিত হইয়াছিল, তাহারই চিহ্ন অদ্য পর্য্যন্ত আমরা দেখিতেছি এবং পাইতেছি। কলা বউও রাজ্যশাসন করিতে পারে এবং সতীত্ব রত্ন রক্ষা করিতে পারে, ইহা প্রাচীন ত্রিপুরার গৌরবচিহ্ন। মহারাণী জাহ্নবা একটি অস্পৃষ্ট জাতিকে সচল করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন। এক্ষণে সে জাতি জাত্যাভিমান এবং শিক্ষাভিমান করিতে পারে। এ সহরের অতি নিকটেই ইহাদের বাসস্থান।

মহারাণী জাহ্নবা চারি বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া উপযুক্ত লোককে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করতঃ এ রাজ্যের ভারবাহীর কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শেষজীবনে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাধামাধব দেবতার সেবাকার্য্যে জীবন কাটাইয়াছিলেন। আখাউড়া রেলওয়েষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী স্থানে রাধামাধব দেবতা এখনও বিরাজ করিতেছেন। দেবালয় যে প্রস্তর–ফলক বক্ষে ধারণ করিয়া আছে, সেই প্রস্তরখানা সংস্কৃত বচনে উৎকীর্ণ হইয়াছে। সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞা মহারাণী জাহ্নবা এই বচনের সৃষ্টিকর্ত্রী। দুঃখের বিষয় প্রবন্ধ লিখার সময় ত্রিপুরার ''শিলালিপি" নামক গ্রন্থখানা আমার নিকট ছিল না। আমার কার্য্য—বাহুল্যে রাধানগর যাইয়া তাহা সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারিলাম না। তজ্জন্য উপস্থিত ভদ্র মণ্ডলীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। তাঁহার হস্তাক্ষর দেখিতে পাইয়াছি—মুক্তার মত লেখা। মোগরাগ্রাম নিবাসী সেনাপতি বংশীয়েরা আমার মাতুল সম্পর্কান্বিত। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত অর্চ্চা মূর্ত্তি রাধামাধব দেবতার উদ্দেশ্যে যে সব সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাহা আমার মাতুল স্বর্গীয় রামশঙ্কর সেনাপতির নিকট দেখিতে পাইয়াছিলাম। বলা বাহুল্য, এই সেনাপতিবংশ মহারাণী জাহ্নবার বিশ্বস্ত লোক ছিল। এই জন্যই উভয় দেবতার নাম এক হইয়াছিল।

মহারাণী ধর্ম্মশীলা ও মহারাণী জাহ্নবা সম্বন্ধে যে সব উপকথা (Folk lore) প্রচারিত আছে, তাহা সংগ্রহ করিয়াছি ও করিতেছি। উপকথা দ্বারা যে সব দেশীয় সংবাদ পাওয়া যায়, তাহার একটা সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

মহারাণী জাহ্নবার নির্ব্বাচিত যুবরাজ দুর্গামণি পরে দুর্গামাণিক্য নামে রাজমুকুট ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী মহারাণী সুমিত্রা দেবীর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ভাগবত শাস্ত্রে তিনি বিদুষী ছিলেন। ৯৩ বৎসরে তাঁহার লীলার অবসান হয়। এই কুমিল্লা নগরীতে তাঁহার শরীর চিতাভস্মে পরিণত হয়। ইনিও সামান্য ত্রিপুরা গালিম সম্প্রদায় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। আমি অতি শিশুকালে তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। বীরচন্দ্র মাণিক্যের অভিষেককালে তাঁহার তেজস্বিনী মূর্ত্তি এবং পণ্ডিতের মত শ্রীসম্পন্ন মুখাবয়ব এবং মহারাণীর মত তাঁহার বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে মহাশ্বেতার মত বোধ করিয়াছিলাম।

তাঁহার কন্যা আনন্দময়ী দেবী ৮৩ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। অল্প বয়সে তিনি বিধবা হন ও মাতার মত শিক্ষিতা ছিলেন। যৌবনকালে আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি। ১৮৮৫ সালে তাঁহাকে আমি আমার কন্যার অন্নারম্ভ উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়াছিলাম। পিতৃদেব তাঁহাকে মাতৃ–সম্বোধন করিতেন এবং তিনিও পিতৃদেবকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। তখন রাত্রিকাল। আমি যখন নিমন্ত্রণের সাজি তাঁহার পদে সমর্পণ করিলাম, তখন তিনি হাস্যমুখে বলিয়াছিলেন, ''তোর বাপের অন্নারম্ভের সময় আমি তোদের বাড়ী গিয়াছিলাম। আজ তাঁহার পুত্র তুই আসিয়া তোর কন্যার অন্নারম্ভের নিমন্ত্রণ করিলি ! ভগবান দিন কাটাইয়া নিতেছেন ভাল। আমি নিশ্চয় যাইব।'' দেবী আমার বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। সময় নিরূপণ ও বারবেলা ইত্যাদি লইয়াএকটা বাগ্বিতণ্ডা সর্ব্বত্র সর্ব্বকালেই হইয়া থাকে। কিন্তু আনন্দময়ী দেবীর আগমন মাত্র সব ক্রিয়া—কলাপ মেশিনের ন্যায় সম্পাদিত হইয়া গেল। এমন সরস গ্রাম্য সম্পর্কে সকলকে ধরিয়া নিয়া তিনি যেন স্বর্গ হইতে নামিয়া মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণা হইলেন। এ দৃশ্য অদ্য পর্য্যন্ত আমার হৃদয় হইতে যায় নাই। তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি ''আমাদের কৌলিক প্রথা ও গ্রাম্য সম্পর্ক বজায় থাকিলে সুখ এবং ভোগ এ রাজ্য হইতে কখনও যাইবে না। ভোগ ও সুখের জন্যই রাজা প্রজা।'' দুই বৎসর পর তিনি সন্ন্যাস রোগে প্রাণ ত্যাগ করেন। ইহাকেই বলে ইচ্ছা মৃত্যু।

আমি তাঁহার জীবিতাবস্থায় দেখিয়াছি, তিনি তৈলের প্রদীপ জ্বালিয়া গ্রন্থপাঠ করিতেছেন এবং উপস্থিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট ব্যাখ্যা করিয়া যাইতেছেন। জানিতে পারিলাম, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইতেছে। তিনি রাস পঞ্চাধ্যায় ব্যাখ্যা করিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অমরকোষ মুখস্ত বলিয়া যাইতেছেন। আমি অবাক হইয়া গেলাম। কারণ জানি, পিতা দুর্গামাণিক্য প্রায় মূর্খ ছিলেন। বাঘ শিকারের প্রসঙ্গ ছাড়া কোন প্রসঙ্গই তিনি শুনিতেন না এবং জানিতেন না। এ বৃদ্ধা রাজকুমারীর স্বামী ছিল নিতান্ত মূর্খ ঠাকুর লোক। ইনি কি প্রকারে বিদুষী হইলেন ? গ্রাম সম্পর্কে তিনি আমার পিতামহী। এজন্য আমি তাঁহাকে ''নানু'' সম্বোধন করিতাম। জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলাম, ''মূর্খের বাড়ীতে জন্মিয়া মূর্খ স্বামী কূলে পড়িয়া আপনি কিরূপে শিক্ষিত হইলেন, আমার জানিবার কৌতূহল জন্মে। আমি আধুনিক কালের লোক। আধুনিক কালের ধারণা, সে সময়ে স্ত্রী–শিক্ষাই ছিল না।'' তখন তিনি অভিমানের হাসি হাসিয়া উত্তর দিলেন, ''দাদা, বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতী স্ত্রীলোক, ইহা তোরা ভুলিতে পারিয়াছিস ? বাবা মহারাজ বলিতেন, পুরুষের অনেক পুরুষোচিত কাজ আছে,—অস্ত্র শস্ত্র ও যন্ত্র লইয়া জীবন কাটাইতে হয়; কিন্তু স্ত্রীলোকের মানুষের মত জীবন কাটাইবার বিদ্যাধন ছাড়া আর কি ধন আছে ? অবলাদের বিদ্যাবল ব্যতীত আর কি বল থাকিতে পারে ? '' বাস্তবিক সেদিন এ বৃদ্ধার নিকট পুরাতন সংবাদ নতুন করিয়া শুনিতে পাইলাম। যেদিন তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন, আমার মনে হইল ত্রিপুরার সতী দেবী চলিয়া যাইতেছেন। তাঁহার চিতাভস্ম এক মুঠি হাতে করিয়া আনিয়াছিলাম। তাহা এক্ষণেও আমার নিকট আছে।

স্বর্গীয়া রাজকুমারী অনঙ্গ–মোহিনীর নাম সাহিত্য জগতে প্রায় সকলেই জানেন,—আমাদের মধ্যেও সকলেই জানেন। অসূর্য্যম্পশ্যা রাজকুমারী যে সব কবিতালহরী লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিয়া এবং পাঠ করিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। এমন শিক্ষা তিনি অন্তঃপুরে থাকিয়া কি প্রকারে পাইয়াছিলেন ? তাঁহার শেষ সময়ে আমি তাঁহাকে অনেকবার দেখিয়াছি এবং আলাপ করিয়াছি। আধুনিক বঙ্গভাষা তাঁহার, করায়ত্ব ছিল এবং তিনি যে বিদুষী ছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। স্বামী যিনি ছিলেন, তিনি শিক্ষিত বলিয়া অনেকে বলিবেন না। স্বামীর দ্বারা তিনি শিক্ষা পান নাই কিন্তু স্বামীর যত্ন এবং প্রেম দ্বারাই তিনি বর্দ্ধিতা হইয়াছিলেন এবং কাব্য জগতে নাম রাখিয়া গিয়াছেন। বৈধব্য–জনিত আশু শোক সংবরণ করিয়া যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন তাঁহার প্রকৃত অবস্থা, তখন তিনি ''প্রীতি'' নামক গ্রন্থখানা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পিতা বীরচন্দ্রের প্রভাবে তিনি বৈষ্ণব পদাবলীর অন্তরম রস হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি এই ক্ষণে স্বর্গে। তাঁহার গোপনীয় কোন কথা ব্যক্ত করার বাধা নাই। স্বামী উজির গোপীকৃষ্ণ ঠাকুর মৃত্যু শয্যায় কয়েকদিন কাটাইয়াছিলেন, বাকশক্তিহীন অবস্থায়। নীরবে নয়নকোণে মাত্র সহধর্ম্মিণীকে দেখিতেন আর অশ্রু ত্যাগ করিতেন। আমি তাঁহার রোগসয্যায় সরকারী তাবেদার ছিলাম অর্থাৎ মহারাজের পক্ষে উপস্থিত ছিলাম। তখন অনঙ্গমোহিনী একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, ''যদি সহমরণ প্রথা রহিত না হইত, তাহা হইলে

আমি অগ্নিস্নান করিয়া স্বামীর অনুগমন করিতাম।” তিনি কাব্য—জগতে অনুমরণ রাগিণীতে যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহার স্মৃতিরূপে বঙ্গ ভাষায় চিরকাল থাকিবে। লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া “প্রীতি” হইতে একটি কবিতা উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

আমি না পাই দেখিতে নয়নে তোমায়
পাব না দেখিতে কভুও;
ওগো নয়ন দুটির কোণায় কোণায়
ফুটিয়া উঠিছ তবুও।
একি ! স্নিগ্ধ শীতল বাতাসে আসিয়া
তোমার পরশ লাগিছে;
একি ! অরুণ কিরণ নয়নে ভাসিছে—
তোমার দরশ জাগিছে !
কোন্ সুদূর হইতে শ্রবণ রমিয়া
আসে তব প্রেমগীতি গো ?
মম হৃদয় ছানিয়া উথলে অমিয়া
এই কি তরল প্রীতি গো ?
একি মিশ্রিত সুখ ! অমৃতে গরল ?
কাঁদি কেন সুখে মাতিয়া ?
এ যে দাহন করিয়া করিছে শীতল
করিছে মুক্ত বাঁধিয়া !”

১৮৫০ সালে এসিয়াটিক সোসাইটিতে ‘রাজমালার’ আলোচনা প্রকাশিত হয়। রেভারেণ্ড লঙ্গ (Rev.Long) তাহার সমালোচনা করেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন, “The Tripura women remind me of Mahabharata time and Rajputana History. The people of Tippera like Sikhs were military race.” যথার্থ সমালোচনা বটে।

‘রাজমালা’ খানা বঙ্গভাষায় রত্নমালা। কেবল মাত্র এই পুস্তক হইতেই ত্রিপুরার সাহিত্য—সেবিগণ যে অপূর্ব মালা রচনা করিতে পারিবেন, তাহাতে কালে বঙ্গভাষা রত্নমালায় ভূষিত হইবেন। পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় শ্রীশ্রী যুত মহারাজ বাহাদুরের অনুরোধে ‘রাজমালা’ ছাপাইবার ভার নিয়াছেন। ১১ খানা পুরাতন “রাজমালা’র পাঠ মিলাইতেছেন এবং তাঁহার দ্বারা পরিশিষ্টরূপে ত্রিপুরার পূর্ব্বাপর ঘটনার বিবৃতি থাকিবে। তিনি ইহার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছেন, তাহা আমি জ্ঞাত আছি। ইহাতে সময় লাগিতে পারে; কিন্তু কাজ ভাল হইবে। প্রত্নতত্ত্ব—পারদর্শী উপযুক্ত লোকের হাতে প্রাচীনতার মহিমা প্রকাশ পাইবে। আশা করা যায়, Tod এর Rajasthan এর ন্যায় এ গ্রন্থ আদরণীয় হইবে।

লোভে লোভ বাড়ে। উপসংহারে আমি রাধাকিশোর মাণিক্য সম্বন্ধে নিবেদন করিব। ইংরাজী ভাষা অনভিজ্ঞতার দরুণ তিনি কাতর ছিলেন না, বরং বঙ্গভাষাকে তিনি করায়ত্ত করিবার দরুণ বিজ্ঞান জগতে পর্য্যন্ত নমস্য হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেন সর্ব্বান্তঃকরণে তাহা বুঝিয়াছিলেন। এই বিষয়ে আমি ভুবনবিখ্যাত ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞান—আগারে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে তবে প্রাসঙ্গিকভাবে নিম্নে আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের মন্তব্য উল্লেখ করিতেছি—

“ The Maharaja was a great scholar in the vernacular, though he was totally unacquainted with the English language.”

সিলাইদহে ঃ—স্যার জগদীশ, লোঁকেন্দ্রনাথ পালিত, রবীন্দ্রনাথ, বালক রথীন্দ্রনাথ,

এ বিষয়ে আমার বলিবার অধিকার আছে কিনা উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী বিচার করিবেন। আমি রাধাকিশোর মাণিক্যের সেবক ছিলাম এবং ছায়ার মত তাঁহার সঙ্গী ছিলাম। রাজসেবক রূপে আমি একটি রাজার সহিত একটি বিজ্ঞানাচার্য্যের মিলন হইয়াছিল কি কারণে এবং কি ভাবে তাহা বলিতে পারি। ১৯০০ খৃঃ অব্দের বিষয়। একদিন শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাকে জানিতে দিয়াছিলেন, ''আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর নতুন তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রেসিডেন্সী কলেজে অদ্য রাত্রে Experiment হইবে। যদি তুমি পার, উপস্থিত হইও।''

এই টোকাখানা লইয়া আমি মহারাজ সকাশে উপস্থিত হইলাম এবং বিদায় চাহিলাম। তিনি অভিমান বরে বলিলেন, ''তুমি যাইবে আর আমি যাইতে পারিব না? আমিও অদ্য রাত্রে যাইব।'' যথাসময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের Laboratory তে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, বিজ্ঞ লোকের সমাবেশ হইয়াছে। রবিবাবু মহারাজকে দেখিয়া পুলকিত হইলেন এবং আচার্য্য জগদীশ বসুর সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। তখন মহারাজ সুমধুর স্বরে অথচ অভিমান ভরে ডাক্তার বসুকে বলিলেন, ''আমি যে আপনার ছাত্র, আমাকে কেন তামাসা দেখিতে দিবেন না? আমি ''সঞ্জীবনী'' পত্রিকা পাঠ করিয়া থাকি। কাজেই আপনার নবাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে কিছু কিছু পাঠ করিয়াছি।'' তখন সমবেত জন–মণ্ডলীর সঙ্গে মহারাজা বসিয়া গেলেন এবং Experiment দেখিতে লাগিলেন। প্রায় দুই ঘন্টা কাল লাগিয়াছিল। Experiment শেষ হইয়া গেলে ডাক্তার বসু স্বর্গীয় মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, '' আমি ইংরাজীতে বলিয়াছি, আপনি কিছু বুঝিয়াছেন কি?'' তখন স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, ''আমি ইংরাজী জানি না। তবে যদি আপনি আমাকে আপনার যন্ত্র দেখিতে দেন, তাহা হইলে আমি বুঝিতে পারিব, বুঝিতে পারিয়াছি কিনা''। জগদীশ বাবুর যন্ত্রে হস্তক্ষেপ করা জগদীশ বাবু সাবধানতার সহিত নিষেধ করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি ঐ যন্ত্রের নিকট মহারাজকে নিয়া গেলেন এবং পরীক্ষার নয়নে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিতেছিলেন। তখন মহারাজ একখানা পুঁথি লইয়া যন্ত্রের সম্মুখে ধরিয়া দিলেন এবং ডাক্তার বসুকে অনুরোধ করিলেন, ''আপনি এক্ষণে Shock দিয়া দেখুন,'' কিন্তু Respond করিতেছে না। তখন মহারাজ বহিখানা উল্টাইয়া দিলেন Shock দিতে অনুরোধ করিলেন। তখন ঠিক যন্ত্রে Respond করিয়া গেল। জগদীশ বাবু পুলকিত হইয়া গেলেন এবং বলিলেন, ''মহারাজ, আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন বুঝিতে পারিলাম। Lord Elgin কে আমি বুঝাইতে পারি নাই; আমার এম এ ক্লাসের ছাত্রবর্গও বুঝিতে পারে না। আপনি আমাকে অবাক করিয়া ছাড়িয়া দিলেন।'' ১৯০০ খৃঃ অব্দ হইতে অদ্যপর্যন্ত আমি ঐ তত্ত্ব সম্বন্ধে আনাড়ি, ইহা স্বীকার করা আমার মত বিজ্ঞান–মূর্খ লোকের লজ্জার কারণ কিছু মাত্র নাই। ঐ সময় হইতে একটি রাজার সহিত একটি জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের মিল হইয়া গিয়াছিল কি উপায়ে? বঙ্গভাষাই তাহা করিতে পারিয়াছিল, একথা স্বয়ং আচার্য্য জগদীশ বসু,যিনি বিজ্ঞান জগতে বরমাল্য পাইয়াছিলেন, তাঁহার ভাবে এবং ভাষায় স্বীকার করিতেছেন।

টাকা অনেকে দান করিয়া থাকেন। প্রতিষ্ঠা পাওয়াই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু ত্রিপুরার মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য নীরবদাতা ছিলেন। ইহাও ডাক্তার বসু বলিতেছেন এবং আরও বলিতেছেন ''রাধাকিশোর মাণিক্যের মত বন্ধু না পাইলে তিনি অদ্য বিজ্ঞান জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেন কিনা, সন্দেহ করেন এবং দুঃখ করেন, এমন বন্ধু অদ্য এ জগতেই নাই, স্বর্গে আছেন।'' অধম আমি এ বিষয়ে যাহা জানি, তাহা লিখিতেছি। যখন বিলাত হইতে সংবাদ পাইলেন, জগদীশ বাবু চিন্তান্বিত এবং ত্রাসিত, তাঁহার আবিষ্কার মাঠে পড়িয়া মরিতেছে, তখন রাজার মত দান দ্বারা এবং সহানুভূতি দ্বারা তিনি জগদীশ বাবুকে পত্র লিখিয়া দিলেন ঃ—

''আপনার অপারগতার সহিত আমাদের মুণ্ডপাত হইবে, এ কথা মনে রাখিবেন। সাগর পার হইতে আপনাকে বরমাল্য লইয়া আসিতে হইবে।'' তিনি বিশ হাজার টাকার চেক কাটিয়া ডাক্তার বসুর নামে তার (Cable) করিলেন এবং আমাকে জানিতে দিলেন, ''খবরদার ঘুণাক্ষরেও যেন বাহিরের লোকে টের না পায়। অদ্য আচার্য্য বসু যে উপঢৌকন ভারত মাতার নিকট উপস্থিত করিয়াছেন, ত্রিপুরার প্রজামণ্ডলী সে গর্ব্বে গর্ব্বিত।

উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর দরবারে আমার এই নিবেদন। ত্রিপুরা রাজগণ সর্ব্বদাই দানবীর ছিলেন, বঙ্গভাষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং বঙ্গদেশের মাণিক ছিলেন ও এখনও আছেন। এ কথা বলিতে আমার প্রগলভতা দোষ হয় না, বরং আপনাদের মনস্তুষ্টি হইবে' ইহা আমি জানি। এজন্য এই কথা নিবেদন করা আমার পক্ষে সঙ্গত মনে করিয়াছি। এ নজর লইয়া আপনাদের দরবারে উপস্থিত হইয়াছি। আপনারা প্রীতিপূর্বক গ্রহণ করিলে আমি কৃতার্থ হইব।

ত্রিপুরায় বঙ্গভাষা।

নববর্ষের স্মৃতি

শেষ রাত্র, ঘড়িতে চারটা বাজিয়া গেল। নববর্ষের সূচনা আরম্ভ হইল হৃদাকাশে। নতুন পঞ্জিকা এবং নববর্ষ সর্ব্বদা এক সঙ্গে আসিয়া থাকে। পার্শ্বের আম্রকানন হইতে কোকিল কুহু স্বর আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর ছেলেপিলের দল তাহাতে যোগ দিল। নববর্ষের ছুটী পাইয়া যাহারা বাড়ীতে আসিয়াছিল তাহারা হঠাৎ গাত্রোত্থান করিয়া স্বীয় স্বীয় ফুলের সাজি লইয়া পুষ্প সংগ্রহের জন্য ধাবিত হইল, সংগ্রহ করিতে না চুরি করিতে? পাড়া প্রতিবেশীর বাগানে আজ লুট লাগিয়া গিয়াছে।কেহই এই ফুল চোরাদের গ্রেপ্তার করিবে না, ইহা তাহারা জানে; প্রত্যেক নববর্ষ তাহার সাক্ষী। অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নবদিন, নববর্ষ এবং নব আশা ভরসা আসিয়া উপস্থিত হইল। আর তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হইলেন ''শিরোরত্ন মহাশয় গ্রহাচার্য্য''—যাঁহাকে দেখিলে পরে মনে হয় সংক্রান্তি পুরুষের মত। আজ ঠিক দিনে ও ঠিক সময়ে এই সংক্রান্তি পুরুষ উদয় হইলেন আমাকে সাবহিত করার জন্য।

সর্ব্বৌষধি দ্বারা স্নান এবং পঞ্চকষায় যোগে দন্তধাবন, পঞ্চতিক্ত যোগে পাকস্থলীর জীর্ণ সংস্কার এবং দেবালয়ে পঞ্চ দেবতার পূজার সহায়তা গ্রহাচার্য্যের কর্ত্তব্য কাজ। তাই তিনি আমার দরজায় ধাক্কা দিয়া বলিতেছেন ঃ—

''গাত্রোত্থান করুন—'' সংক্রান্তি পুরুষ আমাকে ছাড়িলেন না, আমাকে শয্যাত্যাগ করিতে হইল। অরুণোদয়কালের রুক্তিমবর্ণ পূর্ব্বাকাশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মনে করিলাম নববর্ষ আজ আবির খেলিতেছে।

''লালে লাল আজি কালতনু,
বৈর—নারী শত আজি—একলা কানু।''

যথা সময়ে সময়োচিত কার্য্য শাস্ত্রানুসারে সম্পাদিত হইয়া গেল। বাগান লুটিয়া যাহারা আনিয়াছিল তাহাদিগের সংগৃহীত পুষ্পে বাড়ীর মেয়েরা চমৎকার ফুলশয্যা তৈয়ারী করিয়াছেন। পঞ্চপুষ্প দ্বারা মালা, পাখা, ছত্র, ফুলের বিছানা এবং বিষ্ণু অর্চ্চনার জন্য বিনা সূতে গাঁথা মল্লিকা পুষ্পের ছড়া। ত্রিপুরার ন্যায় ফুলশয্যার বাহার কুত্রাপি দেখা যায় না। আজ গো—পূজা, গোকুলকে কত রকমে এবং কত উপায়ে পুষ্পদ্বারা সাজাইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর রাখাল চাকর পর্য্যন্ত বর বেশে সাজিয়াছে। কোন রসিকা গাহিয়াছিলেনঃ—

''কি কর, কি কর, ও রাই নিকুঞ্জে,—
গাঁথ বিনা সূতে হার,
পুষ্প মনোহর,
আসবে নটবর, আজ তোমারি কুঞ্জে।''

আজ বেচারা রাখালের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। প্রতিদিন ইহার ভাগ্যে গালমন্দ খাওয়ার ব্যবস্থা থাকে। অদ্য সে নববস্ত্রে ও

পুষ্পে সুসজ্জিত বর বেশে দাঁড়াইয়াছে। শিরস্ত্রাণে পুষ্পের আভরণ—তাহাকে দেখাইতেছিল বেশ। হস্তে ''লাডু''—অর্থাৎ খইয়ের ছাতু গুড় সংযোগে প্রস্তুতী সুখাদ্য লড্ডুক। দেখিলে মনে হয় ''বালগোপাল'' এবং ননীচোরা রাখাল বালক—''পাচন খানা আজ বগলস্থ। কারণ লড্ডুক তাহার স্থান দখল করিয়াছে। মিষ্ট হাসিতে আজ তাহার বদনমণ্ডল বড় সমুজ্জল।

সকলেই রাজপ্রাসাদ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হওয়ার জন্য ব্যস্ত—সমস্ত। কারণ অদ্য রাজদর্শন এবং মহাকালের পূজা করিতে হইবে। এই বিষয় মৎ প্রণীত ''রিয়া'' নামক পুস্তিকা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

''আমরা দেখিতে পাই, দৈবকার্য্যে শিল্প জিনিস ব্যবহার করা প্রাচীন হিন্দুকুলের প্রথা। এমন কি, এই প্রথা অনুকরণ করিতে যাইয়া হিন্দুকুলে নব প্রবেশী জাতিও এই প্রথা অনুকরণ করিতে একান্ত ব্যগ্র। দেবকাজে এই প্রথা ত্রিপুররাজ পরিবারের আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। নববর্ষে ত্রিপুরা–পূজা ''গরাই'' অর্থাৎ গৌরী নামক দেবতার অর্চ্চনা হইয়া থাকে। এই অর্চ্চনা যদিও আজকাল তেমন সমারোহে সম্পন্ন হয় না কিন্তু State ভাবে রাজসিংহাসনের সম্মুখে এখনও এই পূজা হইয়া থাকে। এই দেবতার পূজোপকরণ মধ্যে আমরা দেখিতে পাই রাজার দর্পণ এবং রাণীর রিয়া দেওয়া হইয়া থাকে এবং ঐসব জিনিষের পূজা পৃথকভাবে হইয়া থাকে। রাজার দর্পণ এবং মাই দেবতার রিয়া পূজা হইবে না তবে পূজা হইবে কোন দেবতার? ''মাতা ঈশ্বরীর'' বক্ষবন্ধনী দেবোপচারে পূজা হইবে ইহাতে বিচিত্র কি? রাজবাড়ীতে সময় সময় বিশেষতঃ মহারাজার যাত্রার সময় এবং শুভ বিবাহাদির কার্য্যে ''লাম্প্রা'' পূজা হইয়া থাকে। এই পূজা ''বিনাইগর'' নামক হিন্দুদেবতার পূজা। বিনাইগর অর্থাৎ বিনায়ক গণেশ পূজা। এই পূজায় শ্রীশ্রীমতী ঈশ্বরীর রিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। এখনও মামুলীরূপে রিয়া দেওয়ার প্রথা বর্ত্তমান আছে। প্রত্যেক প্রাচীন বিষয়ে যদি আমরা অনুসন্ধান লই তাহা দেখিতে পাই যে, এই Tradition মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্য বর্তমান আছে।''

যথা সময়ে নরদেবতা মহারাজ এবং বৈশাখী দেবতা দর্শন কার্য্য সমাপিত হইল। বিজয়া দশমীদিনের ন্যায় প্রীতি আলিঙ্গন এবং কোলাকুলি শত্রু মিত্রের মধ্যেও হইয়া গেল। নববর্ষের সাদর সম্ভাষণের কিছুরই অভাব হয় নাই। নববর্ষের শুভাশীর্ব্বাদ মধ্যে আমরা স্বীয় স্বীয় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

আহারান্তে বসিয়া ভাবিতেছিলাম, নববর্ষের পূর্ব্ব ও আধুনিকভাবের কথা। নানা কথা নানা ভাবনা কত উৎসব আনন্দ, কত দুঃখ ও শোক আমাদের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

নববর্ষে আমার ''আবর্জ্জনার ঝুড়ি'' যাহা বহুবৎসর পর্য্যন্ত সংগৃহীত হইয়াছিল এবং এখনও হইতেছে, ''ঝাকামুটের'' মত তাহাকে এতকাল টানিয়া লইয়া বেড়াইয়াছি, ওটার মধ্যে কোন কালের নববর্ষের কোন খোঁজ পাই কিনা দেখিলাম, খুঁজিয়া পাইলাম একখানা পুরাতন পুস্তিকা যাহার নাম ''বার্ষিক।'' দেখিয়া মনে পড়িল গতজীবনের কাহিনী এবং ছাত্রজীবনের মধুর স্মৃতি—। এখানে প্রসঙ্গক্রমে এ গ্রন্থখানার পরিচয় দিতেছি। আমরা যখন কিশোর বয়স্ক তখন স্বর্গীয় মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য কিশোর–বয়স্ক ছিলেন। আমাদের শিক্ষক ছিলেন তখন পূর্ণযৌবন প্রাপ্ত ঁরাধারমণ ঘোষ বি এ। রাজপুত্রের শিক্ষকরূপে তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন একথা বলা বাহুল্য। সে সময়ে (সন ১২৮৬ ত্রিং) আমাদের একটা সভা ছিল, যাহার নাম ছিল ''রাজকুমার সভা।'' সেই সভা হইতে পঠিত প্রবন্ধগুলি বাছনি করিয়া প্রতি নববর্ষে একখানা পুস্তিকা রূপে প্রকাশিত হইত এবং প্রতি নববর্ষে সে সভার বার্ষিক অধিবেশন হইত প্রকাশ্যভাবে। আমাদের ''পরিদর্শক'' ছিলেন স্বয়ং রাধারমণ ঘোষ। সেইদিনের আনন্দ এবং উৎসাহ আজ স্মরণে আসিয়া মরমে পৌঁছিতেছে। ষোড়ষবর্ষ বয়ঃপ্রাপ্ত যুবরাজ রাধাকিশোর সেই সভায় একটা প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন যাহার নাম ছিল ''নববর্ষ''। ৪৫ বৎসর পর্য্যন্ত এই বার্ষিকখানা আমার চক্ষুর অন্তরালে ছিল। অদ্য যেন আমি সব প্রত্যক্ষ করিতেছি। পাঠকবর্গের মনোরঞ্জনার্থে সেই প্রবন্ধখানা পুনঃপ্রকাশিত করিয়া নববর্ষের প্রীতি উৎপাদন করিতে চাই।

অনুগ্রহপূর্বক মনে রাখিবেন ১৬ বৎসর বয়স্ক একটি দেশের ভাবী রাজা যুবরাজ রাধাকিশোর ইহা লিখিয়াছিলেন এবং

পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাব ও ভাষার উপর দৃষ্টি রাখিলে পাঠকবর্গ মহারাজা রাধাকিশোরকে চিনিতে পারিবেন। ভুবনবিখ্যাত স্যার জগদীশচন্দ্র বসু মহারাজা রাধাকিশোরকে বিশেষরূপে চিনিয়াছিলেন বলিয়া বিজ্ঞানাগারে তাঁহার বক্তৃতায় প্রকাশ্যভাবে নিম্নলিখিত মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন ঃ—

"The Maharaja was a great scholar in vernacular, though he was totally unacquainted with the English language. According to the prevailing standard, the cultural value of his acquirements would be questuioned. But the Maharaja's ignorance of English did not stand in the way of his instantly realising the significance of the lecturer's experiments. Indeed his own mind was put to its fullest activity in answering the Maharaja's most intelligent questionings as regards the trend of his work in clearing up many difficult problems.

যোড়শ বর্ষ বয়সের সহিত যে বঙ্গভাষা ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল, প্রৌঢ় মহারাজকে দেখিয়া আচার্য্য জগদীশ বসু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্য আশ্চর্য্যান্বিত হয় নাই, ইহা আমি বলিতে পারি। বঙ্গভাষাই ত্রিপুরার রাজভাষা এবং বহু শতাব্দী যাবৎ এই ভাষাই আধিপত্য করিয়া আসিতেছে।

বার্ষিক।

(১২৮৬ ত্রিং)

বৈশাখ মাস হইতে নববর্ষের প্রবৃত্তি; এই সময়ে কখনও বা তপনদেব তীব্র রশ্মিজাল বিস্তার করিয়া ধরণীকে উত্তপ্ত করিতেছেন; কখনও আবার নবীন জলধর, উত্তপ্ত ধরণীর তাপ বিমোচন জন্য অমৃতময় বারি–বিন্দু বর্ষণ করিয়া সমুদয় স্নিগ্ধ ও শীতল করিতেছেন। বৃক্ষ ও পল্লবে বসন্তের স্নিগ্ধতা ও কমনীয়তার লক্ষণ আছে, অথচ গ্রীষ্মের রুক্ষতাও লক্ষিত হয়। আম্রকোরক কখন কোকিলের পঞ্চ–সুর–সুধা শ্রবণ করে; কখনও বা ঝঞ্ঝাবায়ুর উপদ্রব সহ্য করিতেছে। এরূপ বিরুদ্ধ বেশ–বিন্যাস নববর্ষের উপযুক্তই বটে, কারণ ইনিও বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী। নববর্ষেও ধরণী উত্তপ্ত হইবে, আবার শীতলও হইবে; বসন্ত মাধুরীর ন্যায় অনেক ঘটনা হৃদয়হারীও হইবে, আবার গ্রীষ্ম দুর্দ্দৈবও থাকিবে। ভাগ্যচক্র আবার নূতন আবর্ত্তন আরম্ভ করিলে, কাহার ভাগ্যে সুখ, কাহার ভাগ্যে দুঃখ কে বলিতে পারে? এই সংসার কালের নাট্যশালা স্বরূপ নববর্ষে জীবন–নাটকের নূতন অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। একটী যবনিকা উত্তোলিত হওয়াতে ঘটনাদৃশ্যের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। অন্যান্য দৃশ্যে কি কি অঙ্কিত রহিয়াছে তাহা কেহই বলিতে পারে না। চিন্তা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছে; কুহকিনী আশা আবার ভবিষ্যৎ জগৎ স্বর্ণকিরণে প্লাবিত করিয়া সকলকে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবৃত্ত করিতেছে।

একখন্ড মেঘ দূরে দেখা যাইতেছিল, দেখিতে দেখিতে সঞ্চিত, পুষ্ট ও নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিল; বিদ্যুদ্দাম ঘনঘটার ক্রোড়ে ক্রীড়া করিতে লাগিল; শিবের তান্ডব লজ্জিত করিয়া, পবন, জটার ন্যায় মেঘমালা বিকীর্ণ করিয়া নাচিতে লাগিল; —সোঁ সোঁ শব্দে ফণীর গর্জ্জন;— মেঘ গর্জ্জনে অট্টহাস;—প্রলয় যেন উপস্থিত, ইহার কিছুক্ষণ পরে সমুদয় পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, সন্ধ্যার সুবর্ণ কান্তিতে মেঘমালাও স্বর্ণপরিচ্ছেদ পরিধান করিয়া হাসিতে লাগিল। আকাশে পূর্ব্বকালিমা নাই; সমুদয়ই উজ্জ্বল, শান্ত ও মনোরম। মনে হইল মনুষ্যের জীবনও এইরূপ চঞ্চল, পরিবর্ত্তনশীল এবং সুখদুঃখময়। নববর্ষ কি পরিণাম বিরস, না পরিণাম সরস হইবে, তাহা চিন্তা করিয়া কে স্থির করিতে পারে? যত্ন করাই আমাদের আয়ত্ত, ফলাফল ঈশ্বরের ইচ্ছা।

এই সন্ধ্যার ন্যায় আশাও মায়াবিনী। সন্ধ্যা যেমন বজ্রহৃদয় মেঘগুলিকে বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত করিয়া লোক–লোচনের আনন্দ জন্মায়—মেঘের বজ্রহৃদয়তা ভুলাইয়া দেয়, সেইরূপ আশাও ভবিষ্যতের বিপদ সমুদয় গোপন করিয়া সকলের হৃদয় এবং চিন্তা সেই দিকে আকর্ষণ করে। মনুষ্যগণ, ভবিষ্যৎ চিন্তায় একবার আসক্ত হইলে সেই দিকেই ধাবিত হয়, হৃদয় কার্য্য বিস্মৃত হইয়া কল্পনার প্রণয়ে আবদ্ধ হয়,—আকাশে মন্দির নির্ম্মাণ করিতেই মন সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে। স্থির ভূমির কার্য্যকলাপ আর তাহার ভাল লাগে না; শেষ নিরাশা তাহার সুখের স্বপ্ন ভঙ্গ করিয়া জাগরিত করিয়া দেয়। পরিতাপানলে হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকে; ভবিষ্যৎ সমালোচনার এই বিষময় ফল, এইজন্য অতিরিক্ত ভবিষ্যৎ চিন্তা নিষিদ্ধ। কিন্তু চিন্তাশীল; এখন কিরূপ চিন্তা করিলে আমাদের উপকার হইতে পারে? মনের একটি ধর্ম্ম যে, যখন কোন দীর্ঘাকৃতি পুরুষের বিষয় চিন্তা করিতে থাকে তখনই খর্ব্বাকৃতি বামনের কথা আসিয়া স্বতঃই উদিত হয়, এইরূপ সুখের চিন্তার সময়ে দুঃখের কথা, মিলনের চিন্তার সময় বিরহের কথা এবং ভবিষ্যৎ চিন্তার সময়ে অতীত কালের কথা উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। যেমন, ঘটিকা যন্ত্রের দোলক এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে দোলায়িত হয়, সেইরূপ নববর্ষে ভবিষ্যৎ চিন্তা করিবার সময়ে অতীতকালের চিন্তায় মন ধাবিত হয়, আমরা কি

করিব এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা কি করিয়াছি এই প্রশ্ন উত্থিত হয়। ''আমরা" এই শব্দটি যেরূপ আত্মীয়তা ব্যঞ্জক; তাহাতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কিরূপ কীর্ত্তিকলাপ রাখিয়া গিয়াছেন; তাঁহাদের চরিত্রে কি কি অনুকরণযোগ্য গুণ আছে; কোন্ কোন্ বিষয়ে তাঁহারা আমাদের আদর্শস্থল হইতে পারেন, এই সকল বর্ণনা করিলেই আমরা কি করিয়াছি এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দেওয়া হয়। এবং সেই সেই মহাবীর—কীর্ত্তি জীবিত নমস্য ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, তদ্বিষয়েরও একরূপ মীমাংসা হয়।

ত্রিপুরার ইতিহাস শ্রবণ সময়ে আমাদের হৃদয়ে যে কয়েকটী দৃষ্টান্ত অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে, তন্মধ্য হইতে একটি রমণী রত্নের জীবন বৃত্তান্তের কিয়দংশ মাত্র যথাসাধ্য বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যদি পাঠকগণের মনঃপুত ও হৃদয়গ্রাহী না হয়, তাহা হইলে অপরিপক্ক রচনারই দোষ, সেই গুণোজ্জ্বল চরিত্রের কোন দোষ নাই।

বিষম–সমর–বিজয়ী–মহামহোদয়ী–

পঞ্চ শ্রী যুক্ত মহারাজ কীর্ত্তিধর।

মহারাজ ধর্ম্মধরের পুত্র কীর্ত্তিধর দেব বর্মণ ১৭৩৬ খৃঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার শাসন সময়ে হীরাবন্ত খাঁ নামে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল। হীরাবন্তের জন্মভূমি পশ্চিম প্রদেশে হইলেও এরাকানাদি পূর্ব্ব প্রদেশীয় বাণিজ্যই তাহার সম্পত্তির মূল কারণ। এইরূপ বাণিজ্যে নিরাপদে ও নির্ব্বিঘ্নে কৃতকার্য্য হইবার অভিপ্রায়ে সে গৌড়েশ্বরকে উপঢৌকনাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিবার সঙ্কল্প করিল। ত্রিপুরা রাজ্যের পশ্চিম সীমাবর্ত্তী পদ্মা অথবা অন্যান্য নদী দিয়া বিনানুমতিতে নৌকাযোগে যাতায়াত করার সম্বন্ধে ত্রিপুরা রাজ্যের দৃঢ় নিষেধ ছিল। হীরাবন্ত খাঁ গর্ব্ববশতঃ সেই বিশেষ আজ্ঞা জানিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস না করিয়া গৌড়েশ্বরের উদ্দেশে উপঢৌকন স্বরূপ কয়েকটি বহুমূল্য রত্ন সমভিব্যহারে পদ্মানদী দিয়া যাইতেছিল। ত্রিপুরা–মহারাজ এই সংবাদ শ্রবণে দূতদ্বারা স্বীয় নিষেধ বিধি প্রচার করাইলেন, বণিক তখন অনুমতি প্রার্থনা করিল। গৌড়েশ্বর ত্রিপুরা মহারাজের চিরশত্রু; বণিক এরূপ শত্রুর সম্মাননার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে, শুনিয়া ত্রিপুর—নরপাল সসৈন্যে তাহার সমুদয় লুণ্ঠন করিয়া লইলেন। বণিক্, গৌড়েশ্বরের নিকট ত্রিপুর মহারাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল। গৌড়েশ্বর উপঢৌকনে বঞ্চিত হইয়া তিন লক্ষ সেনা, ত্রিপুরায় যুদ্ধার্থে প্রেরণ করিলেন। মহারাজ ভয়ে সন্ধির উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাজমহিষী নিম্নলিখিতরূপে সৈন্যদিগকে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিয়া সমরে প্রবেশ করিলেন। গৌড়সেনা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল।

১

বীর পুত্রগণ মম হও আগুয়ান,
আমি বাছা তোমাদের মায়ের সমান;
মাতৃ আজ্ঞা শিরে ধরি,
এস সবে ত্বরা করি,
বীরদম্ভে করে করি অসি খরসান;
এস, দেব আশীর্ব্বাদে হইবে কল্যাণ।

২

''চৌদ্দ দেবতার জয় জয় ত্রিপুরেশ;"
বলি সবে রণক্ষেত্রে করহ প্রবেশ।
চল চল ত্বরা চল,
আমি বাছা পক্ষ বল,

শত্রু শেষ সৈন্য আজি করিয়া নিঃশেষ,
রণবেশ ছাড়ি—লব রমণীর বেশ।

৩

"কি ভয় কি ভয় রণে, কি ভয় কি ভয়,"
বলিব না, হেন কথা বলিবার নয়।
ত্রিপুরায় বীরচয়
নয় এত ভীরু নয়
রণ–মূখে নারীকণ্ঠ শুনিয়া অভয়;
বান্ধিবে কবচ—হবে নির্ভয় হৃদয়;

(৪)

এই বাছা তোমাদের কলঙ্ক অশেষ,
এই বাছা তোমাদের মৃত্যু—নির্বিশেষ,
শুনি শত্রু ভেরী রব—
না সাজিতে বীর সব
ধরেছিল নারী এক সমরের বেশ
ধোও এ কলঙ্ক, করি সমরে প্রবেশ।

৫

ঐ শুন রণবাদ্য বাজিছে আবার,
ঐ শুন শত্রুদের প্রলয় হুঙ্কার;
ঐ শুন প্রতিধ্বনি,
সে ধ্বনি শুনি অমনি,
প্রতিরব ছলে সবে করিছে ধিক্কার—
সহে কি এ অপমান তিল আধ আর?

৬

ঐ শুন রণবাদ্য বাজিল আবার,
সচল পাষাণময় অচল এবার।
তোমাদের রক্তময়
শরীরে কি নাহি হয়,
শিরায় শিরায় বল বিদ্যুৎ সঞ্চার?
ধরি অসি—কর সবে শত্রুর সংহার।

৭

জন্মভূমি তুলামাত্র মাতার সহিত
সেই মাতৃভূমি এই রবেতে কম্পিত;
মাতৃআজ্ঞা শিরে ধরি,
মাতৃভূমি মনে করি,
সমরে মরণ ভয় কর বিদূরিত;
সমরে মরণ এ ত বীরের বাঞ্ছিত।

৮

কোথা ত্রিপুরেশ আজি এমন সময়,
সে কথা স্মরণ করি কিবা ফলোদয়?
লোহার শিকল হেলে,
যে করী ভাঙ্গিয়া ফেলে,
বল মায়াময় বিধি সমর্থ কি নয়,
বান্ধিতে তৃণেতে সেই হস্তী পদচয়?

৯

কীর্তিতে যাঁহার নাম জানে সর্ব্বজন,
তাঁহার অকীর্ত্তি আজি বিধির লিখন,
বিধাতা পুরুষবরে,
অবলার সম করে,
অবলায় বল আজি করিল অর্পণ,
কি কাজ সে কথা আর করিয়া স্মরণ।

১০

মনে কর নরবরে রোগের শয্যায়,
ভাবহে সদয় রাজা পাঠালে আমায়,
প্রাণপ্রিয়া বলি যার,
রাজাদের অনিবার,
তার প্রাণ তুচ্ছ বোধ করি, নররায়,
দেশহেতু পাঠালেন, সমরে আমায়।

১১

ভোল ওসকল কথা, করহ স্মরণ,
যদ্যপি তোমরা আজি নাহি কর রণ,

জানিবে জানিবে তবে,
মাতৃহত্যা পাপে সবে
স্পর্শিবে, আমার পণ সমরে মরণ,
এস সবে বিলম্বেতে নাহি প্রয়োজন।

১২

মনে কর পলাইয়া রাখিলে জীবন,
মনে কর জয়ী যদি হয় শত্রুগণ,
স্মরণে হৃদয় হায়,
যেন বিদরিয়া যায়,
ডুবিবে পাপেতে যত ত্রিপুরভবন,
স্পর্শে যদি একবার অরাতি পবন!

দেখিয়া রাণীর বেশ, শুনি উপদেশ
রণ বেশ করি সবে, রাখিবারে দেশ;
অসি করে পশিলেক সমর সাগরে,
বীরমদে বীরদল, আপনা পাশরে।
প্রবল—প্রবাহমুখে তৃণের মতন,
অস্থির ত্রিপুর বলে, যত অরিগণ।
‘‘জয় চৌদ্দদেবজয় ত্রিপুরেশ জয়,
জয়মাতা ঈশ্বরীর,’’ বলি সৈন্যচয়,
অরাতি দমন করি বিজয় উল্লাসে,

উঠাইয়া চন্দ্রবান সুনীল আকাশে,
ত্রিপুর–ভবনে সবে করিল প্রবেশ;
ছাড়িলেন মহারাণী সমরের বেশ।
কষিত–কাঞ্চন–কান্তি মূরতি মোহন,
আকুল তরঙ্গ হতে কমলা যেমন।

এ ঘটনা উল্লেখ করিয়া ১৮৫০ খৃঃ রাজমালা সমালোচনা করিতে গিয়া Rev.Long লিখিয়াছিলেন ঃ—

“The women exhibit a very different character from those of Bengal generally, and in daring and moral prowess remind one of the females in Rajputana or of the Mahratta country’’. (Asiatic Society, Journal, Vol. XIX, page 535).

"The women of Tripura as well as Assam were not immured and coerced in the same way as Bengali females are.'' (page 539).

উক্ত রাণীর ব্যবহৃত তরবারী আজও আগরতলার দেবালয়ে আছে এবং পূজিত হইতেছে। দুঃখের বিষয় রাণীর কি নাম ছিল রাজমালায় তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রত্যেক পূজার দিনে এই তরবারী ''বলি'' প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এবং বলির রক্তধারায় তরবারী এখনও রক্তকলেবর হইয়া থাকে ; কিন্তু প্রাচীন ইতিহাস সাধারণ লোক জানে না। যাহারা রাজ্যের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া আছে, তাহাদের প্রমুখাৎ ইহা প্রকাশ পাইয়া থাকে। রাজমালা বলিতেছে ঃ—

(গৌড়ের) ''সৈন্য সেনাপতি সবে অনুমতি দিল,
নৃপতিকে মহাদেবী অনেক ভর্ৎসিল।
অখ্যাতি করিতে চাহ আমা বংশে তুমি,
বলে, আসি দেখ রঙ্গ যুদ্ধ করি আমি।
এ বলিয়া ঢোলে বাড়ি দিতে আজ্ঞা কৈল,
যত সৈন্য সেনাপতি সব সাজি আইল।
মহাদেবী জিজ্ঞাসিল বিনয় করিয়া,
কি করিবা পুত্রসব কহ বিবেচিয়া,
গৌড়সৈন্য আসিয়াছে যেন যমকাল,
তোমার নৃপতি হইল বনের শৃগাল।
যুদ্ধ করিবার আমি যাইব আপনে,
যেই জন বীর হও চল আমা সনে।
রাণীর বাক্য শুনি সবে বীর দর্পে বোলে,
প্রতিজ্ঞা করিল যুদ্ধে যাইব সকলে।''

১৮৮৫ বৎসর পূর্ব্বের প্রাচীন ত্রিপুরার কাহিনী নববর্ষ পাঠকবর্গকে উপহার দিয়া প্রার্থনা করিতেছি শুভ নববর্ষ যেন আমরা ভবিষ্যৎ জীবনে পাই।

ত্রিপুরার শিল্প ।

প্রত্যেক দেশে দেশীয় ধরণের শিল্প বর্ত্তমান ছিল, কালপ্রভাবে শিল্পজগৎ হইতে তাহাদের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু স্বদেশী শিল্প অদ্য পর্য্যন্ত দেশীয় রাজ্যে একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই, যদিও বিলাতি শিল্প অনেক পরিমাণে স্বদেশীয় শিল্পের স্থান বিচ্যুতি করিয়া নিজ প্রভাব স্থাপন করিয়াছে, তথাপি প্রাচীন দেশীয় রাজ্যে তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে এখনও সম্পূর্ণ রকমে পারে নাই।

''ভারতীয় নৃপতিদের নিকট, দেশের লোকের নিকট, ভারতবর্ষীয় দ্রব্যগুলির মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য লর্ড কার্জন গত ১৯০২ সালের ২৯ শে ডিসেম্বর দিল্লীতে ভারতশিল্প প্রদর্শনী খুলিবার সময় দেশীয় ভদ্রমণ্ডলীকে, বিশেষতঃ ভারতের রাজন্য বৃন্দকে উদ্দেশ্য করিয়া যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, আমরা আশা করি পুরুষানুক্রমে তাঁহারা সেগুলি স্মরণ রাখিবেন। Tottenham Court নিবাসী গৃহসজ্জা নির্ম্মাতাদের কারুকর্ম্মের তুলনায় তিনি এ দেশের দ্রব্যগুলির সমধিক সম্মান দিয়াছিলেন—ঐ সব দ্রব্যের যাহাতে বহুল প্রচার হয়, সেজন্য অনুরোধও করিয়াছিলেন। ইহাতে Tottenham Court হইতে তাঁহাকে গালি পর্য্যন্ত খাইতে হইয়াছিল। Tottenham Court চটিলেন—ভারতের বড় বড় রাজরাজড়া তাঁহাদের খরিদ্দার, পাছে লাট সাহেবের যুক্তিতে খরিদ্দার ছুটিয়া যায়। কিন্তু লাট কার্জ্জনের ঐরূপ ভাষা প্রয়োগের কারণ যথেষ্ট ছিল। তিনি অনেক অনেক দেশীয় রাজ্যে ঘুরিয়াছেন;- আশা করিয়াছিলেন, প্রাচীন রাজ্যগুলির রাজভবনে প্রাচীন ভারত—শিল্পের সমাদর ও শোভা দেখিতে পাইবেন। কিন্তু যাহা দেখিলেন, তাহাতে তৃপ্তিলাভ দূরের কথা,তাঁহার বিরক্তি ও ক্ষোভের সীমা রহিল না। তিনি দেখিলেন, তৃতীয় শ্রেণীর বিলাতি গৃহসজ্জায় রাজাবাস সজ্জিত, অতি কদর্য্য বিলাতি টুম্‌টাম্‌ দ্রব্যাদিতে কলঙ্কিত,—নকলের নাকাল গ্লাসের জিনিষে শ্রীভ্রষ্ট এবং নিতান্ত শ্রীহীন, বিলাতি গালিচায় গৃহ প্রাঙ্গণ মণ্ডিত। সোনা ফেলিয়া রাংতার আদর—মণিমাণিক্যের স্থানে কুৎসিত নকল সাজ। সর্ব্বোপরি অতীব আদরের দেশীয় বস্ত্রাদির কিংখাব, শাল, ঢাকাই বস্ত্রের পরিবর্ত্তে ভারতের নমুনার সঙ্গে অসংলগ্ন জার্ম্মেণি নির্ম্মিত বস্ত্রাদিতে ইংরেজ দর্জ্জির নির্ম্মিত রাজবেশ; রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত বিলাতি নমুনায় গঠিত। আবার কোন রাজ—অন্তঃপুরে বিলাতি সাটিন—মখমল রাজরাণীদের পরিধেয় পর্য্যন্ত দখল করিয়া বসিয়াছে। এই সব দেখিয়া তিনি অবাক্‌ হইয়াছিলেন—ভারত শিল্পের জন্য অন্তরে অন্তরে ব্যথা পাইয়াছিলেন।''

ত্রিপুরা রাজ্যে শিল্প যাহা এখনও আছে তাহা শ্রেষ্ঠ আদর্শ শিল্পকলা বলা যাইতে পারে। মৎ প্রণীত ''রিয়া'' নামক পুস্তিকায় আমি ত্রিপুরা মহিলাগণের বক্ষোবন্ধনী সম্বন্ধে বলিয়াছি—''এই রিয়া যাহাতে ত্রিপুরায় জীবিত থাকে, তাহার উপায় করা রাজসরকারের একান্ত কর্তব্য। আমাদের মহিলাগণের মধ্যে রিয়া এক্ষণে আর ব্যবহৃত হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিছু দিন পরে ইহা ব্যবহার হইবে না ইহা নিশ্চয়। ত্রিপুরার মহিলাগণ যখন আপনা—আপনির মধ্যে ছিলেন, তখন তাঁহাদের বেশভূষাও আপনার ধরণের ছিল। এক্ষণে বর্ত্তমান জগতের বেশভূষা ক্রমে আসিতেছে ও আসিবে। সেই সঙ্গে ''রিয়া'' আর ব্যবহৃত হইতে পারিবে না; অর্থাৎ বক্ষোবন্ধনীরূপে ইহা ত্রিপুর—মহিলাকুলে ব্যবহার করা যাইতে পারিবে কিনা আমি সন্দেহ করি। (রিয়া ৮পৃষ্ঠা)বর্ত্তমান সময়ে আমি ত্রিপুরার সুচিকা কার্য্যের শিল্প ''সুজনী'' অর্থাৎ বসিবার আসন সম্বন্ধে আলোচনা

করিতে ইচ্ছা করি। একবার ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় পুত্র ও পুত্রবধূসহ এই রাজ্যে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তখন আমাদের মহারাণীগণ কতকগুলি শিল্পসামগ্রী বউ—মা শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে উপহার দেন। তন্মধ্যে ''রিয়া'' এবং ''সুজনী'' ছিল। এই সুজনীখানা রবীন্দ্রবাবু দেখিয়া বড় প্রীত হইয়াছিলেন। বোলপুরে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম দেখার জন্য দেশ দেশান্তরের লোক উপস্থিত হন। একবার আমি দেখিয়াছি, সেই বিদ্যালয়ে জনৈক মাদ্রাজী ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন তিনি ত্রিপুরার শিল্প দেখিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, এই মূল্যবান শিল্প আপনারা কখনও মরিতে দিবেন না। " আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম– "Mother Art does not die but slumbers.'' বোলপুরে ষ্টেশনে বসিয়া ট্রেনের অপেক্ষা করিতে করিতে মাদ্রাজী ভদ্রলোকটির সঙ্গে ভারতীয় শিল্পের আলোচনা করিয়াছিলাম। মাদ্রাজের অনেক শিল্প হারাইয়া গিয়াছে। কিন্তু অনুসন্ধান করিলে এখনও সেগুলি বিদেশে এবং ভিন্ন রাজ্যে পাওয়া যায়। সেই মাদ্রাজী ভদ্রলোক আমাকে ত্রিপুরায় শিল্পাদর্শ সংগ্রহ করিবার জন্য সানুনয়ে অনুরোধ করেন একই গাড়ীতে আমরা রওয়ানা হইয়া একসঙ্গে কলিকাতা পর্য্যন্ত আসিলাম। পথে ৫/৬ ঘন্টাকাল এই ভদ্রলোকের সহিত আনন্দে কাটাইয়াছিলাম। বালি ষ্টেশনে পৌঁছিয়া জনতা দেখিতে পাইলাম। শুনিতে পাইলাম Aeroplane শূন্যমার্গে উড়িতেছে। তাহাই জনতার কারণ। তখন বন্ধুবর মাদ্রাজী ভদ্রলোককে বলিয়াছিলাম–"Aeroplane আমাদের শিল্পাদর্শ চুরি করিয়া নিশ্চয় লইয়া যাইবে, পাখী যেমন দেশদেশান্তরের বৃক্ষের বীজ লইয়া যায়।" তিনি আমার কথা শুনিয়া হাসিয়া অস্থির হইলেন। সে হাসির ফোয়ারা হাবড়া ষ্টেশন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

প্রাচীনকালে ত্রিপুরারাজ্য সাম্রাজ্যের ন্যায় ছিল। আরাকাণ হইতে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্য্যন্ত তাহার বিস্তৃতি ছিল। ত্রিপুরার আর্ট এই সুবিস্তীর্ণ দেশ প্রদেশের আচার ব্যবহার বক্ষে করিয়া লইয়া গিয়াছিল। বর্ম্মার আর্ট বঙ্গদেশের আর্টের সহিত মিল হইয়া গেল। বর্মাদেশ, চীন, লোসাই প্রভৃতি দেশ এবং পূর্ব্ববঙ্গ দেশ স্বীয় স্বীয় কলাবিদ্যা দ্বারা সজ্জিত হইয়া ত্রিপুরপতিকুলের অঙ্কশায়িনী হইয়াছিল। এই সব দেশের শিল্পই আমাদিগকে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত একটা ইতিহাস প্রণয়ন করিয়া দিয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বত্র এই গতি। Queen Victoria জার্ম্মেণ রাজপুত্র বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহে উপহার পাইলেন জার্ম্মেণীর আর্ট। ত্রিপুরার ইতিহাস রাজমালায় রাণীগণকর্তৃক শিল্পের উন্নতি বিষয়ে যাহা লিখিত আছে তাহা নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে জানা যাইবেঃ—

''আচোঙ্গ নৃপতি স্বর্গী হইল যখন,
তার পুত্র খিচোঙ্গ রাজা হইল আপনী।
খিচোঙ্গমা নামে ছিল তাহার রমণী,
বিচিত্র বসন শিক্ষা নির্ম্মায়ে আপনি।" (রাজমালা)

ইহা পৌরাণিক কালের কথা (Prehistoricসংবাদ) ত্রিপুরা রাজ্যে অতি প্রাচীনকাল হইতে বহুতর রাজ্য গ্রাস করিয়াছিল। ত্রিপুরার রাজাগণ ঐ সব দেশ বিদেশের সুন্দরী কন্যাগণকে অঙ্কে তুলিয়া লইয়াছিলেন। ইতিহাসের পূর্বসময়ের (Prehistoric) কথা বলিতেছি, ত্রিপুরার মহারাজা প্রতীত সর্ব্বপ্রথম বঙ্গদেশ(এক্ষণে পূর্ববঙ্গ) জয় করিয়াছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গকুললক্ষ্মী গ্রহণ করেন। সেই দিন ত্রিপুরা এবং বঙ্গদেশের পক্ষে স্মরণীয় দিন। একদিকে হেরম্ব অধিপতি এবং অন্যদিকে ত্রিপুরাধিপতি মিলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—

''সীমানা করিল রাজ্যের সত্য নির্ব্বন্ধিয়া,
রাজত্ব করিব ভোগ সুখেতে বসিয়া।
দুই ভাই কহিলেক একত্র হইয়া,

*বঙ্গদর্শন- পৌষ ১৩১১, নবম সংখ্যা ৪৮২ পৃষ্ঠা-লেখকের রচনা দ্রষ্টব্য।

কখন সীমানা কার না লঙ্ঘিব গিয়া।
দৈবে যদিহ কাক ধবল বর্ণ হয়,
তথাপি প্রতিজ্ঞা দুইর না লঙ্ঘি নিশ্চয়।
তোমা আমা দুইজনের যদি সত্য টলে,
বংশ নাশ হইবেক গ্রাসিবে যে কালে। (রাজমালা ৫৫ পৃষ্ঠা)

কিন্তু বঙ্গসুন্দরী এই দুই রাজার প্রতিজ্ঞা নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।

''তাহারা শুনিয়া বার্ত্তা মন্ত্রণা করিয়া,
পরমা সুন্দরী নারী দিলা পাঠাইয়া। '' (রাজমালা ৫৫ পৃষ্ঠা)

ভেদ জন্মান ব্যতীত উভয় রাজা প্রভাব হইতে রক্ষা পাওয়া দুষ্কর হইবে। তাই বঙ্গদেশবাসী ভেদনীতির আশ্রয় লইলেন। এই বঙ্গসুন্দরী মহারাজা প্রতীতের অঙ্কশায়িনী হইয়া ত্রিপুরায় মহারাণী হইয়াছিলেন। সেই কাল হইতে বঙ্গদেশের শিল্প কলাদেবীও ত্রিপুরার অঙ্কশায়িনী হইল এবং অদ্য পর্য্যন্ত সেই অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় নাই। বিবাহ উৎসব রাজরাজড়ার পক্ষে রাজনৈতিক উৎসব। সেই উৎসবে উভয় জাতির রাজনীতি, সমাজনীতি এবং অর্থনীতির আদান প্রদান হইয়া থাকে। State এ State বহুবিধ রাজনৈতিক উপঢৌকন আদানপ্রদান হয়। তার সঙ্গে সঙ্গে দেশের কলা সর্ব্বাঙ্গে বিভূষিতা করিয়া দিয়া থাকে। ''কলাবউ'' ঘরে আসিলে পরে যেমন জয় জয়কার (জুকার) দিয়া অভ্যর্থনা করা হয়, তখন যেমন উৎসবের বাদ্য বাজে, সময়ে পুত্রবধু যখন রাজরাণী হন তখন Order of Knighthood উভয় দেশে মিশিয়া প্রস্তুত হয় এবং আদানপ্রদান করা হয়। Heraldic উপায়ে সম্মানের তারতম্য সর্ব্বরাজ্যে হইয়া থাকে। Art ই তাহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করে। British রাজ্যে Knight of garter সর্ব্বোচ্চ উপাধি। মেয়েলোকই Garter এই উপাধির মূল কারণ। ইহা ঐতিহাসিকগণ জানেন। আমাদের দেশীয় রাজ্যে রাজরাণীগণের পূজা হইয়া থাকে এবং এ উপলক্ষে তাঁহাদের অলঙ্কার যন্ত্রাদির পূজা হওয়া বিচিত্র নয়।

১৮০৬ খৃঃ ৩০ শে সেপ্টেম্বর তারিখে ত্রিপুরার দেওয়ান রামরতন ত্রিপুরা জাহাঙ্গীর নগরের আপীল আদালতে তামা তুলসী এবং গঙ্গোদক হস্তে লইয়া সাক্ষ্য দিতেছেন—

" Question :-- Was the mother of the four Rajahs Ruttum Manicko, Mahendra Manicko, Dhurmo Manicko and Mokoond Manicko the daughter of a Bengalee or of the Tippera caste?

Answer :--I have heard that Dhurmo Manicko's mother was the daughter of a Benglee, and the remaining three brother's mother was the daughter of Tippera caste : thus I have heard.

(Appendix I of Court deceision) (Page 30).

সেই মোকর্দ্দমার অধিনায়ক মহারাজা রামগঙ্গা মাণিক্য যখন শ্রীহট্ট প্রদেশস্থ বঙ্গকন্যা চন্দ্রতারা দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন বাঙ্গালী শাস্ত্রীয় মতে, তখন তাঁহার সঙ্গে শ্রীহট্ট প্রদেশীয় সূচিকা কলাশিল্প আমাদের দেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রীহট্ট প্রদেশের সূচিকা–কার্য্য একটি সুকুমার শিল্পবিশেষ। মহারাণী চন্দ্রতারা দেবী গরিবের ঘরের মেয়ে ছিলেন, ছিন্ন বস্ত্রদ্বারা তিনি কাঁথা সেলাই করিতেন এবং এই কার্য্যেই তাঁহার সুখ্যাতি ছিল। তিনি সঙ্গে আনিয়াছিলেন দুইজন শিল্প–অভিজ্ঞা সহচরী এবং পাক কার্য্যে নিপুণা। সমজাতের মেয়ে না হইলে বাঙ্গালী ভদ্রলোক কখনও আহার করিতে পারে না। কাজেই সহচরী রন্ধন কার্য্যে ঢুকিয়া রামগঙ্গা মাণিক্যকে রাজভোগের সহিত বাঙ্গালীর প্রিয় খাদ্য মিশাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন। তাহারা হইলেন রান্ধনী। একজন ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ বলরাম দেওয়ানের মাতৃদেবী আর একজন ছিলেন আমার পিতামহী সরস্বতী দেবী। ইনি খর্বাকৃতি এবং রূপবিহীনা। যৌবন লাভের পূর্ব্বেই তাঁহাকে পাত্রস্থ করিতে হইয়াছিল।

আমার পিতামহের বয়স ছিল ৪০ বৎসর। প্রাপ্ত হইলেন কলাবউ সরস্বতী দেবী। দেবী সূচিকার্য্যে এবং ব্রতের আলিপনা চিত্রকর ছিলেন। এই জন্য তিনি লক্ষ্মীপূজা ও মনসা পূজা করিবার জন্য একটি জমিদারী অভয়নগর পাইয়াছিলেন; চন্দ্রতারা দেবীর অনুগ্রহে। পিতামহ ছিলেন সৈনিক বিভাগের সেনাপতি এবং পার্ব্বত্য প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ও আলং নামক কারাগারের অধ্যক্ষ , প্রচুর পায়ী ছিলেন। সরস্বতী দেবী ছিলেন ধার্ম্মিকা, ধর্ম্মকর্ম্মে সদারতা। এই জন্য তিনি দেশের শ্রদ্ধা পাইয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় সূচিকার্য্যে নিপুণা এ রাজ্যে কম ছিল। দুঃখের বিষয় তাঁহার রচিত সূচিকার্য্যের দ্রব্য আমরা দেখিতে পাই নাই। আমার জন্মিবার বহু বৎসর পূর্ব্বে আমাদের গৃহদাহ হয়, সেই সঙ্গে শিল্পাদর্শ অগ্নিসাৎ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার কন্যা সন্ধ্যামালা দেবীর নিকট তাঁহার একখানা সুজনী মাত্র আমরা পাইয়াছিলাম। ১৯১৫ খৃঃ মাতৃদেবী যখন তীর্থদর্শনে বদরিকাশ্রমে গিয়াছিলেন সেই সময়ে এই শিল্পাদর্শ সুজনীখানা তিনি নারায়ণকে দান করিয়া আসেন।

ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত শিল্প দ্রব্যাদি শ্রেণীবিভাগ হইয়া নানা শ্রেণীতে ব্যবহৃত হইত। এখনও অনেক জিনিষ ব্যবহার হইতেছে। রাজার রাণী যাহা ব্যবহার করিতেন, রাজপুত্র বধূগণ তাহা ব্যবহার করিতে পারিতেন না। ভিন্ন আদর্শে তাঁহাদের শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হইত অর্থাৎ শ্রেণীবিভাগানুসারে শিল্পার্দশও বিভিন্ন ছিল। কোন পর্ব্ব উপলক্ষে রাজ—অন্তঃপুরে দেখা যাইত শিল্পাদর্শ অনুসারে রাজরাণী হইতে আরম্ভ করিয়া ঠাকুর শ্রেণীর মহিলাগণের ব্যবহারিক জিনিষ দ্বারাই তাহাদিগকে অনায়াসে চিহ্নিত করা যাইতে পারিত। রাজরাণীর ব্যবহার্য্য সুজনী আসনখানা দেখিলেই অনায়াসে বুঝা যাইত, ইহা রাজমহিষীর আসন। সুজনী ইতঃপূর্বে যাহা ছিল তাহা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, মহারাণী চন্দ্রতারা দেবীর আদর্শ অনুসারে; পূর্ব্বে ছিল পান–কাটা অর্থাৎ পানপাতার আদর্শে প্রস্তুত হইত। ত্রিপুরা রাজ্যের State colour ছিল ধবল। এই ধবল রং এর জিনিষ ব্যবহার করা অন্য কাহারও অধিকার ছিল না। ছত্র, আরাণী, পতাকা প্রভৃতি ধবল রং এর। অদ্য পর্য্যন্ত তাহা বর্ত্তমান আছে। এই পানকাটা আদর্শই রাজার ব্যবহারের জিনিষের আদর্শ। রাণীগণের সূক্ষ্ম মস্‌লিনের উপর সোনালী বাদ্‌লা কারুকার্য্য দ্বারা তাঁহাদের সাড়ী প্রস্তুত হইত এবং ইহাই তাঁহাদের ব্যবহার্য্য ছিল। রাজ–অন্তঃপুরে ইহা প্রস্তুত হইত এবং কারুকার্য্য দ্বারা চিহ্নিত হইত। এখনও অতি প্রাচীন সাড়ী ইত্যাদি দেখিলে মনে হয় রাজরাণীর পোষাক বটে। প্রত্যেক জিনিষের এক একটা Design হইত সিংহ, ব্যাঘ্র, হাতী এবং ঘোড়া কারুকার্য্যময় চিত্রে। সেই রকম রাজপুত্র এবং রাজকন্যার ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ ছিল। রাজার রাণীর জিনিষ পূজিত হইত; এখনও মামুলীভাবে হইয়া থাকে।

আমাদের বাড়ীতে দেখিয়াছি লক্ষ্মী পূজার আলিপনার সূক্ষ্মাদর্শ। আমার জ্যেঠিমা অতি পরিপাটি আলিপনা—শিল্পী ছিলেন। শাশুরীর নিকট হইতে শিক্ষিতা বলিয়া গর্ব্বিতা ছিলেন। আমাদের যে সুজনী আদর্শ ছিল তাহাতে দেখিয়াছি সুজনীয় ৪ কোণায় ৪ টী মৃগ এমনভাবে আলিপনা আঁকা হইত যে ৪ টী মৃগ এক হইয়া মধ্যস্থলে সম্মিলিত হইত এবং একটি মুন্ড যাহা অঙ্কিত হইত তাহা দ্বারা ৪ কোণা হইতে অঙ্কিত ৪টী মৃগকে এমনভাবে দেখা যাইত যে ৪টী মৃগই যেন ৪ কোণ অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। রাজবর্ণ ধবল; কিন্তু আমাদের সেই ধবল রং এর ব্যবহার করা হইত না। এজন্য আবির, ঝাইয়ের কালী, সিন্দুর এবং বিল্বপত্র শুকাইয়া চূর্ণ করিয়া ইহা দ্বারা লক্ষ্মীর আসন ও মনসার আসন প্রস্তুত হইত; তাহা দেখিলে পরে স্বতঃই যেন মনে হয় একখানা গালিচা সদ্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে এবং মনে হয় যেন এক্ষণই দেবী এখানে আসিয়া বসিবেন। আমাদের স্বজাতীয় সমশ্রেণীর ঘরে দেখিয়াছি অনেকে কেমন সুন্দর রচনা করেন। পদ্ম এবং পদ্মের মৃণাল ও পদ্মপত্র এমন Design এ পরিণত করিতে পারিতেন যেন ইহাও একখানা পদ্মের আসন। কাহারও কাহারও বাড়ীতে ৪টি ঘোড়া ঐ ৪ টি মৃগের ন্যায় অঙ্কিত হইত। ঠিক যেন মনে হয় একখানা আসন প্রস্তুত হইয়াছে; আমি তাহা দেখিয়া বলিতাম ''ঘোটকাসন''। এইক্ষণে আমরা ঐসব আদর্শ —চিত্র প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি। মামুলী আসন অঙ্কিত হইয়া বর্ত্তমানে পূজাকার্য্য সমাপন হয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরার শিল্পকলারও হ্রাস হইয়া গিয়াছে। কোন কোন বাড়ীতে দেখিয়াছিলাম পদ্ম আঁকিয়া নানা বর্ণের গুঁড়িদ্বারা সুসজ্জিত হইত এবং মধ্যস্থানে ধান্যদ্বারা এমন সাজ প্রস্তুত হইত, দেখিলে মনে হইত যেন একটি সূর্যমুখীফুল দেবীর আসনের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। শ্রীযুক্ত বাবু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ফরমাইস মত আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও একখানা আদর্শ সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

প্রাচীনাদের মুখে শুনিয়াছি যে তাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অভাবে যেমন স্বভাব নষ্ট হয়, তেমন আদর্শও বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু সেকালের আদর্শ আমরা আর পাইব না বলিয়া মনে করি। ত্রিপুরমহিলাগণ দীর্ঘ অবসর পাইতেন, তাঁহারা স্বহস্তে কারুকার্য্য করিয়া সময় কাটাইতেন, সহচরীগণ সাহায্য করিতেন, তখন মনে হয় রবিবাবুর কবিতাঃ—

''হারিয়ে গেছে সে সব অব্দ,
ইতিবৃত্ত আছে স্তব্ধ,
গেছে যদি, আপদ গেছে,
মিথ্যা কোলাহল।
হায় রে গেল সঙ্গে তারি
সেদিনের সেই পৌরনারী নিপুণিকা চতুরিকা
মালবিকার দল !" (ক্ষণিক)

কিন্তু কবীন্দ্রের এই কবি উক্তিতে আমার প্রাণ শান্ত হইবার নহে। ইতিবৃত্ত শিল্পকলা দ্বারা সুশোভিত হইয়া আবার ফিরিয়া আসিবে। আবার আমাদের সুজনী কাঁথা এবং আলিপনার সুক্ষ্ম কার্য্য অবশ্য ফিরিয়া আসিবে। আমরা আবার আমাদের দেবদেবীর অর্থাৎ রাজারাণীর পূজা করিব—আমাদের কলাদেবী আবার গাত্রোত্থান করিবেন। কোন দিন তাঁহাদের গাঢ়নিদ্রা ভঙ্গ হইবে। আমাদের প্রাচীন রাজ্যের প্রাচীন আদর্শ আবার আমরা ফিরিয়া পাইব কখন এবং কোন দিন, আমি দৈবজ্ঞ নহি, বলিতে পারি না। অদ্য পৃথিবীর পার্শ্ব পরিবর্ত্ত ন হইয়াছে। আমাদের কলাদেবী অবশ্য গাত্রোত্থান করিবেন। এই স্বপ্ন সত্য হইবে, এই শিল্প আদর্শ একদিন গাত্রোত্থান করিবে। আমি যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছি তাহাতে এই জানিতে পারিয়াছি "Art never dies but slumbers''পর্ব্বতাঞ্চলে যাহাদের বংশ হইতে সতীদাহ হইয়াছিল সেই সব বংশে এখনও তল্লাস করিলে অনেক শিল্পাদর্শ পাওয়া যাইতে পারে। কারণ ঁসতীর বংশের নাম রক্ষার্থে অনেক সুজনী ও আলিপনা দ্বারা সেই স্মৃতিকে রক্ষা করিতেছে, ইহা আমি জানিতে পারিয়াছি।

ঁরামগঙ্গা মাণিক্য দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন নাই। বয়স ছিল ৩৭ বৎসর, যুবক বলিলেও হয়। তাঁহার চরিত্র সম্পূর্ণ নির্ম্মল ছিল। তিনি পারস্য ভাষা এবং ভূমি পরিমাণ বিদ্যায় সুশিক্ষিত ছিলেন; তিনি শাস্ত্র ও মল্লযুদ্ধে বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। মহারাজ রামগঙ্গা বৃন্দাবনে একটি কুঞ্জ নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে রাসবিহারী দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি এই দেবতার সেবা পূজার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য বামুটিয়া পরগণা দেবোত্তর স্বরূপ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বীয় গুরু ও গুরুপত্নীর নামানুসারে ভুবনমোহন ওকিশোরী দেবী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া, আগরতলায় স্থাপন করেন।

(কৈলাশচন্দ্র সিংহ কৃত রাজমালা ১৫৮ পৃঃ)

তিনি বহুদার পরিগ্রহ করিবেন না এই প্রতিজ্ঞা করিয়া বাঙ্গালী কন্যাকে গৌরীর ন্যায় দান পাইয়াছিলেন। চন্দ্রতারা দেবীর নামে যে মুদ্রা প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা আমাদের ঘরে আছে এবং কলিকাতা Museum এ আছে ।

লাম্প্রা অর্থ কি তাহা লিখিতেছি। ত্রিপুরা ভাষায় ''লামা" অর্থ রাস্তা আর প্রা অর্থ সুগম অথবা বিপদশূন্য হউক। যেমন ''খুঞ্জু প্রা" একটি গন্ধযুক্ত বৃক্ষ; যাহার পাতা যুবতীগণ বিশেষতঃ বিবাহিত যুবতীগণ ফুলগুচ্ছ সহ কর্ণে ধারণ করে। ত্রিপুরা ভাষায় খুঞ্জু অর্থ কান প্রা অর্থ সুগম অর্থাৎ কর্ণমূলে কোন সংক্রামক ব্যারাম ঢুকিতে পারে না। কারণ এই খুঞ্জু প্রা বৃক্ষ Equiliptus বৃক্ষের ন্যায় antiseptic. ন্যায় প্রত্যেক যুবক স্বামী প্রত্যহ ইহার পাতা জোগাইয়া থাকে, ইহা স্বামীর কর্ত্তব্য; স্বামী ভিন্ন অন্যে দিতে পারে না।

মণিপুর চিত্র ।

রসিকতা ও রসের কথা।

মণিপুর আমাদের কুটুম্বরাজ্য। বহুদিন যাবত এ রাজ্য এবং রাজদর্শনের এবং সেই রাজ্যের কাহিনী চিত্রিত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিব এই ইচ্ছাও ছিল। মণিপুর বলিতে গেলে, আমাদের কুটুম্বিতার তীর্থস্থান। কাজেই তীর্থে যাইতে গেলে,—

"রাজেন্দ্র সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে।"

কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ দীন বেশে মণিপুরে প্রবেশ করি নাই; কারণ আমি গিয়াছিলাম রাজপারিষদরূপে আমাদের মহারাজের সহিত। মণিপুর–অধিপতি একবার রাজ অতিথিরূপে আমাদের রাজ্যে পদার্পণ করিয়াছিলেন। সে স্বর্গীয় রাধাকিশোর মাণিক্যের আমলে। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় অতিথির প্রাপ্য প্রতিদর্শন বর্ত্তমান মহারাজা মণিপুর রাজ্যে যাইয়া আদায় করিয়াছিলেন। এ উপলক্ষ্যে মণিপুরে কি বৃহৎ ব্যাপার সংঘঠিত হইয়াছিল, সে রাজকীয় আড়ম্বর সম্বন্ধে উল্লেখ করিবার কোন দরকার নাই; কারণ, আমি চিত্রকর। চিত্রই সাহিত্যিকগণের নিকট দিবার ইচ্ছা।

মণিপুর রাজ্যের কাহিনী এবং অনেক কুটুম্বের নিকট মণিপুরের যে প্রশংসা শুনিয়াছিলাম সে কাহিনী যেন স্বপ্নরাজ্যের কাহিনীর মত বোধ হইত, তাহা যেন একটা Happy Valley র চিত্রই হৃদয়পটে জাগিয়া উঠিত। এখন মণিপুরে–সেই সুখময় সাগরও নাই, কাহিনীও নাই। এখন মণিপুর দেখিলে মনে হয় ;

"সে সুখ সাগর দৈবে শুকাইল।"

মণিপুর ইমফাল নদীর তীরে অবস্থিত। এই ক্ষুদ্রায়তন নদী দেখিয়া আমার মনে হইত,—

"যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী ?"

সে সব দুঃখের কাহিনী বলিবার এখন অবকাশ নাই। অতীতের গর্ভে মণিপুরের কাহিনী লুপ্ত হইয়াছে। আছে মাত্র স্মৃতি। সে স্মৃতিও কালে বিস্মৃতির অতল গর্ভে বিলীন হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মণিপুরে গিয়া একটি মাত্র কার্য্য আমার ছিল;—সে রাজ্যের কাহিনীর সত্যতা অনুসন্ধান করা। মণিপুর দুর্ঘটনার পর যে সব কাহিনীলুপ্ত হইয়াছে, তাহার যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহাই খুঁজিয়া বাহির করা।

মণিপুরে আছে দুর্গপ্রাচীর মধ্যে রাজবাড়ী। বর্ত্তমান রাজবাড়ী অন্যত্র প্রস্তুত হইয়াছে। রাজপ্রাসাদ বিলোপ পাইয়াছে কিন্তু সেই দুর্গ এক্ষণে (১৯১২ সালে) ইংরেজ সৈন্যাবাস, অস্ত্রাগার প্রভৃতিতে পরিণত হইয়াছে। দুর্গমধ্যস্থ গোবিন্দজীর দেবায়তনে অর্সেনেলের কাজ হইতেছে এবং তথায় ইংরেজ সৈন্য পাহাড়া দিতেছে। মণিপুরীগণ গোবিন্দজীউকে সে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেয় নাই এবং তথায় আর দেবকার্য্য সম্পাদিত হয় নাই। রাজবাড়ী তোপের গুলিতে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। সেই

রাজবাড়ীর পতিত ভিটা দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, এই মণিপুরীরাজাগণের বিলাস আরামের কিরূপ প্রচুর বন্দোবস্ত ছিল। ইমফাল নদী দুর্গের উত্তরদিক হইতে এঁকে—বেঁধে ঘুরিয়া দক্ষিণবাহিনী হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বকালে দুর্গের পরিখা ইমফাল নদীর জলে পরিপূর্ণ থাকিত এবং তথায় মণিপুরীদের রকমবেরকমের জলকেলী হইত। ইহাই সেন মণিপুরের প্রধান আমোদ —প্রমোদ ছিল। দুর্গের উপরিভাগে রাজার বসিবার স্থান এবং জলকেলী দেখিবার একটী সুদৃশ্য বেদিকা। যখন ইচ্ছা হইত অতি অল্প সময় মধ্যে ইমফাল নদী বাঁধিয়া দিয়া পরিখাপূর্ণ হইলে দুর্গ নিরাপদ হইত এবং আবশ্যক হইলে নৌকা দৌড়ের আমোদ হইত। সমস্ত পরিখা পদ্মবন—সুশোভিত ছিল। এই পদ্মবনের শোভা এখন নাই। সে আমোদ প্রমোদও এখন নাই। কিন্তু মনশ্চক্ষে দেখিতে গেলে সেই চিত্র মানসনয়নে প্রতিফলিত হয়; মণিপুর বঙ্গের মধ্যে দ্বিতীয় নগর। আমরা গবর্ণমেন্ট রিপোর্টে একথা শুনিয়াছি।

মণিপুরীগণ প্রচুর আমোদী,—ইহা আমি জানি। মণিপুরের পূর্ব্বকাহিনী শুনিয়া এবং বর্ত্তমান সময়ে তাহার স্মৃতিচিহ্ন দেখিয়া ইহা মনে হয় যে, এই Happy Valley বাস্তবিকই আনন্দ—কানন ছিল। মণিপুরে যাহা দেখিলাম এবং যাহা শুনিলাম তাহাতে এজাতি যে প্রচুর আমোদী তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। মণিপুর স্ত্রী স্বাধীনতার দেশ। পথে—ঘাটে—বাজারে মণিপুরবাসিনীদের একচেটিয়া গতিবিধি—তাহারা যেমন রসিকা, তেমনি সরস আমোদিনী। মণিপুরে কোন আমোদপ্রমোদই স্ত্রীলোক ছাড়া হইবার জো নাই। পদে পদে রসিকতা ইহাদের আয়ত্ত্বাধীন। মণিপুরের বাজারের নাম 'সোনার বাজার' *। সেই বাজারে গেলে, দেখা যায় কে যেন গোলাপ ছড়াইয়া দিয়াছে। এ বাজারে স্ত্রীলোকই গ্রাহক, স্ত্রীলোকই বিক্রেতা। এই বাজারে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। এমন কি, যদি কোনক্রমে পুরুষ তথা উপস্থিত হয়, তবে তাহার অদৃষ্টে প্রচুর সরস লাঞ্ছনা—অভিসম্পাত লাভ সুনিশ্চিত। আমাদের সঙ্গী কোন এক কুমারবংশীয় সন্তান এই বাজার দেখিবার জন্য গিয়াছিলেন,—বেচারীকে অপদস্থ হইতে হইয়াছিল। ললনাসুলভ রসিকতায় এবং কটাক্ষপাতে তাঁহার প্রায় মুণ্ডপাত হইয়াছিল। আমরা মণিপুরী ভাষা জানি, কাজেই রসিকতা করিতে মণিপুর—বাসিনীগণ ত্রুটি করেন নাই। একটি মণিপুরী স্ত্রীলোক বাজারে পুরুষ আগমন দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, ''হে সুন্দর পুরুষ! তুমি আমার ছেলেকে কোলে কর আর তুমি আমার বেসাতির ব্যবসা কর।'' আর আমাদের সে বাজারে দাঁড়াইতে হয় নাই কিন্তু ছুটিয়া পলাইয়া আসিবারও জো ছিল না, কারণ, সুন্দরীগণ আমাদের পথ আগলাইয়া সমস্ত বাজারময় তামাসা করিতে করিতে হয়রাণ করিয়াছিল। আমরা যোড়হাতে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া বাহির হইলাম। এই বাজারে সমস্ত রকম জিনিষই বিক্রয় হয়। মাছ পর্য্যন্ত বিক্রী করিতে মণিপুরী হিন্দুরমণীগণ পশ্চাৎপদ নহেন। ব্যবসা মাত্রই ইহারা করিতে পারে—কারণ, মণিপুরবাসিনী জানে ''বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী, '' কিন্তু আমরা জানি চাকুরীতে লক্ষ্মী বাস করিয়া থাকে। মণিপুরে প্রচুর ধান হইয়া থাকে, সস্তাও তেমনি। সে বছর চাউল চৌদ্দ আনা করিয়া মণ বিক্রী হইত ইহা আমি দেখিয়া আসিয়াছি। কারণ, এই Happy Valley সমস্তই ধান্যক্ষেত্র এবং এই ধান্য অন্যত্র রপ্তানি হইবার উপায় নাই। কারণ, রেলওয়ে ষ্টেশন ১৩৭ মাইল দূরে। মণিপুরীগণ জানেন ''তদৰ্দ্ধং কৃষিকার্য্যে'' লক্ষ্মী বাস করেন। কাজেই কৃষিকার্য্য এখানে প্রধান কার্য্য।

সকালে মণিপুরীগণ কৃষিক্ষেত্রে রীতিমত পরিশ্রম করে কিন্তু বৈকালে ইহারা সুসজ্জিত হইয়া নগর ভ্রমণে অথবা আমোদ প্রমোদের স্থানে গতিবিধি করে। মাথায় উষ্ণীষ, পরণে ত্রিকচ্ছ বসন এবং একখানা ধপধপে সাদা চাদরে শরীর ঢাকা। প্রায় সমস্ত মণিপুরী জাতির এই পোষাক।পলো খেলা হইতেছে। ১০,০০০ মণিপুরী স্ত্রী পুরুষ পলো ফিল্ডের চারিদিকে আড্ডা

---

*''সোনার বাজার'' রাত্রি আট ঘটিকা পর্য্যন্ত কেনাবেচা শেষ করিয়া ভঙ্গ হইয়া থাকে। সন্ধ্যা আগত হইবামাত্র 'সোনার বাজার' দীপমালায় আলোকিত হইয়া হাসিতে থাকে। ইহাকে যদিও দীপমালা বলা যাইতে পারে না; কেন না মণিপুরে পাইন বৃক্ষ প্রচুর, এই কাঁচা পাইন —টুকরা অগ্নি সংযোগে জ্বালাইয়া কেনাবেচা চলিয়া থাকে। দূর হইতে দেখিতে গেলে মনে হয়, আলেয়ার আগুনের মত, এই আলোকসমষ্টি বাজারময় ঘুরিতেছে। সে কি চমৎকার দৃশ্য! যেন শত শত জোনাকি ঘুরিয়া ফিরিয়া নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে—সে দৃশ্য বড় মনোরম। যখন বাজার ভাঙ্গে তখন রাস্তাগুলি দীপমালায় আলোকে আলোকিত হয়, তখন রাস্তার সে দৃশ্য দেখিলে মনে হয়, রাস্তাময় কিন্নরীর ছড়াছড়ি পড়িয়া গিয়াছে।

করিয়া বসিয়াছে এবং বাজি রাখিতেছে, কোন দল খেলা জিতিবে। এত জনতার মধ্যে টু শব্দটী নাই। কেবলমাত্র খেলার রকম সকম দেখিয়া এক প্রকার তাহাদের উচ্চকণ্ঠে হাস্যধ্বনি শোনা যায়। আর দলবিশেষ জিতিলে Betting লইয়া তোলপাড় উপস্থিত হয়। রাস্তাঘাটে মণিপুরীদের একে অন্যকে অভিবাদন একটা বৃহৎ ব্যাপার। ইহারা জাপানীদের মত প্রচুর আমোদী এবং সাদর অভিবাদন ইহাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। স্ত্রীলোক বলিয়া ইতর বিশেষ নাই। অভিবাদন করাই যেন তাহাদের আর এক রকমের আমোদ। আমি দেখিয়াছি একটি অশীতি বৎসরের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দণ্ডবৎ পাইতে পাইতে হয়রান হইয়া পড়িয়াছেন তবুও বৃদ্ধ রসিকতা ছাড়েন নাই;—একটি স্ত্রীলোক কতকগুলি সন্তান সন্ততি লইয়া চলিয়াছে; বৃদ্ধকে অভিবাদন করিল। বৃদ্ধ সহাস্য বদনে বলিয়া বসিলেন, ''তোমাকে দেখিলে আমার পেঁপে গাছের কথা মনে পড়ে। অর্থাৎ সন্তানগুলি যেন বৃক্ষটিকে বেড়িয়া আছে।'' আর স্ত্রীমহল হইলে উচ্চ হাসি উত্থিত হইল। যুবতী পুষ্পাভরণে সজ্জিত হইয়া রাস্তা দিয়া চলিয়াছে। যুবকগণ আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে ''হে সুন্দরী, তোমার গায়ে মেলা মৌমাছি বসিয়াছে; ফুলের গন্ধে।'' যুবতী উত্তর করিল—'' এই মৌমাছি হুল ফুটায় না তোমার ভয় নাই।'' এরূপে রাস্তাময় কেবলই হাসির ছড়াছড়ি পড়িয়া যায়; ইহা মণিপুরে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। একটি বিষয় লক্ষ্য করিয়া আমি অবাক হইয়া গিয়াছি। প্রত্যেক আমোদপ্রমোদের জনতার মধ্যে স্ত্রীলোকের জনতাই অধিক। আমোদপ্রমোদে যোগদান করিতে গেলে অশীতি বৎসরের বৃদ্ধাও আসিবে এবং কোলের দুগ্ধপোষ্যটিও মাতৃপৃষ্ঠে চড়িয়া সমাগত হয়। মণিপুরীগণ জাপানীদের মত শিশুদের পৃষ্ঠে বাঁধিয়া লইয়া চলাফেরা করে কিন্তু কোন শিশুই কাঁদিয়া উৎপাত সৃষ্টি করে না। বিষয়টা আমার অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা হইল। শিশুর ক্রন্দনে কলিকাতায় থিয়েটার দেখা যেমন দায় হইয়া পরে, মণিপুরে এই উৎপাত নাই কেন? এই শিশুরা কি কাঁদিতেও জানে না? জানে কিন্তু ''অপারগ''। অনুসন্ধানে দেখিতে পাইলাম তাহারা সঙ্কটে পড়িয়াছে। মা তাহাদের মুখের মধ্যে গুড় মাখান কাঠের গুলি পুরিয়া দিয়া সূতার দ্বারা আবদ্ধ করিয়া কানের উপর দিয়া বাঁধিয়া দিয়াছে। চীৎকার করা তাহাদের অধিকার–মাত্রও নাই। মা যখন দুগ্ধভার সহিতে না পারেন তখন শিশুটিকে পিঠ হইতে নামাইয়া প্রমোশন দিয়া কোলে আনিয়া পীযূষপুরিত স্তন শিশুর মুখে পুরিয়া দেন। শিশু পীযূষ খাইয়া তৃপ্ত হইতেছে এবং মা উপস্থিত দৃশ্য দেখিয়া আমোদে আটখানা হইয়া পড়িয়াছেন। ইহা একটি দৃশ্য বটে। আমি ভরসা করি, কলিকাতা থিয়েটার কোম্পানীগুলি এ ব্যবস্থা দর্শকমন্ডলীকে গ্রহণ করিবার জন্য বিজ্ঞাপন দিলে, ভবিষ্যতে আর দর্শক এবং অভিনেতার কান ঝালাপালা হইবে না। Flirtation স্ত্রী—স্বাধীন দেশে প্রচলিত আছে, ইহার বাঙ্গালা কি হইতে পারে, আমি জানি না। বাঙ্গলার অবরোধ প্রথা থাকার দরুণ সেই রসিকতা অসম্ভব হইয়াছে। কিন্তু মণিপুরে রসিকতার সহিত এবং রসের কথার কাটাকাটি খুব বেশী রকমে প্রচলিত আছে। ইহার ফলে Love Marriage ও Divorce অনেক ক্ষেত্রে ঘটিয়া থাকে দেখা যায়। মণিপুরেও বাদ পরে নাই। তবে রসিক দেশের রসিকতা দেখিয়া রসজ্ঞ ব্যক্তগণই সরস হইয়া উঠে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। মণিপুরী পুরুষগণ মাথায় উষ্ণীষ পরিয়া থাকে এবং নিজহাতে রংকরা কাপড়ে উষ্ণীষ আদরের সহিত পরিধান করে। রাস্তায় শুনিতে পাইলাম যুবতী যুবককে ফরমাইস করিতেছে, ''তোমার পাগড়ীর ন্যায় আমার সাড়ী রঙ্গাইয়া দাও না।'' তখন স্ত্রী মহলে হাসির ফোয়ারা ছুটিল। আবার তখন যুবক উত্তর করিল ''আমার গোলাপী রং নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, কারণ, অন্তর চাদর তাহা দিয়া রঙ্গাইয়া ফেলিয়াছি।'' তখন যুবক—মহলে তান্ডব নৃত্য আরম্ভ হইল। এই প্রকারে রসিকতা ও রসের কথায় মণিপুর সদা মুখরিত, ওদেশ আনন্দের দেশ, নির্ম্মল রস—মন্দাকিনী অন্তরে অন্তরে তথায় প্রবাহিত। মণিপুরের ভূতপূর্ব Political Agent Major General Sir James Johnstone, K.C.S.I. ১৮৭৪ সালে তাঁহার প্রণীত "My Experiences in Manipur" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

" Close to the gateway is the place where the grand-stand is erected, from which the Rajah and his relations view the boat-races on the Palace moat. I say 'view', as in old age a Rajah sits there all the time; but in the prime of life he takes part in these races, steering one of the boats himself. These boat races generally take place in september when the moat is full, and are the great event of the year. Everyone turns out to see them, the Ranees and other female relations

being on the opposite side of the moat, for in Manipur there is no concealment of women,while the side next to the road is thronged with spectators. The boatmen have a handsome dress peculiar to the occasion, and the whole scene is highly interesting. The boats are canoes hewn out of single tree of great size, and are decorated with colour and carving''.

ভাবার্থ—রাজপ্রাসাদের প্রবেশদ্বার—সন্নিকটেই রম্যমঞ্চ, তথা হইতে রাজা ও রাজপরিবারবর্গ দুর্গপরিখায় নৌকাদৌড় দেখিতেন, সেপ্টেম্বর মাসে পরিখা পূর্ণসলিলা—তখন নৌকাদৌড়ের ধুম পড়িয়া যাইত। ডোঙ্গা নৌকাগুলি বড় বড় বৃক্ষ কুঁদিয়া প্রস্তুত; বিবিধ চিত্র—বিচিত্রে শোভিত। রাজা স্বয়ং নৌবিহারে মত্ত হইতেন, পরিখার উভয় পার্শ্বে জনতা, স্ত্রী পুরুষের সমাবেশ সে এক অপূর্ব দৃশ্য !

হায়, মণিপুরের এই চমৎকার দৃশ্য এখন অদৃশ্য হইয়াছে। কালের কি বিচিত্র গতি !

অতিথি —সৎকার

মণিপুরে অতিথি—সৎকার এক শোভনীয় ব্যাপার। অতিথি—সৎকার ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে যাহা দেখিয়াছি তাহার সঙ্গে ইহার তুলনাই হয় না। আজকাল আমরা অতিথি–সৎকারার্থে "Garden party, Evening party অথবা "Dinner party, প্রভৃতি party র উদ্যোগ করিয়া থাকি, কিন্তু Happy valley তে অতিথি—সৎকারের জন্য 'কীর্ত্তন' দিয়া থাকে। সেই কীর্ত্তন আমাদের যাত্রা কীর্ত্তন অথবা বাউল–কীর্ত্তন প্রভৃতি বিরাট আয়োজন নহে। আমি এ বিষয়ে একটি কীর্ত্তনের কথা উল্লেখ করিব। জনৈক মণিপুরী ব্রাহ্মণ আমার সহধর্ম্মিনীর সহিত তাঁহার কন্যার 'সইয়ালা' ঘটাইয়া দিয়াছিলেন, তখন এই ব্রাহ্মণ আগরতলাবাসী ছিলেন, ঘটনাক্রমে মণিপুরে আসিয়া তিনি দুই মাইল দূরে বাস করেন। এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে আমার দর্শন করিবার ইচ্ছা বলবতী হয় এবং আমার দর্শনাভিলাষ তাঁহার কর্ণগোচর হয়। আমি শকটারোহণে এই দুই মাইল পথ যাইয়া দেখি তাঁহার বাটীতে লোকারণ্য। বাটীর প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইবামাত্র আমাকে একটি চৌকীতে বসাইয়া আমার পাদপ্রক্ষালণের ব্যবস্থা হইল। ইহাকে পাদ্যঅর্ঘ বলা যাইতে পারে। পাদুকা ত্যাগপূর্বক এই স্বাগত অভিবাদন গ্রহণ করিয়া আমি নগ্ন পদে একটি নাটমন্দির—ঘরে প্রবেশ করিলাম। এখানে দেখিতে পাইলাম বহুতর লোকের সমাগম হইয়াছে। ব্যাপারখানা কি জানিতে অভিলাষ হইবামাত্র কতকগুলি মণিপুরী লোক অগ্রসর হইয়া আমাকে ''বার্ত্তন''* করিয়া বসিল। এই ''বার্ত্তন'' করার প্রথা মণিপুরীদের মধ্যে প্রচলিত। একখানা থালে পান সুপারী, পুষ্পমালা এবং চন্দন লইয়া আমার নিকট নতশিরে উপস্থিত হইল। ইহাই অতিথির স্বাগত অভ্যর্থনা। চন্দনের টীকা দান করিয়া, পুষ্পমালা গলায় ঝুলাইয়া তাম্বুল দ্বারা আমাকে স্বাগত করিল।

আমি দীনবেশে কুটুম্বসমাগমে গিয়াছিলাম, এই বিরাট আয়োজন করার কোন প্রয়োজন ছিল না এবং আমি আশাও করি নাই। আমি রাজপারিষদরূপে এ বাড়ীতে কখনও উপস্থিত হই নাই এবং ইহা আমার উদ্দেশ্যও নয়; তবে এ রাজসিক আয়োজন কেন; বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কুটুম্বকে জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলাম তিনিও আমাকে কুটুম্ব ব্যতীত রাজপারিষদরূপে গ্রহণ করেন নাই। দুরদেশাগত কুটুম্বকে যে উপায়ে তাঁহারা অভ্যর্থনা করেন এই অভ্যর্থনাও সেইরূপ। মণিপুরের প্রথা,—এমন কি পররাজ্যেও মণিপুরবাসীগণ এই প্রথাই অনুসরণ করিয়া থাকেন। অতিথিকে এবং কুটুম্বকে তাঁহারা দেবতা বলিয়া জানেন। প্রত্যেক মণিপুরী পল্লীতে একটি বৃহৎ চালাঘর নাটমন্দির নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা গ্রামবাসীর সাধারণ সম্পত্তি। এখানেই তাহাদের আমোদ—প্রমোদ অভ্যর্থনা এবং বিবাহাদি সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন হয়। গ্রাম সম্পর্কে উপস্থিত অতিথি, সকলেরই সম্পর্কে সম্পর্কান্বিত হইয়া পড়ে; কাজেই গ্রামের একটা আনন্দোৎসব সম্পন্ন হয়। প্রত্যেক গ্রামে নির্ব্বাচন করিয়া এই অতিথি অভ্যর্থনার

*''বার্ত্তন'' আর ত্রিপুরার ''পান দেখান'' প্রায় একই জিনিষ। ''বার্ত্তন'' খুব সম্ভব বার্ত্তা শব্দের অপভ্রংশ, ইহা ''নিমন্ত্রণ'' করা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অভ্যাগতকে যে পান দেওয়া হয় তাহাকে ''পান দিবা'' ''পানদান'' বলা হয়। পাদ্যঅর্ঘ্য প্রথমেই দেওয়া হয় তৎপর আসন গ্রহণ করার পর ''লেই চন্দন'' অর্থাৎ পুষ্পচন্দন দান ও তাম্বুল দান দ্বারা অভ্যাগতের অভ্যর্থনা করার নিয়ম। ইহা ছোটবড় সকল ব্যাপারেই নিমন্ত্রিত অভ্যাগত ব্যক্তিকে করা হয়। ইহা ভিন্ন অভ্যর্থনার অঙ্গ পূর্ণ হয় না।

লোক ঠিক করা যায়,—অতিথি সৎকার ব্রতে কে কে কোন কাজ করিবে। মণিপুরে জাত্যভিমান নাই। উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার পর্য্যন্ত নির্ব্বাচিত ব্যক্তি করিয়া থাকে। আমার আগমনে গ্রামের লোকেরা এই সম্মিলন—সভার আয়োজন করিয়াছেন। ইহাতে খরচের বিড়ম্বনা নাই, গ্রামের লোক সকলের ঘর হইতে যে যে রকম সাহায্য করিতে পারেন তাহাই সংগৃহীত হইয়াছে। খোল করতাল লইয়া বাদকবৃন্দ আসরে নামিয়া বাদ্য বাজাইতেছেন আর গায়কগণ জয়দেবের পদাবলী গাহিয়া যাইতেছেন। এই জয়দেবের পদাবলী মণিপুরী রাগিণীতে গীত হইতেছে এবং মাঝে মাঝে এক একজন লোক উঠিয়া গায়কগণের মধ্যে যিনি উৎকৃষ্ট গান গাহিতে পারিতেছেন তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্ব্বক তাম্বুল দানে সম্মানিত করিতেছেন। ইহাতে বালক বৃদ্ধ ভেদ নাই। ইহা গায়কের প্রাপ্য সম্মান। বয়সের সঙ্গে তাহার তারতম্য হয় না। এ প্রথাও আমার নিকট বড় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। কোমল কলাপাতা এমন বিচিত্র রকমে কাটা হইয়াছে যে তাহা দেখিলে মণিপুরের শিল্পচাতুর্য্যের তারিফ না করিয়া উপায় নাই। সে পাতায় তাম্বুল বিতরিত হইতেছিল। যখন কীর্ত্তন শেষ হইল, তখন পরস্পর কোলাকুলি এবং অতিথির নিকট আসিয়া আবার বার্ত্তন করিয়া সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। তারপর জলযোগ, তাহাতেও আড়ম্বরশূন্য। খইয়ের মোয়া, তিলের পিষ্টক এবং গ্রামের ফল দ্বারা অতিথির ভোগ দিলেন এবং সকলে তাহা আস্বাদন করিয়া লইলেন। ইহা দেখিয়া Happy valley র অতিথি—সৎকারের মাহাত্ম্য অনুভব করিলাম। আমি দেখিতে পাইলাম, আড়ম্বরশূন্য ব্যাপার অথচ আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ একটি উৎসব। গ্রামে গ্রামে এই প্রথা আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। প্রত্যেক গ্রামে দূরাগত অতিথিকে আকর্ষণ করিয়া অতি নিকটআত্মীয় করিয়া লইতেছেন। স্ত্রীলোক এবং পুরুষ সমাগমে এই অতিথি—সৎকার পূর্ণ হইয়াছিল এবং আমিও আতিথ্যে পরম প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম, আমি কুটুম্বসমাগমে গিয়াছিলাম কিন্তু গ্রামশুদ্ধ লোক আমার সম্পর্কান্বিত হইয়া পড়িল। তারপর মহিলামহলের রসিকতা, পুরুষ মহলের রসের কথা আমাকে রসস্থ করিয়া দিয়াছিল। মেয়ে পুরুষ মিলিয়া আমাকে এবং আমার পরিবারস্থ লোকদিগকে বয়সের যোগ্যতানুসারে সম্পর্ক পাতাইয়া ছিল এবং এ উপলক্ষে রসিকতা প্রচুর হইয়াছিল। এই কুটুম্বসমাগমে যে কয় ঘন্টা বিমল আনন্দে কাটাইয়াছি, তেমন সুখ আমার জীবনে কখনও উপভোগ করি নাই।

দাসত্ব—প্রথা

মণিপুর রাজ্যের সহিত আমাদের রাজ্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে কেবল কুটুম্বিতা—সূত্রে নহে, রাজ্যের অবস্থা দৃষ্টে এককে অন্যের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

মণিপুর রাজ্যে 'লালুপ' বা বাহিরের লোকে যাহাকে দাসত্বপ্রথা বলে, সেই প্রথা বর্ত্তমান ছিল এবং ইহা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও ছিল। ''দাসত্বপ্রথার' ন্যায় এত জঘন্য প্রথাও কি এখনও বৃটীশ—শাসিত ভারত ভিতরে বর্ত্তমান থাকিতে পারে? কখনই না। এই 'লালুপ' প্রথার অর্থ কি এবং ইহা কিভাবে ব্যবহৃত হইত তাহা যাঁহারা জানেন তাঁহারা ইহাকে কখনও দাসত্ব প্রথা বলিতে পারেন না। ইংরেজ Political Agent সহৃদয়তার সহিত দেশীয় রাজ্যের প্রথাগুলি যখন দেখিতে পান তখন তিনি দেবতার মত কার্য্য করিতে পারেন। মণিপুরের একজন Political Agent লিখিয়াছেন ঃ—

"The Manipuri paid very little revenue in money, and none in direct taxes. The land all belonged to the Raja, and every holding paid a small quantity of rice each year. The chief payment was in personal service.This system known by the name of "Lallop'', and by so often miscalled, "forced labour'', was much the same as formerly existed in Assam under its "Ahom Rajahs''. [My Experience in Manipur P. 113 by Colonel Johnstone.]

ভাবার্থ ঃ—মণিপুরে খাজানা টাকা খুব কমই আদায় হইত, ট্যাক্সত ছিলই না। ভূমি সমস্ত রাজার অধীনে,—প্রজারা প্রতিবৎসর সামান্য কিছু শস্য বিনিময়ে তাহা ভোগদখল করিত। অধিকাংশ স্থলেই প্রজারা খাজানা না দিয়া শরীর খাটাইয়া মালিকের পাওনা পরিশোধ করিত, মণিপুরে এই প্রথার নাম ''লালুপ''। লালুপকে কিছুতেই দাসত্বপ্রথা বলা যায় না। আহম রাজার রাজত্বকালে আসামেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল।

ঘৃণিত দাসত্বপ্রথা বলিতে যাহা,—নামান্তরেও হইলেও তাহার বিষে বরং আসাম জর্জরিত হইয়াছে এই সভ্য যুগেই দেশীয় রাজার হাতে নহে,—স্বার্থপর বৈদেশিক চা—করের নির্ম্মম পীড়নে; অন্যত্রও এ দৃষ্টান্তের অভাব ছিল না,—আফ্রিকা, ফিজি আজও দাসত্বের জঘন্য অত্যাচারের হস্ত হইতে সম্পূর্ণ রক্ষা পায় নাই। আমেরিকায় কিউবা দ্বীপের দাসত্বপ্রথা ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে রহিত হইয়াছিল।

"The system of slavery was finally abolished from Cuba Island in 1887".(America through Hindu eyes, by I.B.De. Majumdar)

এই লোমহর্ষক প্রথার উল্লেখ না করাই ভাল। আমাদের দেশীয় রাজ্যের প্রথাগুলি ইউরোপীয় দেশের প্রথার সহিত তুলনা হইতে পারে না। দাসত্বপ্রথা এবং সতীদাহ প্রথার নাম শুনিলেই আমরা চমকিয়া উঠি। এখনও কি ইংরেজ আমলে এ সব বর্ব্বর প্রথা দেশীয় রাজ্যে চলিতে পারে? এ কথা মনে আসে। অথচ, 'স্নেহলতার কেরোসিনে মৃত্যু আমরা সতীদাহ বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারি। এক দেশের প্রথার সহিত অপর দেশের তুলনা হইতে পারে না। আমাদের ত্রিপুররাজ্যে দাসত্বপ্রথা ছিল এবং বলিতে গেলে এখনও প্রকারান্তরে আছে; কিন্তু, তাহাকে Slavery বলা যায় না।১৮৭৮সালে Mr.Button আমাদের রাজ্যের পলিটিক্যাল এজেন্ট (Political Agent) ছিলেন। সর্ব্বপ্রথম তিনি এই দাসত্বপ্রথা লইয়া একটা তুমুল ঝগড়া উপস্থিত করিয়াছিলেন। "ইংরেজ রাজত্বে দাসত্বপ্রথা থাকিতে পারে না।" এই নীতিতে তিনি 'বর্ব্বর প্রথার' বিরোধী ছিলেন। এজন্য তিনি আমাদের দেশের দাসত্বপ্রথা রহিত করিয়া দিবার জন্য স্বর্গীয় বীরচন্দ্র মাণিক্যকে ধরিয়া পড়েন। তাই Slavery (?) দাসত্ব (!) বীরচন্দ্র মাণিক্য উঠাইয়া দিলেন। কিন্তু তাহার ফলে কি হইয়াছিল এবং কি হইতেছে? সে কথা বলিতে আমার দুঃখ হয়। যদি Colonel Johnstoneএর মত সহৃদয় Political Agent থাকিতেন তাহা হইলে তিনি এই প্রথাকে বর্ব্বরোচিত (Barbarous) প্রথা কখনই বলিতে পারিতেন না, বরং ঘোরতর প্রতিবাদ করিতেন এবং এ প্রথা রক্ষা করিতেন! এই 'লালুপ'প্রথা সম্বন্ধে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন—

" I hear that " Lallop" has been abolished in Manipur since we took the State in charge. We may live to regret it; the unfortunate Puppet Rajah certainly will. Why cannot we leave these alone, and attack the real evils of India that remain unredressed. The native system has much good in it, much to recommend it, and that it is in many cases the natural out growth of the requirements of the people".--(My Experiences in Manipur P.115)

এই লালুপ প্রথাকে যদি slavery বলা যায় তাহা হইলে চাকুরী প্রথাকেও দাসত্ব প্রথা বলা যাইতে পারে। তবে কেন, এই প্রথা লইয়া ইংরেজ কর্ম্মচারীগণ হাঙ্গামা করেন? তাহার কারণ, Col. Johnstone বলিতেছেন—

Unfortunately, our so called Statesmen are carried away by false ideas of humanitarianism, and a desire to pass in every way as the exponents of civilisation, that is the last fad that is uppermost, and the experience of ages and the real good of primitive people are often sacrificed to ignisfatuus"--(My Experiences in Manipur by Col. Johnstone. P.115)

Col. Johnstone এর মত সহৃদয় (Political Agent) পলিটিক্যাল এজেন্ট প্রায় দেখা যায় না এবং তিনি যথার্থ মণিপুরের বন্ধু ছিলেন, একথা মণিপুরবাসী সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন এবং তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া অশ্রুপাত করেন। যদি "লালুপ" প্রথাকে দাসত্বপ্রথা বলা যায় তাহা হইলে ত্রিপুরারাজ্যে দাসত্বপ্রথা রহিত করার একই অর্থ হইয়া থাকে। যদি স্বাধীন ত্রিপুররাজ্যে এ প্রথা না থাকিত তাহা হইলে ত্রিপুরার প্রসিদ্ধ এবং বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকাগুলি কখনও 'সাগর' নামে পরিচিত হইত না, উহারা প্রজাবর্গকে জলদান করিয়া অদ্য পর্য্যন্ত স্মরণীয় হইয়া থাকিত না। ১৪০৭ খৃষ্টাব্দে, ত্রিপুরার ধর্ম্মমাণিক্য কুমিল্লা নগরীতে 'ধর্ম্মসাগর' নামে বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন, এবং সেই উপলক্ষে এই দীঘির চারিপারের ২৯/০

দ্রোণ জমি দ্রাবিড় দেশীয় ব্রাহ্মণকে দান করেন—এ রাজ্যে বসতি করিবার জন্য। সেই তাম্রশাসনে লিখা আছে, ''যদি আমার বংশ ব্যতীত অন্য কোন বংশ এই রাজ্যের অধিপতি হন, আমি তাহার দাসানুদাস হইব যদি আমার ব্রহ্মবৃত্তি লোপ না করেন।'' ৫১২ বৎসর পূর্ব্বের হিন্দুরাজা এই হিন্দুভাব যিনি দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন, অদ্য পর্য্যন্ত এই দীর্ঘিকা কুমিল্লা শহরের পানীয় জল সরবরাহ করিতেছে।

এই দীর্ঘিকা খনন করিবার দুটী কারণ ছিল, দ্রাবিড় দেশীয় ব্রাহ্মণ আনাইয়া বসতি করাইবার এবং চট্টগ্রাম প্রদেশ যখন আরাকাণ নৃপতি জয় করিয়া লন, তখন কতকগুলি মাইটাল অর্থাৎ মাটী খননকারী প্রজা আসিয়া ধর্ম্মমাণিক্যের আশ্রয় গ্রহণ করে। তাই আশ্রিতবৎসল ধর্ম্মমাণিক্য তাহাদের উভয়ের উপকারার্থে এই কীর্তিসাগর খনন করিয়াছিলেন।

Col. Johnstone লিখিয়াছেন—

''High embanked roads were made throughout the country and largetanks,lakes ,appropriately termed''seas, were excavated under former ages in other parts of India are due to something of the same kind.''(My Experiences in Manipur,P.114)

আসাম, কোচবিহার, মণিপুর এবং ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাচীন প্রথাগুলি একই রকম ছিল, একই কারণে তাহা উঠিয়া গিয়াছিল; কিন্তু উঠাইয়া দিবার দরুণ যে অনিষ্ঠ হইয়াছে তাহার ইষ্টের তুলনা করিলে আমাকে Col. Johnstone এর বাণীই স্মরণ করাইয়া দেয়।

এই ''লালুপপ্রথা'' মণিপুর হইতে চিরতরে আইন করিয়া উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই আইন করিয়াছিলেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট। তাঁহারা হয় ত বুঝিয়াছিলেন একটা আপদ গিয়াছে—কিন্তু আপদ রহিয়া গিয়াছে বংশানুক্রমে; তুষানলের ন্যায় থাকিয়া থাকিয়া ইহা জ্বলিয়া উঠে। তখন দোষ পড়ে বেচারী রাজার ঘাড়ে। লালুপ প্রথায় রাজা প্রজার মধ্যে যে একটা নৈকট্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইত তাহা নিজ চক্ষে না দেখিলে কল্পনায় বুঝিবার নয়। লালুপ প্রজা যেন ছিল পরিবারভুক্ত ব্যক্তি,—পারিবারিক উৎসবাদিতে তাহার উৎসাহ কত, মনিবের ভালমন্দ তাহাকে অভিভূত করিত; অথচ সেই স্নেহবন্ধন ব্যতীত, দাসত্বের মত, মনিবের সহিত তার আর কি বন্ধন ছিল?—সে ইচ্ছা করিলে ম্যাদ অন্তে জমীর দখল ত্যাগ করিলেই স্বাধীন,—বর্ত্তমানে প্রজাস্বত্বের সর্ত্ত ও কি তাহা হইতে ভিন্ন?

তাছাড়া—রাজার দিক হইতে ভাবিবার আছে,—তাঁহারা ত আর আমাদের মত নন,—রাজার আরাম আয়াসে আমোদ—প্রমোদে একটা রাজসিক ভাব থাকিবেই; তার ঝোঁকে রাজাকে প্রজার উপর এক আধটু আধিপত্য বিস্তার করিতে হয়—ধরুন শিকার সখ মিটাইতে হইবে,—মালপত্র লইতে শত গোগাড়ির প্রয়োজন; টাকা পয়সা দিয়াও এত গাড়ী এককালে একদিনে সংগ্রহ হয় কি? একটু রাজাধিপত্য,— ক্ষমতাপ্রকাশে তাহা সংগ্রহ করিতে হয়,— সর্ব্বত্র এই প্রথা। কিন্তু, রাজার ক্ষমতা কাড়িয়া লইবার দরুণ প্রজাগণ মাঝে মাঝে অসহিষ্ণু হইয়া পড়ে। রাজা শিকারের সখে—সেটা সভ্য জগতের অনুমোদিত-'লালুপ' প্রথা প্রবর্ত্তন করিতে চান, তখন প্রজাসাধারণ আপত্তি করে। আপত্তি করিবার প্রধান কারণ, নগদ টাকা খাজনা প্রথা প্রবর্ত্তন রাজা প্রজার মধ্যে এখন কেবলমাত্র প্রজা ভূম্যধিকারী সম্বন্ধ বর্ত্তমান। রাজা প্রজা সম্বন্ধ আর নাই। ইহা দেশীয় রাজ্যের পক্ষে বিপরীত ভাব আনয়ন করিয়া ফেলে; আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক প্রাচীন প্রথা উঠাইয়া দিতে হইয়াছে, কেবলমাত্র ইংরেজ গবর্নমেন্টের খাতিরে নহে কিন্তু বাহিরের শিক্ষিত কর্ম্মচারীবৃন্দের বিশেষ ইচছায় এবং অভিপ্রায়ে সে সব প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা মনে করেন আপদ গিয়াছে কিন্তু চিরকাল এ আপদ থাকিবে। আমাদের রাজ্যে 'তৈথুং' প্রথা ছিল অর্থাৎ পার্ব্বত্য প্রদেশে গতিবিধির সৌকার্য্যার্থ এই প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রজাগণ ভ্রমণকারীর লটবহর লইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইত এবং উক্তস্থানে পঁহুচাইয়া দিয়া তথায় একবেলা আহার করিয়া লইত। দেশের অবস্থা দৃষ্টে এ প্রথা উত্তম ছিল। কিন্তু এখন অবস্থা হইয়াছে এই, প্রজা নগদ পয়সা লইয়া মোট বহিতে নারাজ এবং মুটিয়াগিরি করিতে অত্যন্ত আপত্তি করে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাভিমানী কর্ম্মচারীবৃন্দ রাজ্যের অভ্যন্তরে গতিবিধি করিতে নারাজ, কারণ গতিবিধি করিবার সুবিধা

তো নাই—ই, অসুবিধা যাহা আছে তাহা এ শিক্ষিত কর্ম্মচারীবৃন্দ স্বপ্নেও দেখে নাই। রেলের রাস্তা থাকা দূরের কথা, পায়দল রাস্তা পর্য্যন্ত নাই। ব্রিটিশ System এ (travelling allowance) ভ্রমণের জন্য ভাড়া প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণীতে গতিবিধি করিয়া মজুরী পোষায় না, কাজেই ডেস্কে বসিয়া হাকিমী করাই শ্রেয়ঃ মনে করেন; হাকিমের মুখ প্রজাগণ কখনও দেখিতে পায় কি না সন্দেহ। ইহা কি, পার্ব্বত্য ত্রিপুরার দুর্ভাগ্যের বিষয় নহে?

পূর্ব্বে এই পার্ব্বত্য প্রজাপুঞ্জ হইতেই বিনোন্দিয়াসিপাহি সরবরাহ করা হইত। কাজেই, তাহারা যে কার্য্যে যাইত সেই কার্য্যের দরুণ Travelling allowance (ভাতা) পাইত না এবং বিল লম্বা চওড়া হইত না। কিন্তু কাজ সহানুভূতির সহিত স্বজাতি বা স্বদেশীভাবে সম্পন্ন হইত। সেভাবের এক্ষণে অভাব হইয়াছে—এক্ষণে সস্তা চাকুরীর বাজারে ব্যাণার্জ্জি, মুখার্জ্জি, ঘোষ, বোস এবং সেন বংশীয়গণ পুলিশে ঢুকিয়া জাত্যভিমান হৃদয়ে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে পার্ব্বত্য ত্রিপুরাবাসী পার্ব্বত্য জাতির প্রতি সহানুভূতি শূন্য হইয়া পড়িয়াছে।

পূর্ব্বে আলং নামে আর একটি প্রথা ছিল। এ প্রথায় রাজ্যের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইত। ইহা ধরিতে গেলে (Irregular farce) অবিধিবদ্ধ সাধারণ ফৌজ বলা যাইতে পারে। আমি যখন শিশু ছিলাম, তখন 'আলং' প্রথা বর্ত্তমান ছিল। আমার পিতৃদেব স্বর্গীয় ভারতচন্দ্র ঠাকুর সে 'আলং'—এর আলাহাজারী ছিলেন অর্থাৎ তিনি এই Force এর Chief Commandant ছিলেন। তখন তিনশত লোকবল ছিল। এইক্ষণে এই প্রথা মিলিটারী (Military) এবং পুলিশ (Police-System) সিষ্টেমে গঠিত হইয়াছে। আমি নিজে (Military Dept.Chief-Commanding Officer) সৈনিক বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীর কাজ করিতাম, তখন নব্য শিক্ষিত এবং নব্য প্রথায়(Colonel) কর্ণেল পদকে আমি উৎকৃষ্ট মনে করিতাম। এখন যদিচ অবসর লইয়াছি কিন্তু পদবী আমাকে আঠার মত আঁকড়াইয়া কর্ম্মফল এখনও ভোগাইতেছে।

আর একটি প্রথা যাহা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ভদ্রবংশে ভদ্রতাররক্ষার্থে ছিল সে প্রথা উঠিয়া যাওয়ার দরুণ কি–অনিষ্ট হইয়াছে তাহা আমরা ভদ্রবংশীয়গণ অন্তরের সহিত অনুভব করি। 'পিছারা সেবক' বলিয়া আমাদের প্রত্যেক বাড়ীতে এক একটী প্রজার বসতি (Colony)ছিল। বাড়ীর পিছনে থাকিত বলিয়া তাহাদিগকে পিছারার সেবক বলা যাইত। তাহাদের কার্য্য ছিল, মনিব অথবা অন্নদাতার বাড়ীতে সেবা করিয়া এবং আবশ্যক স্থলে চাকুরী করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত। ইহারাই আমাদের লোকবল ছিল এবং তাহাদের অভাবে আমরা লোকবল শূন্য হইয়া দুর্ব্বল হইয়াছি।

''গড়ন ভাঙ্গিতে পারে যেই কোনজন,
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সেই মহাজন''

প্রাচীন রাজ্যের প্রাচীন প্রথা অতি সহজে ভাঙ্গিয়া ফেলা যায়, কিন্তু গড়ন কখনও সম্ভব হইয়া উঠে না। সেকালে যিনি মনিব ছিলেন, তিনি তাহাদের Patriarch ছিলেন। পার্ব্বত্য অঞ্চলের প্রজাগণ হইতে সেবক শ্রেণীর লোক আমদানী হইত। যাহারা ''জুম'' করিয়া হয়রাণ হইতে তাহারাই সেবকী করিয়া আসান হইত। অধিকাংশ লোকই আত্মবিক্রয় কি—পরিবারের লোকদিগকে বিক্রয় করিত না। যদি বা মাঝে মাঝে কেউ করিত তাহার অর্থ ছিল –বাঁধা–বসা অর্থাৎ উক্ত জনের নিকট অর্থ ঋণ লইয়া সুদ না দিয়া চাকুরী করিয়া ঋণ আদায় করিত। যখন ঋণ পরিশোধিত হইত তখন তাহারা খালাস পাইত। অধিকাংশ লোকই স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে আসিয়া রাজ পরিবার বা ঠাকুর পরিবারে সেবকশ্রেণীভুক্ত হইত এবং তাঁহারাও এসব সেবকদিগকে আপন পরিবারের লোকদের ন্যায় দেখিতেন। অশনভূষণ যোগাইতেন এবং সময় সময় অলঙ্কারাদি দেওয়ার প্রথা কেবলমাত্র মনিবের মর্য্যাদা রক্ষার্থ পাইত, তাহা না হইলে মনিবের ইজ্জৎ থাকে না। এক্ষণে, সে প্রথা উঠিয়া যাওয়ায় ত্রিপুরার প্রজাগণকে কুসীদজীবীর হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া মনুষ্যত্বের অধোগতিতে স্থান পাইতে হইয়াছে। এক্ষণে তাহারা পিছারা সেবক নয় সত্য কিন্তু দাসের অধম, নিত্য উত্তমর্ণের তাড়ায় নিপীড়িত,—অন্ন বস্ত্রের জন্য পরমুখাপেক্ষী –এ দরিদ্র দেশে কি ও স্বাধীন দেশের প্রথায় চলে,–তাহাতে কি ফল, তাহা প্রাচীন প্রথার পরিবর্ত্তনে স্পষ্ট জাজ্জ্বল্যমান,—মানুষকে উপযুক্ত শিক্ষায় কর্ম্মঠ করিয়া তোল; তাহাদিগকে বুঝিতে দাও তাহারা মানুষ—তখন তাহার নিজের স্থান নিজে চিনিয়া লইবে, তাহাদের উন্নতির পথে তখন

আর কে বাধা দিবে—আমরা তাই চাই—কিন্তু তাহা না করিয়া প্রাচীন প্রথা উঠাইয়া দিলে তাহা কেবল তাহাদের দুঃখের কারণ নয় কি?

হঠাৎ একদিন (বাল্যকালে) পিতামাতার নিকট শুনিলাম,— আমাদের পিছারার লোকদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইবে—এবং আমাদের বাড়ীর আত্মীয়েরা নিজ হাতে কার্য্য করিয়া লইবেন। এই প্রথা গভর্ণমেন্টের উপদেশে বাধ্য হইয়া ১২৮৮ ত্রিপুরাব্দের (১৮৭৮ খৃঃ) ১৭ই আষাঢ় তারিখে বিধি করিয়া উঠাইয়া দিতে ঘোষণাপত্র জারী হইয়াছিল। আইন হইয়াছে বন্ধকী প্রথা–বর্ব্বর–রীতি, বে–আইনি বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। সেই বাড়ীর পরিচারিকাগণ আইনতঃ মুক্তিলাভ করিয়া হঠাৎ স্বাধীনতা লাভ করিয়া মহাবিপদ গণিল; তাহারা কি সহজে আমাদের আশ্রয় ছাড়িতে চায়—মরাকান্না পড়িয়া গেল,—আজও তাহারা স্বাধীন হইয়াও স্বেচ্ছায় তাহাদের সেই অধীনতার জন্য লালায়িত,–সেই আমাদের দ্বারেই তেমনি কাজ করিয়া খাইতেছে; তার জন্য যে মজুরী পায় তা পূর্ব্বের সুবিধার তুলনায় সামান্য,—তাহাদের সংসার পালনের পক্ষে অপ্রচুর। তাহাদের দুর্দ্দশা আজ এই ৫৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দেখিয়া মর্ম্মাহত হইতেছি। বলিতে কি ইহাদের মধ্যে অনেক বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও দেশের একটা Moral atmosphere দূষিত করিয়া দিয়াছে।

আমাদিগকে যাহারা মাতৃবৎ লালন—পালন করিত এবং মা হইতেও অধিক শাসন করিত, অদ্য তাহারা কলিকাতা কৃষ্ণনগর এবং নবদ্বীপের নানাস্থানে প্রথম রক্ষিতাবস্থায় পরে যাহা হয় বাজারের আশ্রয় নিতে বাধ্য হইয়াছে। একদিন এই শ্রেণীর আমাদের 'ধাই মা' সম্পর্কীয় একজন নবদ্বীপের পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে, হঠাৎ আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইলে আমি তাহাকে চিনিতে পারিলাম কিন্তু আমাকে চেনা তাহার অসাধ্য ছিল। আমি নিজ হইতে পরিচয় দিলে সে বেচারী প্রথমে বুঝিতে পারে নাই, পরে যখন আমার ডাক নাম তাহার নিকট বলিলাম তখন বাঁধা রাস্তার উপর উপুর হইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল এবং দেশের সেই মুক্তির আইনকে অভিসম্পাত করিতে লাগিল। সে দৃশ্য বড়ই হৃদয়—বিদারক! আমি যত দিন নবদ্বীপে ছিলাম তত দিন তথাকার এক ভদ্র পরিবারে বাস করিতাম, এই বৃদ্ধাকে আমি আনিয়া পরিচয় দিলে তখন বাড়ীর গৃহিনী—মহলে তাহার স্থান হইয়া গেল এবং এক বৎসরের মধ্যে তাঁহার মানবলীলা সম্বরণ হইয়াছিল। বেচারী ভেক লইয়াছিল এইজন্য আমি খরচ করিয়া তাহার —ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়ায় একটি মহোৎসব দিয়াছিলাম। এক্ষণে আমি বলিতে পারি, যাহা Barbarous labour বলিয়া তাহার প্রতি পাশবিক ব্যবহার করা হইয়াছিল, তাহার দরকার ছিল না বরং অভাবে স্বভাব নষ্ট হইয়াছিল। এই 'লোলুপ' প্রথা উঠিয়া যাইবার দরুণ মণিপুরে নৈতিক-জগত তমসাচ্ছন্ন হইয়াছে। এই Happy-valley তে Happiness উঠিয়া গিয়াছে এবং কতকগুলি জঘন্য বৃত্তি বাড়িয়া উঠিতেছে।

স্ত্রী স্বাধীন দেশ মণিপুরে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা থাকা দরুণ যে সব মহতোপকার হইয়াছিল বর্ত্তমান সময়ে, তাহাই সেই নৈতিকজগতে দুর্দ্দশা আনয়ন করিয়াছে। মণিপুর সমাজে সকলের স্থান সমান ছিল, উচ্চ নীচ ভেদ ছিল না, রাজা হইতে প্রজা পর্য্যন্ত এক সমাজভুক্ত ছিল, তদ্দরুণ সমাজ-শরীরে একতা প্রবেশ করিয়াছিল। তাহারা সুখে ছিল। এক্ষণে সে সুখ-সাগর শুকাইয়া গিয়াছে। সাগরের পঙ্ক দেখা গিয়াছে এবং সময়ে পঙ্কোদ্ধার কে করিবে আমি জানি না। একটি দৃষ্টান্ত দেখাইলে যথেষ্ট হইবে। মণিপুরে মণিপুরী স্ত্রীলোক ম্লেচ্ছের রক্ষিতা হইয়া এবং প্রকাশ্যভাবে বাস করার প্রথা চলিয়াছে।

যুরেশিয়ান টেলিগ্রাফ মাষ্টার চমৎকার মণিপুরী ভাষা বলিতে পারেন শুনিয়া আমি তাঁহাকে ভাষা শিক্ষার মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি উত্তর দিলেন "I have got a living Dictionary" আমার একখানি জীবন্ত অভিধান আছে।" মণিপুরের নৈতিক-জগতের যে চিত্র দেখিতে পাইয়াছি তাহা চিত্রিত করিয়া লেখনী কলঙ্কিত করিতে হয়। বিশ্রী চিত্র দেখাইতে হয় কাজেই এখানে প্রবন্ধ বন্ধ করিলাম। মণিপুরে মহিলাগণ ধর্ম্মের নামে নৃত্যগীত করিত এক্ষণে বাইজি ও খেমটা নাচ করিয়া খাস মণিপুরের মধ্যে বীভৎসতার অভিনয় করে এবং এই নাচ লইয়া এক্ষণে জেলায়- জেলায় ঘুরিয়া ব্যবসা করা হইতেছে! ইহা হইতে অধোগতির আর বাকী কি রহিল? Tea-Planter গণ এই সমাজ হইতে রক্ষিতা স্ত্রীলোক সংগ্রহ করিতেছে। মণিপুরে অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক বাস করিতেছেন এবং স্থায়ী বাসিন্দা হইয়াছেন। আমি তাঁহাদের কাহারও কাহারও সহিত এ

বিষয়ে আলাপ করিয়াছিলাম,ঈষৎ হাসি ব্যতীত অন্যরূপ উত্তর পাইলাম না। বাঙ্গালী ক্লাবে একটি Theatre party আছে তাহাতে মণিপুরী স্ত্রীলোক অভিনয় করিয়া থাকে এবং বেশ অভিনয় করিতে পারে দেখিলাম-কিন্তু আমি ইহাদের নৈতিক-চরিত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে না পারায় এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিলাম না।

চেরাব বা মণিপুরের আদালত

মণিপুরের প্রাচীন চিত্র খুঁজতে গিয়া দেখিতে পাইলাম, ইংরেজ গবর্ণমেন্ট প্রাচীনতার কতকগুলি চিহ্ন বর্তমান রাখিয়াছেন। বিচারালয়টি প্রাচীনতার ধ্বজা স্বরূপ রক্ষিত হইয়াছে। মণিপুরে, বিচার-পদ্ধতি যে রকম ছিল, ঠিক সেই রকমই এখনও চলিতেছে। বিচারাদালতের নাম-মণিপুরে আবহমান কাল হইতে 'চেরাব' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। এই 'চেরাব' নামক কোর্টই আদালতের কার্য্য করিয়া থাকে। মণিপুরে যখন মহারাজাদের পূর্ণ ক্ষমতা ছিল, বাহির হইতে কোন শক্তিমান জাতি আসিয়া-শক্তিসঞ্চালন করেন নাই,-সেই প্রাচীন সময়ের 'চেরাব' কোর্ট যে প্রণালীতে গঠিত এবং পরিচালিত হইত, অদ্য পর্য্যন্ত তাহাই নিঁখুত অবস্থায় দণ্ডায়মান আছে। এই 'চেরাব' কোর্ট সমস্ত দেশীয় রাজ্যের পক্ষে একটি শিক্ষণীয় বিষয় এবং অনুকরণীয় বলিয়া মনে করি। 'চেরাব' বিচারপতিগণের অমোঘ ক্ষমতা। এই 'চেরাব' বিচারপতিগণের পাঁচ ভাগের দুই ভাগ রাজা কর্ত্তৃক
১৯০ নিযুক্ত হয় এবং অপর তিন ভাগ প্রজাসাধারণ হইতে দস্তুর মত নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে, কাজেই রাজারপক্ষে Majority কখনও পাওয়া যায় না, প্রজার পক্ষেই Majority হইয়া পড়ে। এই পাঁচ জন 'চেরাব' কোর্টের বিচারপতিগণ একত্র বসিয়া
৯০ রাজ্যের বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এই আদালতে উকীল নাই, মোক্তার নাই, ষ্ট্যাম্প নাই, কোর্টফি প্রভৃতি কোন জঞ্জাল নাই-এমন কি লেখাপড়া পর্য্যন্ত নাই! এই অভিনব প্রাচীন আদালত দেখিবার জন্য আমার ইচ্ছা বলবতী হইল এবং দেখিতে গেলাম।-যাইয়া দেখি পাঁচ জন বিচারকের উপবেশনের জন্য পাঁচখানা রক্তবর্ণের বনাতের আসন যথাস্থানে স্থাপিত হইয়াছে এবং তাঁহাদের পদোচিত গৌরব রক্ষার জন্য পানদান, পিকদান, জলপাত্র, দর্পণ, শঙ্খ এবং হুঁকা (রৌপ্য বেষ্ঠিত বৈঠকে স্থাপিত) প্রভৃতি যথাস্থানে রক্ষিত হইয়াছে এবং এই সকল দ্রব্যের ভারবাহী সেবকগণ সন্তর্পণে দণ্ডায়মান আছে। তখনও আদালত বসে নাই-অর্থীপ্রত্যর্থীগণ জোড়হাতে দাঁড়াইয়া আছেন,কাহারও এ ধর্ম্মাধিকরণে বসিবার অধিকার নাই। আলাপ এবং প্রলাপ বকিবার এ স্থানে বিধিবৎ নিষেধ। ভিন্ন রাজ্যের লোক আমাকে দেখিয়া উপস্থিত লোকের মধ্যে কানাকানি হইতেছিল; ভাবে বুঝিলাম, এ ধর্ম্মাধিকরণে আমি কেন? যথা সময়ে শুনিতে পাইলাম চেরাবগণ অগ্রসর হইতেছেন। ভারবাহীরা রাজকীয় চিহ্নের জিনিষগুলি লইয়া অগ্রসর হইল; অর্থীপ্রত্যথী পর্য্যন্ত তাহাদের অনুগমন করিল এবং দর্শকবৃন্দ পর্য্যন্ত তাহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। ইতিমধ্যে শঙ্খধ্বনি দ্বারা 'চেরাবগণে'র আগমন ঘোষিত হইল-আর অমনি সমস্ত লোক মণিপুরের প্রথানুসারে 'চেরাবগণকে' ভূমিতে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। এ দৃশ্য দেখিবার জিনিষ-শুনিবার বিষয় নহে। হঠাৎ আমাকে দেখিতে পাইয়া প্রধান 'চেরাব' ক্ষাণিক-ক্ষণ থমকিয়া দাঁড়াইলেন বটে, কিন্তু বাক্যব্যয় না করিয়া গম্ভীরভাবে তাঁহাদের স্ব স্ব আসনে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন। মণিপুরের প্রথানুসারে সাষ্ঠাঙ্গ প্রণিপাত করিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু আমি যুগপৎ স্তম্ভিত হইয়া অবনত মস্তকে প্রণত হইলাম; মনে করিলাম, যথার্থই আমি ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইয়াছি। এ ধর্ম্মাধিকরণের ধর্ম্ম কি, জানি না; কিন্তু বিচারপদ্ধতি দেখিয়া বোধ হইল এই চেরাব যথার্থ ধর্ম্মাবতার।

বিচার আরম্ভ হইল, পক্ষাপক্ষ সাষ্ঠাঙ্গ প্রণিপাতপূর্ব্বক হাঁটু গাড়িয়া বিনীতভাবে রোদন করিতে লাগিল এবং ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতে লাগিল। বিচার ছিল একটি গুরুতর বিষয়ের। এই চেরাবগণ অমোঘ ক্ষমতাশীল; দণ্ড অথবা ক্ষমা করা অথবা আপোষ করিয়া দেওয়াই তাঁহাদের অমোঘাস্ত্র। এই অস্ত্রের দ্বারা তাঁহারা দেশের শান্তি রক্ষা করিয়া থাকেন। মোকদ্দমার বিষয় এই ছিল, একটি পরিবারের বিবাহিতা কন্যা পিত্রালয়ে থাকিবার সময় অপগর্ভবতী হইয়াছিল; তাহার স্বামী এজন্য আদালতে বিবাহ পণ্ডের জন্য আবেদন করে। বিচারকার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই ঐ গর্ভবতী গর্ভ নষ্ট করিবার জন্য প্রয়াস পাইলে মৃত্যুমুখে পতিতা হয়। কাজেই বিচারকগণ বড় উষ্ণ হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের অবয়ব দৃষ্টে বুঝিতে পারিলাম তাহারা এ বিষয়ে একটা বিশেষ শাস্তি দিবার ইচ্ছা করিতেছেন। মণিপুরী ভাষায় মৌখিক সব কার্য্য নির্ব্বাহ হয়-আমি মণিপুরী ভাষায় বিশেষ পারগ নহি,

এজন্যই সঙ্গীয় পথপ্রদর্শকের নিকট হইতে বিচার-সংক্রান্ত সব কথা জানিয়া লইলাম। চেরাব কোর্টের প্রথানুসারে বাদী বিবাদীর মধ্যে আপোষ হইয়া গেলে চেরাবগণ তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন; আর যদি কোনও শাস্তি বিধান করিতে হয় তাহা হইলে সামাজিক দণ্ডই প্রদত্ত হইয়া থাকে। আমরা সকলেই বুঝিয়াছিলাম-যখন বাদী বিবাদীর মধ্যে আপোষ হইয়া গিয়াছে তখন শাস্তি সরল হইবে। কিন্তু চেরাবগণের সেই অধিকার থাকিলেও তাঁহারা সন্তুষ্ট হইলেন না- গুরুতর শাস্তির বিধান করিলেন। চেরাব-প্রধান অতি গম্ভীর অথচ উচ্চৈঃস্বরে হুকুম প্রচার করিলেন। গ্রামের ভেষজ যিনি ঔষধ দ্বারা এই অপকার্য্য ঘটাইয়াছেন তাহার প্রমাণ যথাযথরূপে না হইলেও চেরাবগণ তাহাকে মুক্তি দিতে রাজি নহেন। এজন্য সে কবিরাজকে দেশান্তরের হুকুম প্রচার করিলেন। সামাজিক প্রথায় তাহার শাস্তি হইল।

বাদী বিবাদীর মধ্যে আপোষ হইয়া গিয়াছে, তাহারা যে স্ত্রীলোকটি মারা গিয়াছে তাহার দাহ সংস্কারের ব্যবস্থা পাইতে চেরাব কোর্টের নিকট উপস্থিত। চেরাব-প্রধান হুকুম প্রচার করিলেন সে মৃতদেহের অগ্নিসৎকার হইবে না-পাপীদের জন্য মৃতদেহ ফেলিয়া দিবার যে স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে সেই স্থানে এই মৃতদেহ ফেলিয়া দিতে হইবে। এই আদেশ প্রচার হওয়া মাত্র বিবাদীর যেন মুণ্ডচ্ছেদের হুকুম হইয়াছে এইভাবে তাহারা আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। হুকুম বড়ই মর্ম্মান্তিক কঠোর হইয়াছে। কঠোর হইলেও কর্ত্তব্যবোধে যে হুকুম প্রচার হইয়াছে তাহা হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য কেবলমাত্র, আর্ত্তনাদ আশ্রয় করিল। চেরাবগণ 'বজ্রাদপি কঠোরাণি- মৃদুনি কসুমাদপি'র ন্যায় হইয়া নির্ব্বাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। বাদী বিবাদী আর্ত্তনাদের মাত্রা বাড়াইয়া যখন কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল তখন প্রধান চেরাব অভ্যস্ত কঠোর ভাষায় তিরষ্কার করিতে লাগিলেন। প্রকাশ করিয়া বলিলেন 'হাকিম নড়ে ত হুকুম নড়ে না।' এই হুকুম তামিল করিতে হইল।

বাদী বিবাদীর পরিবারবর্গ এইরূপ শাস্তি বিধানে নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে বলিয়া আশঙ্কিতা হইল। কারণ, এই উভয় পরিবারে এই কুৎসা বাক্য পুরুষানুক্রমে প্রচার থাকিবে ইহাই তাহাদের দুঃখ ও মনঃকষ্টের কারণ। যথাসময়ে চেরাব বিচারপতিগণ গাত্রোত্থান করিলেন, আবার পূর্ব প্রথানুসারে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। দর্শকবৃন্দ চলিয়া গেল, কেবল রহিয়া গেল ভূমিতে লুটাইয়া দণ্ডবৎকারী সেই বাদী-বিবাদী এবং তাহাদের পরিবারবর্গ; ইহারা এ অবস্থায় কতক্ষণ কাটাইবে তাহার ঠিকানা নাই। ক্ষমতা চাহিতে কাল সাপেক্ষ করে না, মান সাপেক্ষ রাখে।

এই চেরাব বিচারাদালতে এ রাজ্যের যুবরাজ এবং রাজপরিবারের পর্য্যন্ত বিচার হইয়া থাকে, এ বিষয়ে নিম্নে পূর্ব্বোক্ত কর্ণেল সাহেবের লিখিত মত উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

'' I have already alluded to the turbulent character of Kotwal Koireng, the Maharaja's fourth son, and now again I was to have fresh evidence of it. The Maharaja handed over the case to the 'Cherap court' for trial, and as migh be expected, they acquitted Kotwal of the charge of causing death and found him guilty of injuring the other two. They sentenced him to banishment for a year to the Island of Thanga, in the Logtak lake, and Temporary degradation of caste.My Experiences in Manipur, (p.113)by Col.Johnstone.

এই কোতওয়াল Koireng পরে যখন ক্ষমতাশালী হন তখন তাহার নাম হইয়াছিল-'ত্রিকেন্দ্রজিৎ'-মণিপুরের আধুনিক ইতিহাস যাঁহারা জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা ত্রিকেন্দ্রজিতের অবস্থা অবশ্যই জানেন এবং তাঁহার শেষ অবস্থা কি হইয়াছিল তাহা অবশ্যই জ্ঞাত আছেন। এমন ক্ষমতাশালী লোকের চেরাব কোর্ট যেখানে বিচার করিতে পারেন এবং কঠোর হুকুম দিতে পারেন সে কোর্ট যে দেশমান্য কোর্ট হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে চেরাব ধরণের কোন কোর্ট না থাকিলেও পাহাড় আদালত নামে এক আদালত ছিল এবং তাহার বিচারপতিগণ-এদেশের ঠাকুর শ্রেণী হইতে নিযুক্ত হইত। অর্থীপ্রত্যর্থী বিনা ব্যয়ে বিনা উকীলের সাহায্যে সুবিচার পাইত কিন্তু যখন আমরা সভ্য-ভব্য হইলাম, সেই ভব্যতাই আমাদের বহু মূল্যবান 'চীজ' উঠাইয়া লইল। ১২৮৮ ত্রিপুরাব্দে (১৮৭৮খৃঃ) ১৭ই আষাঢ় তারিখে প্রচারিত দাসত্ব-প্রথা রহিত পত্রের সঙ্গে 'পাহাড়'

আদালতের কার্য্যও সেই আদেশানুসারে বন্ধ হইয়া গেল। সদাশয় গবর্ণমেন্ট মণিপুর রাজ্য এবং মণিপুরবাসীর উপর সর্ব্বদা এবং সর্ব্ব বিষয়ে সদয়। তাই প্রাচীণ প্রথা মণিপুরে রক্ষা পাইয়াছে। ''চেরাব'' বিচার প্রথা এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে। মণিপুরের ইহাতে মহালাভ হইয়াছে একথা বলাই বাহুল্য।

মণিপুরে বিধবা বিবাহ

বিধবা বিবাহের সমস্যা আজও বঙ্গে বর্ত্তমান। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মরিয়া পুড়িয়া গিয়াছেন কিন্তু সেই বহ্নি এখনও জ্বলিতেছে। তুষানলের ন্যায় ইহা বঙ্গদেশে রহিয়াছে। কখন এবং কে নির্ব্বাপিত করে ইহা কেহ জানেন না। কারণ সে কম্পন-

''অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া।''

দেশীয় রাজ্যে অনেক স্থলে বিধবা বিবাহ প্রকাশ্যভাবে চলিতেছে এবং আমি এখনও জ্ঞাত আছি অনেক রাজ্যে রাজ্যের উত্তরাধিকারীরূপে বিধবা-সন্তান রাজত্ব পাইয়াছেন। বঙ্গদেশে অথবা আধুনিক আসামদেশে মণিপুর হিন্দুরাজ্য বলিয়া গর্ব্ব করিতেছেন। ইঁহারা অন্য কোন জাতির স্পৃষ্ঠ জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না। তাঁহারা এত গোঁড়া হিন্দু যে রাজপুতনা অঞ্চলে এই মদ্য মাংস ব্যবহার বিমুখ মণিপুর রাজাকে দেখিতে পাইয়া লোকে অবাক হইয়াছিল। নানাবিধ ক্ষাত্রোচিত খেলায় (Sport) মণিপুর নরপতি সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু আজমীরের কুপোদক পান করিতেন না, কারণ কূপ জলে চামড়ার মোষক ডুবান হয়। শুনিতে পাই অনেক ক্ষত্রিয় রাজপুত-কন্যার বিবাহপ্রস্তাব মণিপুর মহারাজা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। একথা জনশ্রুতি। কিন্তু আমি মণিপুর গিয়াছিলাম এবং এই জনশ্রুতির সত্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। মণিপুরীগণ চাপাজাতি, সহজে মনের কথা কাহাকেও বলে না, এবং ইহা লইয়া বাহ্যাড়ম্বর করে না, তথাপি যতদূর জানিলাম তাহাতে এই বুঝিয়াছি যে মদ্যমাংসপ্রিয় জাতির সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ স্থাপন করা সন্দেহের বিষয়। সন্দেহ ভঞ্জন হইল না, কাজেই সম্বন্ধ স্থাপন হইল না।

ত্রিপুরার রাজদরবারে একজন মণিপুরী পণ্ডিত ছিলেন মীঁনেশ্বর সার্ব্বভৌম। তিনি বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন, আদিবাস ছিল মণিপুরে, বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে ছিলেন, আমার সহিত তাঁহার একটি গ্রাম্যসম্বন্ধ ছিল। তিনি আমাকে পুত্রবৎ বাৎসল্য করিতেন। ইদানীং শ্রীবৃন্দাবন বাস করিয়া তথায় তাঁহার মানবলীলা সংবরণ হয়। স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের সময় আমি তাঁহার সহিত মণিপুরী সমাজ সম্বন্ধে অনেক কথা আলাপ করিতাম। তখন তাঁহার নিকট যেরূপ পণ্ডিতোচিত উত্তর পাইতাম এবং সুযুক্তি সহ প্রশ্নের মীমাংসা করিতেন তাহাতে আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি মাত্রেই সন্তুষ্ট হইবেন, আমার বিশ্বাস।

মণিপুর আমাদের কুটুম্ব রাজ্য, ইদানীং আমরা অন্যান্য দেশ হইতে নবকুটুম্ব সংগ্রহ করিয়াছি ও করিতেছি। এবং ভবিষ্যতে করিতে হইবে। তাঁহাদের মধ্যে আচার আছে ত বিচার নাই এবং বিচার আছে ত আচার নাই, কাজেই ঘরকন্না করিবার সময় নানা সমস্যা উঠিয়া থাকে। ইহা স্বাভাবিক বটে, ঘটনাধীন আমি সার্ব্বভৌম মহাশয়কে একটি প্রশ্ন করিয়াছিলাম।

মণিপুরে বিধবা বিবাহ সুপ্রচলিত, হিন্দু হইয়া এই বিবাহ প্রথা মণিপুর কি প্রকারে অনুকূল মত পোষণ করে? তখন বৃদ্ধ পণ্ডিতজি, উত্তর দিয়াছিলেন। মহাভারত গ্রন্থ নামোল্লেখ করিয়া ''বহুস্থানে বহু উপায়ে বিবাহ সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহা রাজনৈতিক ব্যবস্থা, এবং হিন্দুরাজার ব্যবস্থা, ঈঁশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার দস্তখত ছিল, সেই ব্যবস্থাপত্রখানা তিনি উদ্‌ঘাটন করিয়া বলিয়াছিলেন ''ইহা দলাদলির ব্যবস্থা, এই দলাদলি দলবিশেষের পুষ্টিতে ব্যর্থ হইয়াছে, আবার যখন নির্য্যাতিত দল পুষ্ট হইবে তখন সুদ আসলের সহিত আদায় হইবে। বাঙ্গালী দলাদলি প্রিয় এবং বিশেষতঃ গ্রাম্য দলাদলি প্রিয়। এই দলাদলির কোন অর্থ নাই। আমি ঈঁশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিকট গিয়াছিলাম, তাঁহার পদধূলি লইয়া ধন্য হইলাম। তিনি আমার যুক্তিপূর্ণ বাক্য শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তখন আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম-বঙ্গদেশের মহাপ্রভু এখনও সমগ্র বঙ্গদেশ গ্রহণ করেন নাই। যেদিন গ্রহণ করিবেন সেদিন ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের ব্যবস্থা নিশ্চয় গৃহীত হইবে।'' যেখানে বাঙ্গালী সেখানে দলাদলি'' এই জঘন্য অপবাদ যেদিন দূর হইবে তখন বঙ্গদেশ শীর্ষস্থানে বসিবে এবং জয়মাল্য পাইবে। প্রবাসী পত্রে হিন্দু বিধবার বিবাহ সম্বন্ধে নানা জনের নানা উক্তিপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। 'জাতিভেদ সমস্যা ও আর্য্য অনার্য্যের বিবাহ সম্বন্ধে

কষ্টি পাথরে ' শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দেব বলিতেছেন ''প্রাচীন ভারতে আর্য্য অনার্য্যের বিবাহ যে নিষিদ্ধ ছিল না, পরন্তু প্রচলিত ছিল, মহাভারতে বন পর্ব্বের ৮০ অধ্যায়ে ৩১/৩২ শ্লোকেই তাহার প্রমাণ রহিয়াছে।" সেই প্রবন্ধে একস্থানে বলিতেছেন ''অর্জ্জুন বিধবা বিবাহ করিয়াছিলেন " ইহাও বোধ হয় মহাভারত হইতেই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু মহাভারতের মণিপুর রাজবংশ উৎপন্ন হইয়াছিল অর্জ্জুন তনয় বব্রুবাহন হইতে। বিধবা বিবাহ এই জন্যই মণিপুরে সুপ্রচলিত আছে। কিন্তু অদ্য মণিপুরের অস্তিত্ব লইয়া নানা জনের নানা মত। কেহ কেহ বলিতেছেন মণিপুর অনার্য্য জাতি এবং ইংরেজগণ বলিতেছেন মাপের ফিতা ধরিয়া লইলে মণিপুর Indo Chinese জাতি। এই বাদানুবাদের মীমাংসা করিবে কে? প্রবাসী শ্রাবণের সংখ্যায় ৪০৪ পৃষ্ঠায় হিন্দু বিবাহ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে-''বঙ্গে বিধবা বিবাহ চলিতেছে না, গুজরাট, পাঞ্জাব, আগ্রা, অযোধ্যা, অন্ধ্র প্রভৃতি দেশে তদপেক্ষা অধিক চলিতেছে। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, বাংলা দেশ ন্যুনাধিক, ভন্ড দেশাচারের দাস, ন্যায়নিষ্ঠ হৃদয়বান্ লোকের সংখ্যা কম। আমি বলি বঙ্গে বীর্য্যবান্ লোকের অভাব। সাহস কম-পরমুখাপেক্ষী-অভাবে স্বভাব নষ্ট হইয়া যাইতেছে। বীর্য্যবান লোক যখন উপস্থিত হইবেন তখন বিধবা বিবাহের সমস্যা পূর্ণ হইবে। মণিপুর তখন শীর্ষস্থানে থাকিবে।

মহীশূরে রাজোদ্বাহ

বহুদিন হইতে আদর্শ দেশীয় রাজ্য মহীশূর দর্শনের বাসনা অন্তরে জাগরুক ছিল। মহারাজের ও রাজকুমারীর বিবাহোপলক্ষে রাজমাতা মহারাণীর নিমন্ত্রণ পাওয়ায়, সুযোগের দ্বার উদঘাটিত হইল। যথাসময়ে যাত্রা করিয়া, নব নির্ম্মিত লৌহবর্ত্তের সুবিধায় 'ইষ্টকোষ্ট' রেলে মান্দ্রাজ হইয়া মহীশূরে যাওয়াই স্থির করিলাম। কলিকাতায় পৌঁছিয়া, বজবজের অপরপারে 'বেঙ্গল নাগপুর' রেলে উঠা গেল। চতুর্থ দিবসের প্রাতঃকালে আমাদিগকে লইয়া ট্রেইন মান্দ্রাজে পৌঁছিল। এখানে ভয়ানক গরম, ১০৯ ডিগ্রী তাপ। আমাদের পক্ষে এরূপ গরম নিতান্ত আসহনীয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; সুতরাং পরদিন বিকাল বেলাই দক্ষিণ মহারাষ্ট্র রেলে মহীশূরাভিমুখে রওয়ানা হইলাম। তৎপর দিবস প্রাতে মহীশূরের কেন্দ্র রাজধানী বেঙ্গালোরে পৌঁছিলাম; এখান হইতেই আমরা মহীশূর রাজের আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। এখানকার বন্দোবস্ত ব্যাপার দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলাম, ব্যাপারখানা সামান্য নয়। উচ্চ শ্রেণীর একজন কর্ম্মচারী ষ্টেশনের নিকটে তাম্বু খাটাইয়া, অতিথি সৎকারের নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতেছেন। ট্রেইন ষ্টেশনে যাইয়া দাঁড়াইবামাত্র মহীশূরের অতিথিগণকে সাদর সম্ভাষণ নিজ নিজ ছাউনিতে লইয়া যাওয়া হইতেছে। তথায় স্নান আহারাদি কার্য্যে যে যে দ্রব্যের প্রয়োজন সমস্তই প্রস্তুত। আমরা মহীশূর প্রদেশীয় মিষ্টান্ন দ্বারা সুচারুরূপে উদর দেবের অর্চ্চনা করিয়া, নির্দ্দিষ্ট সেলুন গাড়ির আশ্রয় লইলাম। এ গাড়িতে কেবলই নানা দেশ হইতে আগত অতিথিগণ চলিয়াছেন। ঠন্ ঠন্ করিয়া ষ্টেশনের ঘড়ির ১১টা বাজিয়া গেল, সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ট্রেইন্‌ও উচ্চৈঃস্বরে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বেঙ্গালোর ছাড়িয়া চলিল। ৮১ মাইল যাইতে, পথ বন্ধুর বলিয়া, ছোট গজের গাড়ির পক্ষে সমস্ত দিন লাগিয়াছিল। পথে দ্রষ্টব্য কিছুই নাই, কেবলই মাঠ। ছোট বড় প্রস্তরখণ্ড মাঠময় ছড়িয়া রহিয়াছে, কৃষকগণ তাহারই মধ্যে হলকর্ষণ ও বীজবপন করিতেছে। এখানে 'ইরিগেশন' আছে। পয়োপ্রণালী হইতে অহরহ কৃষিক্ষেত্রে জল পাইতেছে।প্রান্তরগুলিতেলক্ষ্মীর দৃষ্টি আছে বলিয়াই অনুভূত হইল। এখানে অন্নকষ্টের বা দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ক্রমে আমরা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শ্রীরঙ্গ-পট্টনের দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম। সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে কাবেরী নদী পার হইয়া শ্রীরঙ্গপট্টনে পৌঁছিলাম। সেই টিপুর রাজভবন, শ্রীরঙ্গজির মন্দির জুম্মা মস্‌জিদ এবং নবনির্মিত রেলষ্টেশন, সমস্তই প্রসিদ্ধ দুর্গের অভ্যন্তরে অবস্থিত।

রেল-ষ্টেশন গৃহের বারান্দায় কাল পাথরের পায়ার উপর কাঠের কারুকার্য্যবিশিষ্ট থাম দেখিয়া স্বতঃই মনে হইল, এই সকল থাম আধুনিক জিনিস নহে।-সঙ্গীয় একজন সহযাত্রী বলিলেন, হতভাগ্য টিপুর বিলাস-ভবনের ভগ্নাবশেষ হইতে এই সুন্দর ও সুদৃঢ় থামগুলি সংগ্রহ করা হইয়াছে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমরা মহীশূর ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। একজন ''আমিলদার''(ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট) আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন, এবং রাজশকটে নির্দ্দিষ্ট আবাসে লইয়া গেলেন। সেখানে প্রাচীন হিন্দু প্রথানুসারে আমাদিগকে বরণ করিয়া, মাঙ্গল্য দ্রব্যাদি দ্বারা অভ্যর্থনা করা হইল। আমিলদার মহাশয় আমাদের আগমনবার্ত্তা গোচর করিবার নিমিত্ত রাজপ্রসাদাভিমুখে গেলেন। দেখিলাম, প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত অতিথির জন্য সুন্দর ও সুসজ্জিত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। চাকর, সিপাহী, সোয়ার,

খানসামা, পাচক প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত, ব্যবহার্য্য অব্যবহার্য্য দ্রব্যজাতেরও অভাব নাই।

সমস্ত দিনের পর আহার ও নিদ্রা-লোলুপ পরিশ্রান্ত দেহখানা কেবলই বিশ্রাম-শান্তি অন্বেষণে লালায়িত। সুতরাং অতিথি সৎকারের প্রধান আয়োজন ও প্রাথমিক আবশ্যকীয় আহারটার তল্লাস লইয়া জানিলাম, আহার প্রস্তুত। আর তর সইল না-বীরাসনে পিঁড়ি জুড়িয়া আহারে বসিয়া গেলাম। কিন্তু দেখিলাম, দাক্ষিণাত্যে আহার্য্যের ঘটা যতই থাকুক না কেন, তদ্দারা বঙ্গদেশীয় অতিথির প্রাণ বাঁচান দায় হইবে। সবই নিরামিষ-তাহার মধ্যে আবার টকের মাত্রাই অধিক। আরও বিপদ কোন কোন ব্যঞ্জন নারিকেল তৈল সংযোগে পাক হওয়ায়, আমাদের অখাদ্য হইয়াছে। সে দেশে ইহাই সুখাদ্য ও আদরণীয়। কোন মতে নাকেমুখে চারিটা গুঁজিয়া সঙ্গীয় পাচককে বলিলাম,-''ঠাকুর পৈত্রিক প্রাণটা বাঁচাইয়া দেশে যাইতে চাও ত কাল থেকে নিজহাতে রান্না কর, এ রাজভোগ গরিবের পেটে সইবে না।''

শয়নের যোগাড় করিতেছি, এমন সময় রাজবাড়ী হইতে জনৈক কর্ম্মচারী আসিয়া, কুমকুম সুবাসিত তন্ডুল আমাদের হাতে দিয়া,রাজকন্যার বিবাহে নিমন্ত্রণ করিলেন। স্বস্তি বচনের মত, চাউলগুলি হাতে লইয়া, সঙ্গীয় রাজপুরোহিত কর্ত্তৃক উচ্চারিত বচন শুনিতে লাগিলাম। বচনের মর্ম্ম,-''বিবাহ শুভ কামনায়, আপনার আশীর্ব্বাদ প্রাপ্তি ইচ্ছায় আমন্ত্রণ করিতেছি''। আমি ''স্বস্তি'' উচ্চারণ পূর্ব্বক তাহাদের এই প্রাচীন প্রথার মর্য্যাদা রক্ষা করিলাম। পরে, কর্ম্মচারীটি আমাদের বস-বাসের সুবিধা ও আমার মঙ্গলবার্ত্তা ইত্যাদি বিষয়ক আলাপ করিয়া এবং সর্ব্বোপরি রাজমাতার সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়া, বিদায় লইলেন; আমরা রাজাশ্রয়ে সুখে নিদ্রিত হইলাম।

পরদিবস সকালে ১০টার সময় বিবাহ। আমরা নগরের পশ্চিম প্রান্তে বাস করিতেছি,—রাজপ্রাসাদ পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। একঘন্টা পূর্ব্বে বিবাহমণ্ডপে উপস্থিত থাকিতে হইবে। এখানকার দরবারে জুতা নেওয়ার ব্যবস্থা নাই। স্বয়ং মহারাজা পর্য্যন্ত খালিপায়ে দরবারে আসিবার নিয়ম। কাজেই দেশীয় পোষাকে সজ্জিত হইয়া প্রস্তুত রহিলাম। রাজশকট (State-carriage)সহ প্রাসাদের জনৈক কর্ম্মচারী আমাকে নেওয়ার জন্য আসিলেন। এবং বিবাহ উপলক্ষিত অদ্যকার নিয়মাবলী একখণ্ড আমাকে দিলেন; সেটা আমার অপাঠ্য, কারণ কেনাড়ি ভাষায় তাহা মুদ্রিত ছিল। কর্ম্মচারী মহাশয় গাড়িতে যাইতে যাইতে নিয়মাবলীর মর্ম্মটা আমাকে বুঝাইয়া দিলেন এবং বলিলেন,-''অদ্যকার বিবাহে রাজকীয় ঘটা ততটা নাই। মহারাজের বিবাহ দিনে উচ্চ অঙ্গের রাজকীয় ঘটা দেখিতে পাইবেন।'' আমার আনীত যৌতুকগুলি এখানকার প্রথানুসারে পালকিতে মিছিল সহ পশ্চাতে আসিতেছিল। যথা সময়ে বিবাহ মণ্ডপে পৌঁছান গেল; দেখিলাম বিরাট ব্যাপার!

মহীশূরে দুইটি রাজপ্রাসাদ। একটি দুর্গমধ্যস্থ, ইহা কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্ম্মিত। ইতিপূর্ব্বে অন্য একটি রাজকুমারীর বিবাহোপলক্ষে অগ্ন্যুপাতে এই প্রাসাদের বড় দরবার হল ও অন্যান্য অনেকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অন্য প্রাসাদটি অধুনা নির্ম্মিত; তাহা বর্ত্তমান মহারাজের পিতামহ মহারাজ কৃষ্ণরাজ ওদেয়ারের সময় পাশ্চাত্য অনুকরণে তৈয়ারি। এই প্রাসাদ ''জগন্মোহন প্রাসাদ'' নামে প্রসিদ্ধ। এই প্রাসাদ প্রাঙ্গণে বিবাহোপলক্ষে দুই লক্ষ মুদ্রাব্যয়ে ইষ্টক ও কাষ্ঠ দ্বারা প্রকাণ্ড একটি মণ্ডপ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। মণ্ডপটি দেশী-বিলাতি সংমিশ্রণে ১৫০x৭০ ফুট পরিমাপে নির্ম্মিত এবং দুই হাজার লোকের সমাবেশ যোগ্য। এই প্রকারের মন্ডপ বর্ণনার যোগ্য বটে। ভিতরে দুইধারে মহিলাগণের জন্য দুইটি গেলারি নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে স্ত্রী স্বাধীনতা আছে; কোন কোন পরিবারে এবং রাজ-পরিবারের মধ্যে 'গোশা' বা পর্দ্দা প্রথা সম্প্রতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এজন্য এই গেলারিতে ইয়ুরোপীয়, দেশীয় ও গোশা মহিলাগণের নিমিত্ত পৃথক পৃথকভাবে বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। গেলারি দোতালা। নিম্নে সাধারণ দর্শকবৃন্দের দাঁড়াইয়া বিবাহ দেখিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ভিতরের সাজসজ্জা অতি মনোরম এবং জমকালো। তাঞ্জোর প্রদেশীয় প্রসিদ্ধ কারিকরগণ দ্বারা, বাদলা, সলমা, চুমকি এবং রাং দ্বারা অভিনব আদর্শে ফুল, পাতা ইত্যাদি নানাবিধ কারুকার্য্য দ্বারা ছাদ হইতে দেয়াল পর্য্যন্ত সাজান হইয়াছে। মনে হয় দিল্লীর দেওয়ান খাসের কাজ এখানে হার মানিয়াছে। দিল্লীর কাজ চিরস্থায়ী-একাজ অস্থায়ী। কিন্তু এমন সুন্দর কারুকার্য্য সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। ছন্দটি বাদামী খিলানের; তাহাতে বৈদ্যুতিক ও গ্যাশের আলোর বড় বড় ঝাড়, ঝুলান। পাশ্চাত্য ও ভারতীয় শিল্পের সংমিশ্রণে যে কত সুন্দর সাজ গোজ হইতে

পারে, এখানে তাহার আদর্শ দেখা গেল। অর্থ ও মস্তিষ্কের সদ্ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণে হইয়াছে।

এই মণ্ডপে দুইটি বিবাহ বেদিকা ছোট মন্দির ধরণের পূর্ব্বোক্ত মত তাঞ্জোরী কারুকার্য্যে প্রস্তুত হইয়াছে। বেদিকায় নানা রঙ্গে কাচের পদ্মে বৈদুতিক আলো ঝুলান হইয়াছে।

মধ্যস্থলের বেদিকায় মহারাজার বিবাহ হইবে। তাহারই দক্ষিণ দিকস্থ অপেক্ষাকৃত ছোট অপর বেদিকাটিতে অদ্যকার রাজকন্যার বিবাহ কার্য্য সমাধা হইবে। সমস্ত মণ্ডপটি বিলাতি ভেলভেট ও কার্পেট দ্বারা মোড়া। কেবল বিবাহ বেদিকার সম্মুখস্থ খানিকটা জায়গা মিনটন টাইল দ্বারা মণ্ডিত হইয়াছে। মধ্যস্থলে একটি হোমকুণ্ড। দক্ষিণের বেদিকার সম্মুখে নানাবিধ মাঙ্গল্য দ্রব্যাদি দ্বারা সাজান হইয়াছে। যৌতুকের সামগ্রীগুলি স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে। সোণার পিলশুজে প্রদীপ, রূপার ত্রিপদীতে সোনার থালায় কুমকুম-রঞ্জিত কদলি তণ্ডুল, নারিকেল এবং পান সুপারি, পুষ্পমালা, পুষ্পধনুশর, পুষ্পদণ্ড এবং নানাবিধ পুষ্পরচিত দ্রব্যাদি সাজান রহিয়াছে। এই সকল পুষ্পাভরণ, পুষ্পাস্তরণ এবং ফুলবাণ ইত্যাদি দেখিয়া, কামদেবের সাজসজ্জার কথা একবার মনে পড়িল। এখানে গৃহাদিতে পত্র পুষ্পের সাজ বড় একটা দেখা গেল না। কারণ অনুসন্ধানে জানিলাম, এখানে বঙ্গদেশের ন্যায় প্রচুর পরিমাণে পুষ্প পত্রাদি সুলভ প্রাপ্য নহে। কেবল বেল, চামেলি ও জেসমিন জাতীয় ফুলই প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এ বিবাহ ব্যাপারে ঐ সকল শ্রেণীর পুষ্পের প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ দেখিয়া অবাক হইয়াছি।

বিবাহ-লগ্নের কিছু পূর্বে বর মিছিলসহ বিবাহ-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। সভাস্থ সকলে অভ্যর্থনাপূর্বক দক্ষিণের বেদিকায় তাঁহাকে বসাইয়া আপন আপন আসন গ্রহণ করিলেন।

যথাসময়ে মহারাজ পাত্রমিত্রসহ সভাস্থ হইলেন। বন্দিগণ উচ্চৈঃস্বরে বন্দনা গাহিতে লাগিল,-নকিব ফুকারিয়া সভাস্থ সকলকে মহারাজের আগমনবার্ত্তা জানাইল। সকলেই খালি পায়,-মহারাজ পর্য্যন্ত। উপস্থিত রাজন্যবর্গের সহিত যথাযথ সম্ভাষণ করিয়া মহারাজ নিজ আসনে এবং অপর সকলে নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হওয়ার পর, হঠাৎ সভামধ্যে নৃত্য-বাদ্য রব সমুখিত হইল। মাথা তুলিয়া দেখিলাম, তাঞ্জোরের প্রসিদ্ধ নর্ত্তকীগণ অঙ্গভঙ্গি করিয়া নানা ছাঁদে নৃত্য করিতেছে। পশ্চাতের বাদ্যকরগণ গান গাহিতেছে , আর নর্ত্তকীগণ হাবভাব বাৎলাইয়া, তাহারই রস ফুটাইয়া নাচের মহিমা বিস্তার করিতেছে। এমন সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর নৃত্য আর কখনও দেখি নাই। নানা ধরণের নাচ, সভার নানা স্থানে চলিতে লাগিল। মেপোল নাচ-হাতে কাঠি, একে অন্যের হাতের কাঠিতে কাঠি ঠেকাইয়া যোড়শটী যুবতীর নৃত্য নতুনতর দেখিলাম। ইতিমধ্যে বিবাহ কার্য্য আরম্ভ হইল।

এখানে এক অভিনব প্রথা দেখিলাম, মাতুলের নিকট ভাগিনেয়ীকে বিবাহ দেওয়া হয়। বর্ত্তমান মহারাজার মাতুল তাঁহার প্রথমা ভগিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন এবং অদ্যকার বিবাহেও ঐ বংশীয় একটি পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করা হইতেছে। আর একটি প্রথা এই, সস্ত্রীক হইয়া কন্যা সম্প্রদান করিতে হয়। মহারাজ এখনও অবিবাহিত, রাজমাতা বিধবা, কাজেই প্রতিনিধিস্বরূপ অদ্য মহারাজার মাতুল অথচ ভগ্নিপতি কন্যাদাতা। প্রথামতে বরকে অর্চ্চনা ও পাদ্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা বরণ করার পর, যথা সময়ে কন্যাকে সভাস্থ করা হইল। একখানা লাল বস্ত্রের দ্বারা বর ও কন্যার মধ্যে অন্তরাল করা হইল। পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক পরদা সরাইয়া লইলেন- বর ও কন্যার শুভ-দৃষ্টি হইল। ইহার পর, দুইটি তণ্ডুলপূর্ণ ও কিংখাপ মোড়া ছোট ধামার উপর পদ স্থাপন করিয়া, উভয়ে উভয়কে সপ্তমবার পুষ্প তণ্ডুল বর্ষণ করিলেন। এই সকল কার্য্য সম্পাদনের পর, সম্প্রদান কার্য্য আরম্ভ হইল। হিন্দুবিবাহ প্রথা সর্ব্বত্রই প্রায় এক;এখানে পার্থক্য এই, সম্প্রদানান্তে কন্যা বরের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিলেন, ইহাই প্রথা। পুরোহিত হোম আরম্ভ করিলেন, বর-কন্যা এক গ্রন্থিতে গ্রন্থিত হইয়া, হোমানলে মন্ত্রঃপুত ঘৃত ও লাজাহুতি প্রদান করিলেন। সপ্তমবার যজ্ঞবেদিকা প্রদক্ষিণ করিয়া দুইজনে দুই খানা পিঁড়িতে উপবিষ্ট হইলেন। অতঃপর ''টালি'' অর্থাৎ তদ্দেশীয় সধবা চিহ্ন, কাল মৃত্তিকার মালা, স্বর্ণ হাঁসলি সংযোগে বর স্বহস্তে কন্যার গলায় পরাইয়া দিলেন। এখন সপ্তপদি-ক্রিয়া আরম্ভ হইল। একখানি শীলাখণ্ডে সাতটি ময়দার দাগ দিয়া বর ও কন্যা মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক সপ্তবার তাহাতে পা ছোঁয়াইলেন। সপ্তপদি-কার্য্য এখানে নাকি এই রকমেই হইয়া থাকে, অর্থাৎ শীলারোহণ ও সপ্তপদ গমন কার্য্য একবারেই শেষ হয়। বিবাহান্তে সভাস্থলে মালা, আতর ও পান বিতরণ আরম্ভ করা হয়। উপস্থিত অতিথিগণ নিজ নিজ যৌতুকগুলি বর

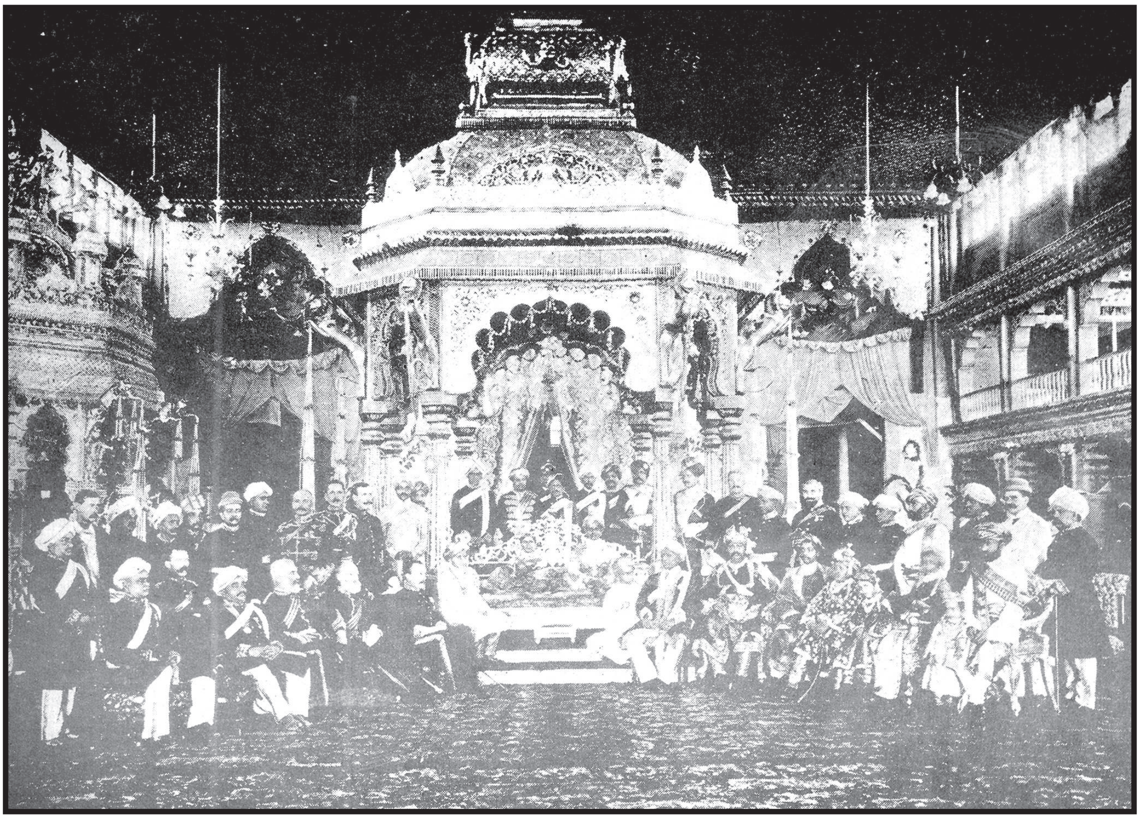

মহীশূর রাজোদ্বাহ

ও কন্যার সম্মুখে ধরিলে, উভয়ে তাহা স্পর্শ করিয়া গ্রহণ-সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। সভাস্থ ভদ্র ইতর সকলকেই মালা ও পান দেওয়ার রীতি। এই মালা পান বিতরণ কার্য্য সমাধা হইতে প্রায় এক ঘন্টা সময় লাগিয়াছিল। সভাভঙ্গের পূর্ব্বে সমবেত কর্ম্মচারিগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া মহারাজাকে অভিবাদন করিলেন, প্রতি-নমস্কার দ্বারা মহারাজ হাস্যমুখে সকলকে সন্তুষ্ট করিলেন। সভাভঙ্গ হইলে আমরা জনতা ভেদ করিয়া, বিবাহমণ্ডপ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

বিকাল বেলা দরবার বকসী খবর দিলেন,মহারাজার ''কাশীযাত্রা'' ব্যাপারে আমাদের উপস্থিত থাকিতে হইবে। শুনিয়া ইহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ধরা-চূড়া পরিয়া আমরা রাজবাড়ীতে যাইয়া দেখি, বিষম জনতা-আমাদের ন্যায় অনেক কাশীযাত্রী জুটিয়াছেন। মিছিল প্রস্তুত, মহারাজ গৈরিকবসন পরিহিত, ব্রহ্মচারী-বেশে সভাষদ ও সম্ভ্রান্ত অতিথিবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া, নগ্ন পদে বাহিরে আসিলেন, হাতে একটি দণ্ড। পার্শ্বস্থ রাজকর্ম্মচারীর বর্ণনায় জানিলাম, ইহা এখানকার বিবাহের পূর্ব্ব প্রথা। অর্থাৎ অবিবাহিত ব্যক্তি মাত্রেই ব্রহ্মচারী, গার্হস্থ্যশ্রমে প্রবেশের পূর্বে কাশীবাস করিয়া, শাস্ত্র শিক্ষার পরে গৃহী হইবার অধিকার পায়। তাই, মহারাজ আজ ব্রহ্মচারীবেশে নগর ভ্রমণচ্ছলে কাশীযাত্রা করিতেছেন। আমরা মহারাজার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট মিছিলসহ শহরের পূর্ব্ব দিকে প্রায় দুই মাইল হাঁটিয়া সন্ধ্যার পরক্ষণে কন্যাকর্ত্তার বাটির সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। এখানে কন্যাযাত্রিগণ আমাদিগকে একটি বিরাট চন্দ্রাতপতলে অভ্যর্থনা করিলেন। সকলেই দাঁড়াইয়া রহিলাম। কন্যাকর্ত্তা জাফ্রাণ-রঞ্জিত নারিকেল ফল হাতে লইয়া, মহারাজের নিকট মন্ত্র পাঠ পূর্ব্ব গোচর করিলেন,-''সর্ব্বাপেক্ষা গার্হস্থ্য আশ্রমই মানুষের প্রধান আশ্রম। অতএব আপনি ব্রহ্মচার্য্যব্রত পরিত্যাগ করিয়া, আমার কন্যার(নামোচ্চারণ করা হয়) পানিগ্রহণপূর্ব্বক গৃহস্থ হউন। ''এই কামনায় ফল দান করিলে, মহারাজ মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন। ইহার পর আমরা মিছিলসহ দুর্গমধ্যস্থ প্রাসাদে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। রাজমাতা মহারাণী উপরের বারাণ্ডা হইতে পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সকলে নতশিরে মহারাণীকে নমস্কার জানাইয়া বিদায় লইলেন। আমরাও শুভ্র চন্দ্রালোকে নগরের শোভা দেখিতে দেখিতে বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম।

এই কাশীযাত্রা ব্যাপার আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নতুন। ইহা দেখিয়া আমার হৃদয়ে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদের উদয় হইয়াছিল। হর্ষের কারণ-একটি নতুন ব্যাপার দেখিতে পাইলাম, অথচ ইহা হিন্দু-শাস্ত্রানুমোদিত একটি প্রধান অনুষ্ঠান। পক্ষান্তরে, হিন্দুর শাস্ত্র ও আচার বিধি সঙ্কোচিত হইয়া কত দুরবস্থাপন্ন হইয়াছে, এ স্থলে তাহার জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত দেখিয়া বিষাদিত হইয়াছিলাম। শাস্ত্র বলেন ঃ—

''ষট্ ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতম্।
তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিক মেব বা।।
বেদানধীত্য বেদো বা বেদং বাপি যথা ক্রমম।
অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রম মাবসেৎ।।''

মনুসংহিতা-৩য় অং,১/২ শ্লোক।

ইহার মর্ম্ম এই; ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে ষটত্রিংশৎ বর্ষকাল বেদত্রয় অধ্যায়নর্থ ব্রহ্মচার্য্যাশ্রম-বিহিত ধর্ম্মের আচরণ করিলেন। অথবা তাহার অর্দ্ধেক কাল, কিম্বা চতুর্তাংশ কাল কিম্বা যতদিন পর্য্যন্ত তিন বেদের সম্পূর্ণ গ্রহণ না হয়, ততদিন গুরুগৃহে যাপন করিবেন। তিন বেদ, দুই বেদ অথবা একবেদ শাখাদি যথাক্রমে অধ্যয়ন করিয়া, বিদ্যালাভ হইলে, স্ত্রী সংপ্রয়োগ হইতে অস্খলিতভাবে নিবৃত্ত থাকিলে পর, তবে গার্হস্থে অর্থাৎ দার পরিগ্রহে অধিকারী হওয়া যায়।

ইহা ভিন্ন ব্রহ্মচারীর আচার ব্যবহারাদির কাঠিন্য বিষয়ে শাস্ত্রে অনেক ব্যবস্থা রহিয়াছে। সেই সকল শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা, এখন কিয়ৎকাল নগর ভ্রমণ দ্বারাই পালন করা হইতেছে। কালে আরও কি হইবে, ভগবান জানেন।

৬ই জুন-আজ মহারাজের বিবাহ। গতকল্য মান্দ্রাজের গভর্ণর ভারতের রাজ-প্রতিনিধির প্রতিভূ হইয়া আসিয়াছেন।

রাজপ্রতিনিধির সম্মানে তাঁহাকে সমাদর করা হইয়াছে। মহীশূরের রেলওয়ে ষ্টেশনে তাঁহার প্রতীক্ষায় আমরা সকলে পূর্ণ 'লেবাসে' (full dress)উপস্থিত থাকিয়া 'স্বাগত' জ্ঞাপনপূর্বক রাজসম্মানে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছি। তিনিও আমাদের কর-মর্দ্দন করিয়া নিজের প্রীতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। আজ আমরা ১১ টার সময় 'ধরা-চূড়া' পরিয়া বিবাহ-মন্ডপে উপস্থিত হইলাম। আজকার জনতা, আজকার মহীশূর নগরের শোভা- বর্ণনাতীত; আজ যেন অজ রাজার নগর-প্রবেশের চিত্র দেদীপ্যমান দেখিতেছি! রাস্তাঘাটে কেবলই স্ত্রীলোক- অসংখ্য স্ত্রীলোক, স্ত্রী-স্বাধীন প্রদেশে যেন যুঁই, চামেলি, বেলি, গোলাপের ছড়াছড়ি; দাক্ষিণাত্য সুলভ শৃঙ্গারে সজ্জিত নারীমূর্ত্তি -রবি বর্ম্মার চিত্রের আদর্শ-দেখিতে দেখিতে যাইতেছিলাম। তাহাদের শারীরিক গঠন অতীব সুঠাম-বেণীবন্ধে পুষ্পগুচ্ছ অত্যন্ত সৌন্দর্যবর্দ্ধক; কেবল গন্ডপ্রদেশে জাফ্রাণের রঙ্গীণ রেখাটী যেন চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় সৌন্দর্য্য নাশ করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে , এমন সুন্দর দেহকান্তি বঙ্গে সুদুর্লভ। ভয়ানক জনতা ভেদ করিয়া আমরা বিবাহ লগ্নের আধ ঘন্টা পূর্ব্বে মণ্ডপে প্রবেশ করিলাম। আজকার বন্দোবস্তটী পাকাপাকি-'সরকারী' অর্থাৎ State;আজ পূর্ণ সম্মানসহ সকলের অভ্যর্থনা-যথোচিত আসনের নির্দ্দেশ। আমরা বিদেশীয় রাজপ্রতিভূগণ মহারাজের বামদিকে দেশীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে সমাসীন হইলাম। রাজকর্ম্মচারিগণ নিজ নিজ পদমর্য্যাদানুসারে আমাদের নিকটে কার্পেটে উপবিষ্ট হইলেন। কিন্তু একটা রীতি যেন নিতান্ত বিসদৃশ্য বোধ হইল। স্বয়ং মহারাজ নগ্নপদ, সকলের জন্যই নিম্নে কার্পেটে আসন; কিন্তু গভর্ণর হইতে সামান্য শ্বেতকায় পর্য্যন্ত চৌকিতে (Chair) আসীন। যে কার্পেটে রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারী দেওয়ান হইতে নিম্নতন কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত আসীন, তাহারই উপর কাষ্ঠাসনে ইংরেজদিগের বসিবার স্থান নির্দ্দেশ হইয়াছিল। আমাদের চক্ষে ইহা যেন কেমন কেমন বোধ হইতে লাগিল। এ বন্দোবস্তের ভাব ও উদ্দেশ্য আমরা সহজজ্ঞানে বুঝিলাম না। রাজকর্ম্মচারিগণ অবশ্যই তাঁহাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণপূর্ব্বক এরূপ করিয়াছিলেন। যথাসময়ে দুর্গস্থ রাজভবন হইতে মহারাজ বরবেশে সুসজ্জিত এবং সুবর্ণ হাওদার উপর সুবর্ণ ছত্রের ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া মহাসমারোহে মিছিলসহ 'জগন্মনোমোহন প্রাসাদে' উপস্থিত হইলেন। এখানে কিন্তু একটা ইংরেজী প্রবাদের মর্য্যাদা ভঙ্গ হইল; ''All that glitters is not gold''এই প্রবাদটী মহীশূরের তৎকালীন সমারোহে ''All that glittered was gold except diamonds and other precious stonesরূপে পরিণত হইয়াছিল। দুর্গমধ্যস্থ প্রাসাদ হইতে জগন্মনোমোহন প্রাসাদ অতি অল্প দূরে অবস্থিত, তবুও মিছিলের বাহার, সমারোহ ও গাম্ভীর্য্য যথাযথ পরিরলক্ষিত হইয়াছিল। এ বন্দোবস্ত অতীব প্রসংশনীয়। চারিকোণে সোনার হাওদাযুক্ত চারিটী হাতী, তাহার মধ্যে মহারাজের নিজের সোয়ারী হাতী। পদাতিক, অশ্বারোহী, রাজচিহ্নধারী বাহকবৃন্দ, পতাকা,ধ্বজা,ডঙ্কা এই রাজমিছিলে না ছিল কি? মিছিলসহ মহারাজ ধীর পদবিক্ষেপে বিবাহ-মন্ডপের দ্বারদেশে সমাগত হইলেন। সকলেই জয় জয়কার ধ্বনিতে মহারাজকে অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। কন্যাপক্ষ হইতে বনোর রাণা ও মূলীর রাজা মহারাজকে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক মন্ডপে আনয়ন করিলেন। মন্ডপমধ্যস্থ বেদিকামঞ্চে মহারাজ আসন পরিগ্রহ করিলেন এবং তৎপরে অন্য সকলে নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট হইলেন। মহারাজের আসন গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পরেই তোপধ্বনিতে গবর্ণর সাহেবের আগমনবার্ত্তা সূচিত হইল। সুযোগ্য বৃদ্ধ দেওয়ান বাহাদুর ও অপরাপর রাজকর্ম্মচারিগণ গবর্ণর সাহেব ও এ রাজ্যের রেসিডেন্টকে দ্বারদেশে হইতে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক বিবাহ সভায় আনয়ন করিলেন। এখানে কিংখাপের পর্দ্দার অন্তরালে রাজমাতা মহারাণী উপস্থিত ছিলেন। গবর্ণর সাহেব উপযুক্ত 'লেবাসে' G.C.B র 'তখ্‌মা তাবিজ' পরিধানপূর্ব্বক নতশিরে প্রথমে মহারাজ ও পরে অন্তরালস্থ রাজমাতা মহারাণীকে অভিবাদন করত আসন পরিগ্রহ করিয়া অদ্যকার শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান দর্শন করিতে লাগিলেন।

যথাসময়ে কন্যা বিবাহ-সভায় আনীতা হইলেন। কন্যা কাঠিওয়ার প্রদেশীয় ভনরাজার দুহিতা। তিনি পরমাসুন্দরী, রত্নাদিতে ভূষিতা, বিবাহবেশে তাঁহার মুখশ্রীতে রাজরাণীর গাম্ভীর্য্য ও মহিমা প্রতিভাত হইতে লাগিল। বহুজনতাপূর্ণ সভা মধ্যে, বার বৎসরের কন্যা যেন বরমাল্য হাতে নির্ব্বাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় স্বয়ম্বরে উপস্থিত। চঞ্চলতাশূন্য স্থির দৃষ্টিতে পাত্রী সভাস্থ জনতার দিকে মাঝে মাঝে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন; আর (পুরোহিত কর্ত্তৃক) অনুদিষ্ট বিবাহপদ্ধতির আনুষ্ঠানিক কার্য্যগুলি যথাযথ সম্পাদন করিতেছিলেন। আজকার রাজোদ্বাহে আমরা সেকালের পৌরাণিক ভাব অনুভব করিতেছিলাম।

হোমানলের চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ সময়ে নরনারীর প্রতি পদক্ষেপে তাঁহার পদাভরণ রত্নবনকমলের শিঞ্জনে, কঙ্কণের কিঙ্কিণীতেও ঈষৎ বঙ্কিম গ্রীবা সহ মন্থরগতিতে প্রাচীন কবির ছবি যেন ফুটিতেছিল। যখন ভনর বড় জামাতা(ভনর রাণার প্রতিনিধিরূপে) কন্যার সম্প্রদান কার্য্য সম্পাদন করিলেন তখন নববিবাহিতা রাণী যেন স্বতঃই বুঝিতে পারিলেন,"আমি এখন রাজরাণী, আমার পদোচিত স্থৈর্য্য ও গৌরব রক্ষা করিতে হইবে।" রাণীর নাম প্রতাপকুমারী বাঈ। তাঁহার অদ্যকার এই ভাবে তিনি যেন সেই নামেরই মহিমা ও সার্থকতা প্রতিপাদন করিতেছিলেন। এ দৃশ্যটী আমাদের বড়ই মনোমোহন করিয়াছিল।

বিবাহপদ্ধতি সমস্তই পূর্বোল্লিখিত বিবাহের অনুরূপ, কেবল 'টালী' বন্ধনের সময় রাজসম্মানসূচক ২১টী তোপধ্বনিতে রাজা ও রাণীর পরিণয়বার্ত্তা জনসাধারণে প্রচারিত হইল। এই তোপধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই জনসাধারণের মহোল্লাসপূর্ণ জয়জয়কার শব্দ সমুত্থিত হইয়াছিল।

বিবাহ পদ্ধতির কার্য্য সমাধা হইলে, গবর্ণর সাহেব যবনিকার সম্মুখীন হইয়া রাজমাতাকে উদ্দেশ্য করিয়া নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিলেনঃ—

"Since H.E the Viceroy is unable to his regret to be present here today, he has asked me to represent him and to inform your Highness that Her majesty the Queen Empress of India has been graciously pleased to command that her congratulations should be to your Highness"

মহারাজের দিকে মুখ ফিরাইয়া গবর্ণর সাহেব আবার বলিতে লাগিলেন– "The Viceroy also desired me to express felicitation, on this auspicious ceremony and to wish your Highness and your bride a long and happy life. Speaking for myself, I wish to offer Her Highness the Maharani Regent and to your Highness my sincere congratulations on this happy event and I desire to express my earnest hope that this alliance, so auspiciously entered upon, will bring many blessings to your Highness and to your Highness's bride, that it will promote the happiness of your Highness's belove mother and that it will add to the welfare of this already fortunate and prosperous State".H

তখন দেওয়ান সার্, কে, শেষাদ্রি আয়ার্ রাজমাতা মহারাজের পক্ষ হইতে উত্তর দিলেনঃ—

"Her Highness the Maharani Regent is deeply grateful to Her Majesty the Queen Empress for the gracious message of congratulations which has just now been concluded, and Her Highness begs to and Her Highness add that it has been a source of special gratification to her that their Excellencies the Governor of Madras and Lady Havelock have been able to grace with their presence the auspicious event of today."

তৎপর পুষ্পমাল্য দ্বারা ইংরাজ অতিথিবর্গকে বরণ করা হইল। গবর্ণর ও রেসিডেন্টসহ অপরাপর ইউরোপীয় অতিথিগণ নতমস্তকে বিবাহসভা ত্যাগ করিলেন। বর-কন্যা- রাজা রাণীও স্মিত মুখভঙ্গি দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রতি-নমস্কার জ্ঞাপন করিলেন। আধুনিক প্রথা অনুসারে আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া করমর্দ্দনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিতে হয় নাই।

এবার বিবাহের উপঢৌকন বা যৌতুক দিবার পালা। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমাগত নিমন্ত্রিত রাজা ও রাজ-প্রতিনিধিগণ' মহারাজের আত্মীয় কুটুম্ব, প্রধান কর্ম্মচারী ও প্রজাবর্গ নিজ নিজ যৌতুক মহারাজা ও রাণীর করস্পর্শ করাইয়া আপন আপন আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তৎপরে মহারাজের পক্ষ হইতে আতর, পান ও পুষ্পমাল্যের প্রতিদান আরম্ভ হইলে, তাঞ্জোরের নানাবিধ নৃত্য দর্শকবৃন্দের চক্ষুর প্রীতি সম্পাদন করিতে লাগিল। যথাসময়ে পুষ্পমাল্য,পান আতর বিতরণকার্য্য সমাপিত হইলে, দুরদেশাগত অতিথিবর্গ, মহারাণী রাজমাতার যবনিকার সম্মুখে অভিবাদনপূর্ব্বক, আপন আপন হৃদয়োচ্ছ্বাস জ্ঞাপন করিলেন। মহারাণীও অতিথিদিগকে ধন্যবাদ দিয়া নব-দম্পতির প্রতি আশীর্ব্বাদ কামনার অনুরোধ করিলেন। সভাস্থ সকলেই নবদম্পতির শুভকামনা করিলে, নবদম্পতি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যবনিকার অন্তরালে মহারাণীর নিকটে গমন করিলেন। আমরা

সভাস্থ সকলে ক্ষুৎপিপাসাতুর হইয়া বেলা একটার সময় স্ব স্ব বাসায় ফিরিলাম।

অপরাহ্ন পাঁচটার সময় আমরা নগর পরিভ্রমণে বাহির হইলাম। তখনও পথে জনতার হ্রাস হয় নাই; নগরের নানা স্থানে বিভিন্ন প্রকার আমোদ-প্রমোদের বন্দোবস্ত ছিল। সর্ব্বত্রই স্ত্রীলোকের জনতা অত্যধিক। এ দৃশ্য বঙ্গীয় অতিথির চক্ষে নতুন। নাগরদোলার স্থানে, ছায়াবাজীর ঘরে, ভেল্কিবাজীর মজলিসে, বাঁড়ের সম্মুখে, পুতুলনাচের আসরে, ''লটারী'' খেলার কুঠরীতে, আশ্চর্য্য সামগ্রী-পুঞ্জে সুসজ্জিত দোকানের নিকটে যেখানে সেখানে স্ত্রীলোকের ভিড়; ক্রীড়া নাই, ব্রীড়া নাই, বঙ্গীয় স্ত্রীলোকদের ন্যায় মুখে বস্ত্রাবরণ নাই-যুবতী, কিশোরী ও প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকেরই মেলা, এসব আমোদে যেন তাহাদেরই পূর্ণাধিকার। বিচিত্রবেশধারিণী স্ত্রীলোকদের জনতা ভেদ করিয়া অগ্রসর হয় কাহার সাধ্য !

সন্ধ্যার সময় আমরা রাজদরবারে হাজির হইলাম। আজ নবদম্পতি বিবাহ-মণ্ডপেই নানা প্রকার ক্রীড়া কৌতুক করিবেন। দাক্ষিণাত্যে একটি সুন্দর নিয়ম প্রচলিত আছে। যে বয়সেই বিবাহ হউক না কেন, স্বামী-স্ত্রীতে সন্দর্শন বা একত্রবাস আমাদের দেশের ন্যায় ঘটে না। স্ত্রী যে পর্য্যন্ত উপযুক্ত বয়সপ্রাপ্ত না হন, সে পর্য্যন্ত স্বামীর নিকট হইতে পৃথক থাকেন। তৎপরে বর ও কন্যাপক্ষীয়গণ উপযুক্ত সময় নির্দ্ধারণপূর্ব্বক স্বামী স্ত্রীতে মিলনের ব্যবস্থা করিয়া দেয়। অদ্যকার রাত্রির অনুষ্ঠিত কার্য্যগুলিকে আমাদের দেশের স্ত্রী আচার বলিলেই হয়; বর ও কন্যা হাত ধরাধরি করিয়া মণ্ডপে উপস্থিত হইয়া যথাস্থানে উপবিষ্ট হইলেন।

অতঃপর বরকন্যা পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া ফুলগুচ্ছ নিক্ষেপ ও তজ্জনিত আমোদ উপভোগ করিতে লাগিলেন। ফুলশর নিক্ষেপ ও প্রতিনিক্ষেপ লক্ষ্যভ্রষ্টতার জন্য উভয় পক্ষীয় আত্মীয়গণের পরস্পরকে গঞ্জনা, নানা বর্ণের চূর্ণ দ্রব্য লইয়া পরস্পরের গণ্ডদেশে প্রক্ষেপ,পুষ্প তাম্বুল ও সুগন্ধি দ্রব্যাদির আদান প্রদান প্রভৃতি নানা কৌতুক নবদম্পতির মধ্যে চলিতে লাগিল। এখানেও পুরোহিত ঠাকুরের অধিকার, তিনি মন্ত্রপূত করিয়া পুষ্পাদি নবদম্পতির হাতে দিলে পর পরস্পরে আদান প্রদান বা নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে প্রায় এক ঘন্টাকাল খেলাধূলার পর, বর কন্যা দরবারে গম্ভীরভাবে বসিলেন, নকিব ফুকারিতে লাগিল, দরবার আরম্ভ হইল। রাজকর্ম্মচারীগণ নিজ নিজ পদ অনুসারে মহারাজকে অভিবাদনপূর্ব্বক আসরে উপবেশন করিলেন। আবার সেই তাঞ্জোরের একঘেয়ে নাচ চলিতে লাগিল। এই রূপে আরও ঘন্টাখানেক পরে আতর, পান ও পুষ্পমাল্য বিতরণের পর সভা ভঙ্গ হইল। মহারাজ ও রাণী অন্তঃপুরে আশ্রয় লইলেন।

ইহার পর ক্রমাগত কয়েকরাত্রি নবদম্পতি এই বিবাহ-মণ্ডপে প্রকাশ্য দরবারে নানাবিধ স্ত্রী আচার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। একদিন পুষ্পদোলায় তাঁহাদের দুলিবার কথা ছিল; ইংরাজ অতিথিগণ তাহা দেখিবেন। কিন্তু যথাকালে পুষ্পদোলা সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত না হওয়ায়, সে দৃশ্য দেখা আমাদের ভাগ্যে ঘটিল না। কিন্তু তাহার সাজ সরঞ্জাম দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, ব্যাপারখানা যথার্থ ফুলদোলাই বটে।

নৃত্যাদি দর্শন উপলক্ষ্যে রাজ দরবারে উপস্থিত হইয়া আমরা সমবেত অতিতিবর্গ পরস্পরের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে লাগিলাম। নৃত্যগীত, ভাঁড়ামি, নানা সঙ ও অন্যান্য তামাসার সঙ্গে সঙ্গে দূরদেশাগত অতিথিগণ পরস্পরের মধ্যে বন্ধুতা স্থাপনের সুবিধা খুঁজিতে লাগিলেন। যাঁহারা পানাভিলাসী তাঁহাদের জন্য বন্দোবস্তের ক্রটি ছিল না । যাঁহাদের তাহাতে অভিরুচি নাই, তাঁহাদের জন্যও অন্যবিধ সাত্বিক বন্দোবস্ত ছিল। অদ্যকার সভায় নর্ত্তকীদের বিরাম নাই-নানা দেশীয় নানা ধরণের গীত বাদ্য ও নৃত্যকলার চরম আদর্শ প্রদর্শিত হইতে লাগিল। নবদম্পতির সংসর্গে বিবাহ-সভায় নানাবিধ আমোদে রাত্রি একটা পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিয়া বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। জ্যোস্না রাত্রি, নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশের মলয়ানিলে বঙ্গের নববসন্তের স্পর্শসুখ যেন এ সময় হঠাৎ উপস্থিত। বঙ্গের প্রবাসীর পক্ষে অদ্যকার রাত্রিটি বিরহোদ্দীপক।

১৩ ই জুন পর্যন্ত বিবাহ-সংসৃষ্ট অপরাপর অনুষ্ঠান ব্যাপারদি এবং স্ত্রী আচারগুলি প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় একই রকমে চলিতে লাগিল। দরবারে নৃত্য গীতাদি, পান, আতর, ফুলমালা বিতরণ সবই একঘেয়ে; প্রত্যহ অন্ততঃপক্ষে দুঘন্টাকাল প্যান্টলুন সহ পদ্মাসনে উপবেশনের কষ্ট অনুভব করিতাম। শেষ দিনে মহারাজ সস্ত্রীক বিবাহের অনুষ্ঠেয় অবশিষ্ট ক্রিয়াদি

সমাপন করিলেন; বিবাহমন্ডপের স্তম্ভাদির পূজা, গুরুপূজা, যজ্ঞশেষ আহুতি ইত্যাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া মহারাজা ও রাণী দরবারে বসিলেন। এবার আর এক বিরাট ব্যাপার উপস্থিত। সমবেত অতিথিবর্গ ও রাজকর্ম্মচারিগণকে ''খেলাত'' বা রাজ উপহার প্রদত্ত হইতে লাগিল! প্রায় দুই ঘন্টা কাল অবিরাম খেলাত বর্ষণ ব্যাপার চলিতে লাগিল। বহুমূল্য শাল ও উষ্ণীষ একখানি থালায় করিয়া প্রথমে মহারাজ ও রাণীর হস্তস্পর্শ করান হয়, পরে দরবারের বক্সী নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে রাজসম্মুখে আনায়নপূর্ব্বক খেলাত প্রদান করিতে লাগিলেন। আরব্য উপন্যাসের গল্পের মত এই উপহারের যেন আর বিরাম নাই। ছোট বড় অতিথি, ছোট বড় রাজকর্ম্মচারী, সকলেই যথোপযুক্ত খেলাত পাইলেন। শুনিতে পাইলাম, এই খেলাত বিতরণ ব্যাপারে লক্ষাধিক টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত নিমন্ত্রিত রাজাদের ও রাজপ্রতিনিধিদের প্রতিদান স্বরূপ খেলাত ব্যক্তিগতভাবে স্বয়ং মহারাণী পৃথক পৃথক সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দান করিয়াছিলেন।

বিবাহের দিন হইতে এক সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত প্রতিদিন দুবেলা মহারাজ ও রাণী রাজদরবারে একত্র মিলিত হইয়া নৃত্য গীতাদিতে যোগদান করিতেন এবং শাস্ত্রীয় বিধি ও স্ত্রী আচার ব্যাপার সম্পাদন করিতেন। সপ্তাহান্তে নবদম্পতি এই কঠিন পরীক্ষা হইতে অব্যাহতি পাইলেন। বিবাহ-সভায় সপ্তাহব্যাপী ক্রিয়াকর্মের সময়, দর্শন ব্যতীত রাজ অন্তঃপুরে নবদম্পতির মিলনের কোন ব্যবস্থা নাই। স্ত্রী বয়স্কা হইলে পর, দ্বিতীয় বিবাহ বা গর্ভাধান বিবাহ কার্য্য অনুষ্ঠানপূর্বক স্বামী স্ত্রী একত্র বাস করিবার নিয়ম মহীশূর রাজ্যে প্রচলিত। সে রাজ্যে এই নিয়ম এখন রাজবিধিরূপে পরিণত হইয়াছে। এই বিধি লঙ্ঘন করিয়া ২/১ জন লোক কারাদন্ড ও ভোগ করিয়াছেন। বঙ্গদেশে 'সহবাস আইন' লইয়া যেরূপ তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল, এই আদর্শ রাজ্যে তাহা বিধিবৎ ব্যবহৃত হওয়ার দৃষ্টান্তটী ভারত সাম্রাজ্যে কম গৌরবের বিষয় নয়!

১৪ ই সন্ধ্যার পর বিরাট মিছিলে নব দম্পতির নগর পরিভ্রমণে বাহির হইবার দিন। এই ব্যাপারটিও যেন নাগরিকদিগকে মাতোয়ারা করিয়া তুলিয়াছিল। যে যে নির্দ্দিষ্ট রাজপথ দিয়া মহারাজার মিছিল যাইবে, সেই সেই মহল্লার লোকগণ বিস্তর অর্থব্যয় করিয়া স্থানে স্থানে অতি সুন্দর তোরণ নির্মাণ করিয়াছিল। এই ব্যাপারে এক মহল্লার সহিত অন্য মহল্লার যথেষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। সেদিন সহরে আলোর বাহার কি অদ্ভুত! বঙ্গদেশের ন্যায় এখানে মল্লিকার প্রদীপ দিবার প্রথা দেখিলাম না। লাল, নীল, সবুজ নানা রঙ্গের লণ্ঠনে আলো এমনভাবে সাজাইয়া দিয়াছে, যেন বোধ হয় অট্টালিকার গাত্রে হীরা, চুনি, পান্না গাঁথিয়া রাখা হইয়াছে। এই লণ্ঠনগুলির শোভা দিনের বেলায় কিছুই বোঝা যায় না; কিন্তু রাত্রিতে এই আলোর দৃশ্য অতি মনোরম হইয়াছিল। এখানে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, আমাদের বঙ্গদেশে রাত্রি ও দিনের বেলায় সাজের তারতম্যের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না। সেজন্য দিবালোকে যাহা সুন্দর দেখায়, রাত্রিতে চন্দ্রালোকে বা প্রদীপালোকে অনেক সময় তাহার বাহার থাকে না। কিন্তু দাক্ষিণাতের লোকেরা এ বিষয়ে খুব পটু, তাহারা চমৎকার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে নিপুণ। দিনের বেলায় রাজপথের সাজসজ্জা নয়নের তৃপ্তিকর বলিয়া বোধহয় নাই; কিন্তু সন্ধ্যার পর মিছিলের রোশনাই ও চন্দ্রালোকে উহা কেমন বিচিত্র ও সুন্দর দেখাইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা সুকঠিন। বাস্তবিক এরূপ সাজসজ্জার কার্য্যে দাক্ষিণাত্যের লোক সুনিপুণ। তাহাদের আতস বাজীর নমুনা দেখিয়াও আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।

রাতি দশটার সময় মিছিল রাজপ্রাসাদ হইয়ে রওয়ানা হইবার কথা। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন দেখিয়া সকলেরই মনে আশঙ্কা হইল, ঝড় বৃষ্টিতে বা সমস্ত আয়োজন উদ্যোগ নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু, ভগবানের কি বিচিত্র লীলা! ভাগ্যবান পুরুষদের অনুষ্ঠিত কার্য্যে কদাচিৎ আকস্মিক বাধা বিঘ্ন দেখা যায়। মহারাজা ও রাণী যেমনই হাতির উপর উপবিষ্ট হইলেন, অমনি সামান্য বৃষ্টিপাত হইয়া আকাশ মেঘযুক্ত হইল; তখন সকলেরই মনে মনে ধারণা হইল, দেবগণ স্বর্গ হইতে শান্তিবারি বর্ষণ করিলেন। মেঘযুক্ত চন্দ্রালোকে দেখিয়া সকলেই জয়জয়কার করিতে লাগিল। এই মিছিলে না ছিল কি? যিনি ঢাকাতে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে মিছিল দেখিয়াছেন, তিনি কতকটা ইহার ভাব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। নানা বর্ণের আলোক, অত্যদ্ভুত আতস বাজী, নানাবিধ বাদ্য, অসংখ্য সৈনিক পদাতি ও অশ্বারোহী, রাজচিহ্ন ও ধ্বজপতাকাধারী অসংখ্য লোকজন সহ মিছিল বাহির হইল। দাক্ষিণাত্যের নর্তকীদের প্রাদুর্ভাব কিছু বেশীরকম। দলে দলে নর্তকীগণ মিছিলের অগ্রে, মধ্যে ও পশচাতে নানা স্থানে সঙ্গে সঙ্গে

নাচিয়া নাচিয়া যাইতেছিল। আলোক-মালা,ধ্বজপতাকা তোরণশোভিত মহীশূর নগরী এক অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল! রাজপথে জনতা-কেবলই জনতা-এই জনতা ভেদ করিয়া যাওয়া সহজ ব্যাপার নহে। ইহা ছাড়াও দ্বিতল, ত্রিতল দালানের উপর অসংখ্য স্ত্রীপুরুষের সমাবেশ। রাজপথের বিভিন্ন স্থানে মহোল্লাসে উন্মত্ত নাগরিকগণ নবদম্পতির অভ্যর্থনার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছে। পাটহস্তীর উপর আরূঢ় রাজা ও রাণী-এক এক বাড়ীর সম্মুখীন হইলে খৈ, পুষ্প ও মাল্যাদি সুগন্ধি দ্রব্যের দ্বারা গৃহপতিগণ উভয়কে বরণ করিতেছে। এইরূপে নগরের প্রধান প্রধান রাজপথ অতিক্রম করিয়া কর্ম্মচারী ও প্রজাসাধারণের উৎসাহপূরণ করত মহারাজ ও রাণী মিছিলসহ প্রত্যুষে রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। মিছিলের আড়ম্বর দেখিয়া আমরা রাত্রির প্রথম ভাগেই স্বীয় আবাসে ফিরিয়াছিলাম। পরদিন অপর সাধারণের অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, আমরা মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে সারারাত্রি না থাকিয়া বুদ্ধিমানের কার্য্যই করিয়াছিলাম।

ইতোমধ্যে একদিন ইংরাজদিগের একটি ভোজ State Dinner হয়- After Dinner এ আমরা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। মহারাজ স্বয়ং Queen’s Health পানের প্রস্তাব করেন এবং ইংরাজীতে নিজ স্বাস্থ্য পানকারীদিগকে অভিনন্দিত করেন। ষোড়শ বৎসর বয়স্ক রাজকুমারের এই নাকি প্রথম ইংরাজী বক্তৃতা। তাঁহার সাহস ও ইংরাজি শব্দোচ্চারণ প্রণালী প্রশংসনীয়।

ইহার পর দুই ঘন্টা কাল আতস বাজীর তামাসা হয়। মান্দ্রাজী বাজীকরগণ এ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত। কলিকাতার অনেক বড় বড় ব্যাপারে আতস বাজীর তামাসা দেখিয়াছি, কিন্তু মান্দ্রাজী আতস বাজীর ন্যায় ব্যাপার আর কোথাও দেখি নাই। অগ্নিবৃষ্টি, নানা রকমের ছবি, রামরাবণের ও ইংরাজবুয়রের যুদ্ধ, উপদেশপূর্ণ শ্লোক প্রভৃতি কত বিষয় যে আতস বাজীতে দেখিয়াছি, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

১৬ই জুন আমাদের মহীশূর পরিত্যাগ করিবার দিন। সেদিন রাজমাতা মহারাণী আমাদিগকে ‘‘খেলাত’’ দিলেন। রাজঅন্তঃপুরের মাঝামাঝি এক স্থানে কিংতাপের পর্দ্দার আড়ালে উপবেশনপূর্ব্বক মহারাণী নানাবিধ সুমিষ্টবাক্যে আমাদিগকে আপ্যায়িত করিলেন। বিশেষ কষ্ট, অসুবিধা ও পথক্লান্তি স্বীকার করিয়া আমরা বিবাহে যোগদান করিয়াছি বলিয়া আমাদিগের ধন্যবাদ করিলেন এবং আমরা যেন কোন প্রকার ত্রুটি গ্রহণ না করি, এই অনুরোধ করিলেন। তিনি কানাড়ি ভাষায় কথা কহিলেন এবং তাঁহার বড় জামাতা(অথবা সহোদর ভ্রাতা) দোভাষীর কার্য্য করিতে লাগিলেন।

আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে লাগিলাম, ‘‘আপনি এ উৎসব ব্যাপারে একরূপ রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন; এ বৃহৎ ব্যাপারে বন্দোবস্তের ত্রুটি হওয়াই সম্ভব ছিল; কিন্তু কর্ম্মচারিগণের কর্ত্তব্যপরায়ণতায় অতি সুন্দররূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছে; কোন অংশে কোন বিষয়ে খুঁৎ নাই। মানুষ সমালোচনা- প্রিয়, পরদোষান্বেষী;কিন্তু আমরা চেষ্টা করিয়াও এ ব্যাপারের কোন প্রকার ত্রুটি বা দোষ ধরিতে পারি নাই-যদি আমাদের মনে কোন দুঃখ থাকে, তবে এই মাত্র এক দুঃখ লইয়া যাইতেছি।’’ হীরকাঙ্গুরী, জরির শাল, তাস, কিংখাপ প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্যের ‘‘খিলাত’’ লইয়া যখন আমরা গাড়ীতে উঠিলাম,তখন মনে হইল, কেহবা আমাদিগকে এই সকল জিনিসের ব্যবসায়ী বলিয়া সন্দেহ করে। তৎপরে সেই অল্পসময়ের মধ্যে যে সকল রাজকর্ম্মচারী ও দূরদেশাগত অতিথির সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুত্ব হইয়াছিল, তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণের জন্য বাহির হইলাম। উপসংহারে এই আদর্শ রাজ্যের কর্ণধার, ব্রাহ্মণবংশীয় স্বনামখ্যাত বৃদ্ধ মন্ত্রী সার কে শেষাদ্রি আইয়ার কে, সি, এস, আই মহোদয়ের সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। তিনি সম্প্রতি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু চাণক্যসদৃশ রাজনীতিজ্ঞ এই বৃদ্ধ মন্ত্রীপ্রবরের নাম মহীশূর রাজ্যের অস্থিমজ্জায় বিজড়িত থাকিবে, সন্দেহ নাই। মান্দ্রাজ প্রদেশের পারঘাট জিলার একজন স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণের বংশে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁনি মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন B.A.B.L. ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথমে মহীশূর রাজ্যের বিচার বিভাগে সেরেস্তাদারের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৭৯ সালে ডিপুটি কমিশনার, পরে প্যালেস কন্ট্রোলার, তৎপরে সেসন জজের পদে উন্নীত হন। নিজের প্রতিভা ও রাজনীতিক অভিজ্ঞতার বলে তিনি ক্রমে মহীশূর রাজ্যের কর্ণধাররূপে অধিষ্ঠিত হন। Sir W.W.Hunter তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন ‘‘A statesman who has

given his head to Herbert Spencer and his heart to Para Brahma.''

ঘটনাবশতঃ কলিকাতা নগরীতে তাঁহার সহিত লেখকের সাক্ষাৎ হয়, এবং সেই সূত্রেই মহারাজের বিবাহোপলক্ষে মহীশূর গমনের সুযোগ হয়। এই উদ্বাহকাণ্ডে তিনি কৃষ্ণ সদৃশ সারথি ছিলেন। একটি ঘড়ীহস্তে তাঁহাকে সমস্ত মাঙ্গলিক কার্য্য, সামাজিকতায়, আদর অভ্যর্থনায়, ছোট বড় সকল ব্যাপারে ব্যস্ত দেখিতাম। তিনি যেন একটি যন্ত্রের ন্যায় অবিরাম কার্য্য করিতেছেন-, কোন প্রকার ভুল ভ্রান্তি বা বিশ্রাম নাই। ভারতবাসী সময়ের মূল্য জানে না, এ কলঙ্ক এই বৃদ্ধমন্ত্রীতে কোন ইংরেজ আরোপ করিতে পারেন নাই।

এই বিরাট ব্যাপারের বন্দোবস্ত এমন পরিপাটি ও সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল যে, কি দেশীয় কি বিদেশীয় সকলেই একবাক্যে বিবাহ ব্যাপারের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। অতিথিবর্গের জন্য বহ্বাড়ম্বরশূন্য, অথচ এমন সুন্দর বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে, সকলেই একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। দেশীয় রাজ্যবাসীর পক্ষে এরূপ অভিযান তীর্থভ্রমণতুল্য।

পরিশিষ্ট

“রিয়া”

(ত্রিপুর মহিলাদিগের বক্ষ বন্ধনী।)

শ্রী মহিম চন্দ্র ঠাকুর।

স্বাধীন ত্রিপুরা।

আগরতলা-শিল্প প্রদর্শনীর জন্য প্রকাশিত।

১৩২৭ ত্রিপুরাব্দ।

সমালোচনা

সাপ্তাহিক ত্রিপুরা গাইড। মঙ্গলবার, ১৯ শে চৈত্র ১৩২৪ সাল। ১৩২৭ ত্রিপুরাব্দ।

"রিয়া"

আগরতলা ঠাকুর পরিবারের স্বনামখ্যাত কর্ণেল শ্রীযুত মহিমচন্দ্র ঠাকুর মহাশয় অতিসংক্ষেপে ''রিয়া'' নামক একখানা অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানি যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, কর্ণেল ঠাকুর ত্রিপুরা মহিলাদিগের একটি চিরন্তন প্রথার শৈথিল্য দেখিয়া তাহার ব্যবহার অক্ষুণ্ণ ও চির প্রচলিত রাখার যে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা শতবার ধন্যবাদার্হ। সকল দেশেই জাতিগত পোষাক পরিচ্ছদের একটা চিহ্ন দৃষ্ট হয়। এরূপ ত্রিপুরা মহিলাগণের বক্ষ এবং পুরুষগণের কোমর বন্ধ জন্য ''রিয়া'' নামক একটি বন্ধনী পরিচ্ছদ আবহমানকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। আজকাল বিদেশী হাওয়া মূলে আর মহিলাগণ সেই পরিচ্ছদ বুকে বজায় রাখিতে তত রাজি নয়। মহিমবাবু ইহা ব্যবহারের যে সকল যুক্তি ও ঐতিহাসিক বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আমরা আশা করি যে, ত্রিপুরা মহিলা এবং পুরুষগণ এই জাতীয় চিরন্তন প্রথানুমোদিত বন্ধনী ধারণ করিলে তাঁহারা বরং গৌরবান্বিত হইবেন। রিয়া বিষয়টি পাঠ করিতে যেমন কৌতুহলদ্বীপক তেমনি সুখপাঠ্য। ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল। ইহা পাঠ করিয়া সকলেই আনন্দ বোধ করিবেন।

‘‘রিয়া’’

(ত্রিপুর মহিলাগণের বক্ষ বন্ধনী।)

শৈশবকালে আমরা ধাই মার নিকট ত্রিপুরা নরপতিগণের প্রসঙ্গে অনেক রূপকথা শুনিতাম। একটি গল্প শুনিয়াছি, সুবরাই রাজা বলিয়া একজন রাজা ছিলেন। তিনি ত্রিপুরা জাতির শিল্প সম্বন্ধে অনেক উন্নতি করিয়াছেন এবং কার্পাস বুনিবার প্রথা এ রাজ্যে সর্ব্বপ্রথম আনিয়াছিলেন বলিয়া এখনও ধারণা আছে। এই সুবরাই রাজাকে? যিনি ত্রিপুরার লোকের মুখে মুখে অদ্য ও বর্ত্তমান আছেন তাঁহার নাম এবং তাঁহার বিষয় জানিবার জন্য শিশুকালে উৎসুক না হইলেও বর্ত্তমান পরিণত বয়সে স্বততঃই মনে উৎসুক জন্মে। এজন্য আমি ত্রিপুরা দিগের মধ্যে, ঠাকুর পরিবারে এবং রাজপরিবারে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি। যুবক এবং বৃদ্ধের নিকট অনেক অনুসন্ধান লইয়াছি। সকলেই নাম শুনিয়াছি এই মাত্র উত্তর দেন। কিন্তু তিনি কি দেব না দানব তাহা বলিতে পারেন না। সুবরাই রাজার সম্বন্ধে অনেক অমানবিক গল্প শুনা যায়। সম্প্রতি আমি ত্রিপুরার আদি এবং একমাত্র ইতিহাস ‘‘রাজমালা’’ গ্রন্থখানা পাঠ করিতেছিলাম। হঠাৎ দেখি আমার সেই সুবরাই রাজা ধরা দিলেন। তিনি অন্য কেহ নন; ত্রিপুরার আদি মহারাজ ‘‘ত্রিলোচন,’’ তাহার বিষয় ‘‘রাজমালা’’য় লিখিত আছেঃ—

তিন চক্ষু হইবেক পুরুষ প্রধান।
আমার তনয় আমা-হেন কর জ্ঞান।
সুবরাই রাজা বলি স্বদেশে বলিব।
বেদ মার্গী সাধুগণ ত্রিলোচন কহিব।

কথায় বলে ‘‘যা নাই ভারতে, তা নাই ভাবতে।’’ ত্রিপুরার বিষয় বলিতে গেলে ও বলিতে হয় ‘‘যা নাই রাজমালায় তা নাই ত্রিপুরায়’’। এ যে mythological যুগের কথা। ত্রিলোচন, রাজার বিষয়, ইহা কি বিশ্বাস করা যাইতে পারে বলা যায়। কিন্তু এ জন্য মহাভারত অশুদ্ধ হইবে না। ত্রিপুরার রাজমালা ও অশুদ্ধ হইবে না। একথা আমরা স্পষ্ট বলিতে পারি। রাজমালা গ্রন্থখানাতে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত অবস্থা কাশী মাণিক্য পর্য্যন্ত বিশদভাবে বিবৃত আছে। কোনও বিষয়ে যদি অনুসন্ধান লইতে হয়, তাহা হইলে এই রাজামালাই একমাত্র বিশ্বস্ত উপায় ত্রিপুরার লোকে যে গর্ব্ব করিয়া থাকে ‘‘নতুন শিল্প শিক্ষার কোন প্রয়োজন নাই কারণ, যে শিল্প সুবরাই রাজা শিক্ষা দেন নাই, সে শিল্প শিল্পই নয়। এই গর্ব্ব mythological কালের গর্ব্ব হইলেও অদ্য পর্য্যন্তও প্রচলিত আছে। ধন্য ত্রিপুরার রাজা! ধন্য ত্রিপুর জাতি!

ত্রিপুর জাতির মধ্যে এখনও ‘‘রিয়া’’ প্রস্তুতের নানা প্রকার কারুকার্য্য খচিত প্রাচীন নক্সা তাঁহারই (সুবরাই রাজা) নামে পরিচিত। প্রত্যেক ত্রিপুর পরিবারে এই নক্সা বংশপরম্পরায় প্রচলিত থাকে। এমন কি শ্বাশুড়ি, বধুকে এই নক্সার রিয়া বিবাহ সময়ে উপহার স্বরূপ দেওয়ার প্রথা অদ্য পর্যন্ত প্রচলিত আছে। শ্বাশুড়ির মৃত্যু হইলে মৃত শ্বাশুড়ির রিয়া আসনে রাখিয়া শ্রাদ্ধ অন্ন উৎসর্গ করার প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও প্রসঙ্গভুক্ত করিতে ইচ্ছা করি। আমার যখন দশ বৎসর বয়স তখন আমাদের একজন শিক্ষক ছিলেন। নাম চৈতন্য নায়েক। তিনি আমাদের শ্রুত লিপি লইতে

বড় কড়া কড়ি করিতেন। হস্তলিপি লইতে যাইয়া তিনি বারবার আমাদের উপর হুকুম দিতেন যে, আমরা যেন ত্রিপুরা জাতীয় Folk lore (গল্প কথা) লিখিয়া আনি। তারপর শ্যামাচরণ ডাক্তার মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম, তিনি এ রাজ্যে হইতে চলিয়া গিয়া খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন, তারপর''কা কস্য পরিবেদনা''। কাহার খবর কে লয়। ১৮৮৫ সালে যখন আমি কলিকাতায় পঠদ্দশায় থাকি তখন একদিন College square এ একজন খৃষ্টধর্ম্মের বহি বিক্রেতার নিকট Aboriginal Mission Track Book Society হইতে প্রকাশিত Fine art in Tippera নামে একখানা পুস্তক দেখিতে পাই। মূল্য পাঁচ আনা এক পয়সা। এই পাঁচ আনা এক পয়সা খরচ করিয়া আমি Tippera art সম্বন্ধে যোল আনা না হউক বিশেষ সংবাদ পাইলাম। ঐ পুস্তক প্রণেতা সুবরাই রাজার গল্প লিখিতে যাইয়া ত্রিপুরা দিগের নিকট প্রচার করিতেছেন। ''তোমরা সুবরাই রাজার নিকট হইতে শিল্প পাইয়াছিলে কিন্তু তোমাদের জন্য যীশুখৃষ্ট নামক এক ব্যক্তি তোমাদের পাপের জন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছেন। তোমরা ইহা বিশ্বাস কর। ইহা খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের কথা বটে। পুস্তক খানা তেমন যত্নে রাখি নাই, কাজেই হারাইয়া গিয়াছে। লেখকের নাম দেখিলাম আমাদের সেই পুরাতন মাষ্টার চৈতন্য নাথ নায়েক। তাহাতে স্পষ্ট বুঝিলাম তিনি খৃষ্টান হইবার পূর্ব্বে এই গল্প আমাদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। গল্পটা সংক্ষেপে বলিতেছিঃ-সুবরাই রাজা প্রচার করেন যে, ত্রিপুরার সুন্দরীগণ মধ্যে যে শিল্পকলার নমুনা উৎকৃষ্ট দেখাইবে তাহাকে তিনি বিবাহ করিবেন। এই উৎসাহ বাক্যের দরুণ নিত্য নতুন শিল্প উদ্ভাবিত হইতে লাগিল এবং ত্রিপুরা সুন্দরীগণ রাণী হইতে লাগিলেন। ইহাদের সংখ্যা ২৪০ছিল। ইতিমধ্যে একটি যুবতী এমন সুন্দর ''রিয়া'' আনিয়া রাজার সম্মুখে ধরিল যে ইহা দেখিয়া রাজা অবাক হইয়া ছিলেন। ''মাছি পাখনা'' নক্সা এই সর্ব্বপ্রথম সকলে দেখিতে পাইলেন। সূর্য্য রশ্মিতে মাছি পাখনায় যে রং দেখা যায় তাহাই অনুকরণ করা হইয়াছিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, ''তুমি কি প্রকারে ইহা অনুকরণ করিতে পারিলে''। ''মাছিত দীর্ঘকাল একস্থানে থাকে না। যুবতী উত্তর করিল; আমার বাড়ীতে একটি স্থানে মাছি বরবার বসিতেছে। অদ্য তিন চারি দিন তাহাই দেখিয়া মহারাজের প্রীত্যার্থে অনুকরণ করিয়াছি। মহারাজ সেই মাছির বসার কারণ অনুসন্ধান করিতে সেই যুবতীর বাড়ী গেলেন। তথায় যাইয়া দেখেন একটি স্থানে মাছি বরবার বসিয়া আছ। তাড়াইলেও উড়িয়া পুনরায় বসে। মহারাজ ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে মাটি খুঁড়িয়া ফেলিলেন। দেখিলেন, মহারাজার আদরের একটি সর্প ছিল, যাহা বরাবর মহারাজর সঙ্গে সঙ্গে থাকিত, সেই সর্প যুবতীর পিতা মারিয়া এই স্থানে পুঁতিয়া রাখিয়াছে। মহারাজ অত্যন্ত মনস্তাপের সহিত বলিলেন''তোমরা দেখ এই সর্প স্বর্গের গন্ধর্ব। কোন কারণে শাপগ্রস্ত হইয়া সর্প রূপে আমার নিকট আশ্রয় লইয়াছে। সর্পের সঙ্গে কথা ছিল যে, আমাকে প্রতিদিন এক একটি শিল্পের আদর্শ শিখাইবে এবং আমার রাজ্যের লোকেরা তাহা শিক্ষা করিবে। তারপর ৩৬০ টি শিল্পাদর্শ আমার প্রজাগণ এক বৎসর মধ্যে শিক্ষা করিবে এবং আমি ৩৬০টি বিবাহ করিব। আমি মাত্র ২৪০টি শিল্পাদর্শ পাইয়াছি এবং ২৪০জন স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়াছি। হায়। এই সর্প এখন স্বর্গে গিয়াছে। শিল্পের আদর্শ আর আমি পাইব না। এক্ষণে আমার রাজত্ব করা বৃথা। আমি চলিলাম। তোমাদের অদৃষ্ট নিয়া তোমরা থাক। এই কথা বলিয়া মহারাজ অন্তর্দ্ধান হইলেন। যেই স্থানে সর্পকে প্রোথিত করা হইয়াছে, সেই স্থানে খুমপুই (Lily at the valley) নামক ফুলের গাছ জন্মিয়া ও পুষ্পবন্ত হইয়া সৌরভ বিস্তার করিতে লাগিল। এখনও প্রবাদ যে, ত্রিপুরাদের মধ্যে আর কোন উন্নতি হইবে না। কারণ ত্রিপুরার শিল্পাদর্শ সুবরাই রাজার সময়েই পূর্ণ হইয়াছে। ত্রিপুরা ইতিহাস রাজমালায় রাণীগণ কর্ত্তৃক শিল্পের উন্নতি বিষয়ে যাহা লিখিত আছে। তা নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে জানা যাইবে ঃ—

আচোঙ্গ নৃপতি স্বর্গীয় হইল যখন,
তার সূত্র খিচোঙ্গ রাজা হইল তখন।
খিচোঙ্গমা নামে ছিল তাহার রমণী,
বিচিত্র বসন শিক্ষা নির্ম্মায়ে আপনি।

রাজমালা।

রিয়া

ত্রিপুর বংশীয়দের মধ্যে মহিলাগণ নিজেদের রিয়া নিজেরাই বুনিতেন এবং তাহা নিজেরাই ব্যবহার করিতেন। সধবা স্ত্রীলোকগণ নিজের ব্যবহার্য্য রিয়া নিজেরাই বুনিতেন ইহাই নিয়ম ছিল।

মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের জন্ম তিথি উপলক্ষে বরাবরই ত্রিপুরার শিল্প প্রদর্শনী হইত। বড় ঠাকুর শ্রী শ্রীযুত সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মণ বাহাদুর এই মেলার জন্য মনে প্রাণে খাটিতেন এবং উৎসাহের জন্য পুরস্কার দিতেন। রাজপরিবার ও ঠাকুর পরিবারের মহিলাদিগকে এক এক খানা বীরচন্দ্র মাণিক্যের আসরফ দিয়া পুরস্কৃত করিতেন। এই সব আসরফ আজ পর্য্যন্তও অনেক মহিলা তাঁহাদের লক্ষ্মী পূজার পেটেরার মধ্যে রাখিয়া দিয়াছেন। আসরফের মান্য আমাদের পুর মহিলাগণ যেমন করেন, তেমন অন্যে করিতে পারে না।

আমি দেখিয়াছি, স্বর্গীয় ডাক্তার শম্ভু চন্দ্র মুখার্জ্জি যিনি এ রাজ্যের Minister Associate ছিলেন (বীরচন্দ্র মাণিক্যের) আমলে দীনবন্ধু নাজির প্রধানমন্ত্রীর অধীনে) এই রিয়া তিনি পাগড়ী রূপে ব্যবহার করিতেন। কোন ঈশ্বরী তাঁহাকে ইহা শিরোপা দিয়াছিলেন কিনা আমি জ্ঞাত নহি। কিন্তু শম্ভু চন্দ্র মুখার্জ্জি মন্ত্রীত্ব পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা চলিয়া যাওয়ার পর কলিকাতায় পঠদ্দশায় যখন আমি Government House এ যাইতাম, তখন শম্ভু মুখার্জ্জিকে সেই রিয়ার পাগড়ি ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। একদিন সান্ধ্য সম্মিলনীতে (Evening party) শম্ভু বাবুকে ধরিয়া Lady Dufferin তাঁহার সেই পাগড়ি দেখিয়া প্রশংসা করিয়া কোথায় ইহা পাওয়া যায় জানিতে চাহিয়া ছিলেন। তখন ডাক্তার মুখার্জ্জি ত্রিপুরার নাম উল্লেখ করেন। Lady Dufferin বলিয়াছিলেন, তিনি বড় ঠাকুরকে (সমরেন্দ্র চন্দ্র) চিনেন। তাঁহাকে লিখিয়া একখানা আনাইয়া লইবেন। আমি জানিনা বড় ঠাকুর বাহাদুর তাঁহার সেই অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছিলেন কি না।

তাহার পর মিঃ ম্যাক্‌মিন বিলাত হইতে একখানা অতি পুরাতন ত্রিপুরার বিবরণযুক্ত কাগজ পান। সেই কাগজ খানা Mr.Ralph leake(British Resident of Tripura) এর রিপোর্ট। তৎসঙ্গে The then reigning queen মহারাণীর জাহ্নবীদেবীর বিবরণ এবং তাঁহার সহিত Ceremonial বিদায় সম্বন্ধে রিপোর্ট ছিল। সেই চিঠি খানায় (1783 A.D.11th march) তিনি মহারাণীকে প্রদত্ত ''শিরোপা'' সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া ''রিয়ার'' নাম করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন এই রিয়া রাজরাণীগণ যাহাদিগকে সম্মান করিতে হয় তাহাদিগকে শিরোপা দিয়া থাকেন। ইহার অর্থ যে যাহাদিগকে রাণীগণ সম্মান করেন তাহাদিগকে অন্তর্ম্মূক্ত করিয়া সম্মান করিয়া থাকেন। রাণীর পিতা মগন রায় মহামিছিপ সাহেবকে বুঝাইয়া দেন। এ কথা উক্ত পত্রে আছে। Leak সাহেব এ কথার Sentiment বুঝিয়া ছিলেন এবং বুঝিয়া ছিলেন এই রিয়া খানার যথার্থ Art কি? Benares এ যে কিংখাপ প্রস্তুত হয় তাহার তুলনায় এই রিয়া প্রস্তুতের প্রথা অধিক উন্নতিমূলক এবং ইহার নক্সা যথার্থ শিল্পের আদর্শ। তিনি সেই জন্য রিয়াখানা British Museum এ Art Collection বিভাগে দিয়াছিলেন। Late Mr.Mcminn দুঃখের সহিত বলিয়াছেন, এই art শীঘ্রই হইয়া lost art হইয়া যাইবে।

তারপর স্বর্গীয় মহারাজার আমলে স্বর্গীয়া মহারাণী তুলসীবতী মহাদেবী ঈশ্বরী মহোদয়া আমার রাজ সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া আমার পোষাকে ব্যবহারের জন্য রিয়ার শিল্প আদর্শে একটি Sesh প্রস্তুত করিয়া দেন। Lord Curjan Victeory থাকার সময় আমি যখন A.D.C রূপে মহারাজর সমভিব্যবহারে বড় লাটের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম তখন Lord Curjan আমার Sesh দেখিয়া কাছে ডাকাইয়া নিয়া নিজ হস্তে বিচার করিয়া বলিয়া ছিলেন ইহা কোন দেশের প্রস্তুত। তখন বর্ত্তমান শ্রীশ্রীমান্ম মহারাজা বাহাদুর যুবরাজ রূপে এবং কুমার শ্রীশ্রীযুত ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মণ সঙ্গে ছিলেন। তাঁহারা ও দেখিয়া ছিলেন Lord Curjan এই রিয়া আর্ট এর কেমন প্রশংসা করিয়া ছিলেন।

আমার পুত্র শ্রীমান সোমেন্দ্র চন্দ্র দেববর্ম্মা যখন বিদ্যা শিক্ষার্থে আমেরিকা দেশে শ্রীশ্রীযুত মহারাজার আদেশে গমন করেন তখন শ্রীলশ্রীমতী রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী তাহাকে একখানা রিয়া উপহার দেন। এই রিয়াখানা মাননীয়া কুমারী নিজ হাতের প্রস্তুত, এবং রিয়ার মধ্যে উৎকৃষ্ট। শ্রীমান বিলাতে এবং আমেরিকায় যেকোন সমাজে মিশিয়াছে সে দেশীয়

পোষাকে কোমর বন্ধ রূপে ইহা ব্যবহার করিত। মেয়ে মহলে এই রিয়া দেখিয়া একটা হৈ চৈ পড়িত। পুরুষ মহলে ইহা লইয়া একে অন্যকে দেখাইবার জন্য টানাটানি করিত। তাকে লইয়া exhibition করা তথাকার পরিচিত মহলের একটা বাতিক হইয়া গিয়াছিল। পঠদ্দশায় এরূপ ব্যবহার দেশের আর্ট-এর জন্য নিতান্ত সুখকর বটে তবে অনেক সময় কষ্টকর হইত ইহা দেখিয়া তাহার ''গুরুদেব'' অর্থাৎ শিক্ষাগুরু শ্রীযুত স্যার রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য নিজেই জিনিষটা কাড়িয়া লইলেন। বলিলেন, ''ইহা এক কবির প্রস্তুতি, অন্য কবির ব্যবহার্য্য, তোর গুরু দক্ষিণারূপে ইহা আমি লইলাম''। এ কথার উপর আর কি কথা হইতে পারে। উত্তমে মধুয়ে মিলিল। এমন একটি শিল্প দ্রব্য কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ-এর ব্যবহারে আসিয়া পৃথিবীময় ঘুরিয়া আসিল। তিনি যেখানেই গিয়াছেন, কি বিলাতে, কি আমেরিকায়, কি জাপানে এই রিয়ার সর্বত্রই মান্য হইয়াছে। ত্রিপুরার রিয়া পৃথিবীময় ঘুরিয়াছে ইহা কি কম আদরের কথা।

পুরাতন আদর্শে এ রিয়া প্রস্তুত করার জন্য আমি জনৈক মহিলাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তদুত্তরে তিনি বলিলেন যে, তাঁহার নিকট হাতীর দাঁতের ''রেছাম্বী'' নাই কাজেই তিনি সব ধরণে রিয়া প্রস্তুত করিতে অক্ষম। আমি মনে করিতাম যে, হাতীর দাঁতের ''বেসাম্বী''(তাঁতের হানা)কেবল মাতা ঈশ্বরীগণের সখের সরঞ্জাম মাত্র ছিল। কিন্তু এখন বুঝিতেছি যে, এই হাতীর দাঁতের রেছাম্বী রিয়া বুনার কার্য্যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ রেশমের উপর কার্য্য করিতে হইলে হাতীর দাঁতের রেছাম্বী সহজেই সুতা টানার সাহায্য করে, যাহা বাঁশ বা কাঠের রেছাম্বীতে হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে।

আমরা দেখিতে পাই, দৈবকার্যে শিল্প জিনিষ ব্যবহার করা প্রাচীন হিন্দুকুলের প্রথা। এমন কি এই প্রথা অনুকরণ করিতে যাইয়া হিন্দুকুলে নব প্রবেশী জাতিও এই প্রথা অনুকরণ করিতে একান্ত ব্যাগ্র। দৈব কাজে একটা প্রথা এই রাজ পরিবারে আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। নববর্ষের ত্রিপুরা পূজা ''গরাইয়া'' অর্থাৎ গোরী নামক দেবতার অর্চ্চনা। এই অর্চ্চনা যদিও আজকাল তেমন সমারোহে সম্পন্ন হয় না কিন্তু State ভাবে রাজ সিংহাসনের সম্মুখে এখনও এই পূজা হইয়া থাকে। এই দেবতার পূজোপকরণ মধ্যে আমরা দেখতে পাই, রাজার দর্পণ এবং রাণীর রিয়া দেওয়া হইয়া থাকে; ও ঐ সব জিনিষের পূজা পৃথকভাবে হইয়া থাকে। রাজার দর্পণ এবং মাই দেবতার রিয়া পূজা হইবে না তবে পূজা হইবে কোন দেবতার? মাতা ঈশ্বরীর বক্ষ বন্ধনী দেবোপচারে পূজা হইবে, ইহাতে বিচিত্র কি? রাজবাড়ীতে সময় সময় বিশেষতঃ মহারাজার যাত্রার সময় এবং শুভ বিবাহাদির কার্য্যে ''লামপ্রা'' পূজা হইয়া থাকে। এই পূজা ''বিনাইগর'' নামক হিন্দু দেবতার পূজা। বিনাইগর অর্থাৎ বিনায়ক, গণেশ পূজা। এই পূজায় শ্রীশ্রীমতী ঈশ্বরীর রিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। এখনও মামুলী রূপে রিয়া দেওয়ার প্রথা বর্তমান আছে। প্রত্যেক প্রাচীন বিষয়ে যদি আমরা অনুসন্ধান লই তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, Tradition মধ্যে ঐতিহাসিক কাণ্ড বর্ত্তমান, আছে। ত্রিপুরা প্রেমের কাহিনীতে রিয়ার রসিকতা আছে। ত্রিপুরা সুন্দরী রিয়া বুনিতেছে, ত্রিপুরা যুবক বলিতেছে ''হে প্রাণ তোমার রিয়ার ফুলের বাহার আমার মাথার ''চিরাই'' মধ্যে বুনিয়া দাও না। এই প্রাচীন রাজ্যে বিশেষতঃ ভারতের একমাত্র প্রাচীন রাজ্যের যেসব প্রথা দেখিতে পাই, তাহাতে আমরা প্রাচীনতার ইতিহাস পাইয়া থাকি। অতীব দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, যে সব প্রথা আমরা হারাইয়াছি এবং হারাইতেছি তাহার মধ্যে আমরা কত কত প্রাচীনতার চিহ্নই যে হারাইয়াছি ও হারাইতেছি তাহা কে বলিবে? যাহারা এখন এই প্রাচীন রাজ্যের ইতিহাস জানিতে চান এবং তাহাতে প্রতিষ্ঠা পাইতে চাহেন তাহারা আমার এই সানুনয় নিবেদন মনে রাখিবেন।

এই রিয়া যাহাতে ত্রিপুরায় জীবিত থাকে, তাহার উপায় করা আজ সরকারের একান্ত কর্তব্য। আমাদের মহিলাগণ মধ্যে রিয়া এক্ষণে আর ব্যবহার হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না এবং কিছুদিন পরে ইহা ব্যবহার হইবে না ইহাও নিশ্চয়। ত্রিপুরার মহিলাগণ যখন আপনা আপনির মধ্যে ছিলেন, তখন তাহাদের বেশভূষাও আপনার ধরণের ছিল। এক্ষণে বর্ত্তমান জগতের বেশভূষা ক্রমে আসিতেছে ও আসিবে। এই সঙ্গে রিয়া আর ব্যবহার হইতে পারিবে না। অর্থাৎ বক্ষ বন্ধনী রূপে ইহা ত্রিপুরা মহিলাকুলে ব্যবহার করা যাইতে পারিবে কিনা আমি সন্দেহ করি। এ বিষয় আমি অনুধাবন করিয়াছি, আমার বিবেচনায় রিয়া ধরণে যদি কিংখাপ বোনা যায় তাহা হইলে এই ইউরোপীয় জিনিষের দুর্দ্দশাও ও দুম্মূর্ল্যের সময় এই কিংখাপ বাজারে বহু মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে। যাহাতে রাজ সরকার এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন ইহার জন্য আমি সর্ব্বান্তকরণে প্রার্থনা করি। কিছুতেই এই art কে রাজ সরকার Lost Art হইতে দিবেন না ইহাই আমার একান্ত ভরসা।

শ্রী মহিমচন্দ্র ঠাকুর।